স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

বিবিধ

স্বামী বিবেকানন্দ

সূচিপত্র

১. আমার জীবন ও ব্রত 4
২. ভারতবন্ধু অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার 22
৩. ডক্টর পল ডয়সন 26
৪. অধিকারিবাদের দোষ 32
৫. সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ 35
৬. মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা 37
৭. ঐক্য 41
৮. হিন্দু ও গ্রীকজাতি 43
৯. মানুষ ও খ্রীষ্টের মধ্যে প্রভেদ 44
১০. খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ কি অভিন্ন? 45
১১. পাপ থেকে পরিত্রাণ 46
১২. রামায়ণ-প্রসঙ্গে 46
১৩. জগজ্জননীর কাছে প্রত্যাবর্তন 47
১৪. ঈশ্বর থেকে স্বতন্ত্র কোন ব্যক্তিসত্তা নেই 48
১৫. খ্রীষ্ট আবার কবে অবতীর্ণ হবেন? 49
১৬. ১৮৯২-৯৩ খ্রীঃ মান্দ্রাজে গৃহীত স্মারকলিপি হইতে 49

১৭. ভাবী সভ্যতার দিঙ্নির্ণয় 64
১৮. পত্রালাপে প্রশ্নোত্তর 65
১৯. একটি অপরূপ পত্রালাপ 67
২০. ইতিহাসের প্রতিশোধ 75
২১. ধর্ম ও বিজ্ঞান 80
২২. উপলব্ধিই ধর্ম 81
২৩. স্বার্থ-বিলোপই ধর্ম 82
২৪. আত্মার মুক্তি 83
২৫. বেদান্ত-বিষয়ক বক্তৃতার অনুলিপি 83
২৬. বেদ ও উপনিষদ্-প্রসঙ্গে 84
২৭. জ্ঞানযোগ 87
২৮. সত্য এবং ছায়া 88
২৯. জীবন-মৃত্যুর বিধান 88
৩০. আত্মা ও ঈশ্বর 90
৩১. চরম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য 91
৩২. ধর্মের প্রমাণ-প্রসঙ্গে 91
৩৩. উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টিবাদ 94
৩৪. চৈতন্য ও প্রকৃতি 96

৩৫. ধর্মের অনুশীলন.. 98
৩৬. বেলুড় মঠ—আবেদন.. 99
৩৭. অদ্বৈত আশ্রম, হিমালয়.. 100
৩৮. বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমঃ আবেদন 102
৩৯. বৌদ্ধভারত.. 104
৪০. শ্রেয়োলাভের পথ 137
৪১. মুক্তির পথ 145
৪২. আমি যে আমিই.. 147

১. আমার জীবন ও ব্রত

[২৭ জানুআরী ১৯০০ খ্রীঃ ক্যালিফোর্নিয়া, প্যাসাডেনা শেক্সপিয়ার ক্লাবে প্রদত্ত।]

ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, আজ সকালে আলোচনার বিষয় ছিল 'বেদান্তদর্শন'। বিষয়টি হৃদয়গ্রাহী হইলেও একটু নীরস ও অতি বিরাট।

ইতোমধ্যে আপনাদের সভাপতি এবং উপস্থিত কয়েকজন ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা 'আমার কাজ ও এতদিনের কার্যক্রম' সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। বিষয়টি কাহারও কাহারও নিকট আকর্ষণীয় হইতে পারে, কিন্তু আমার নিকটে নয়। বস্তুতঃ কেমন করিয়া যে আপনাদের নিকট এ-সম্বন্ধে বলিব, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। এ-বিষয়ে এই আমার প্রথম বলা।

আমার ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা এতদিন কি করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহা বুঝাইবার জন্য আপনাদিগকে কল্পনায় ভারতবর্ষে লইয়া যাইতেছি। বিষয়বস্তুর খুঁটিনাটি ও বৈচিত্র্য লইয়া আলোচনার সময় আমাদের নাই। একটি বৈদেশিক জাতির সর্বপ্রকার বৈচিত্র্য এই অল্প সময়ের মধ্যে আপনাদের হৃদয়ঙ্গম করাও সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের যথার্থ স্বরূপ কিছুটা আপনাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিব।

ভারতবর্ষ একটি ভগ্নস্তূপে পরিণত বিশাল অট্টালিকার মত। প্রথম দর্শনে কোন আশাই জাগে না। এ এক বিগতশ্রী বিধ্বস্ত জাতি। কিন্তু একটু ধৈর্য্য ধরিয়া লক্ষ্য করিলে এই রূপের পশ্চাতে ভারতের আর একটি সত্য দেখিতে পাইবেন। মানুষটি যে-আদর্শ ও মূলনীতির বহিঃপ্রকাশ, সে-আদর্শ ও মূলনীতি যতদিন ব্যাহত বা বিনষ্ট না হয়, ততদিন মানুষটি বাঁচিয়া থাকে, ততদিন তাহার আশা আছে। আপনার পরিধানের জামা কুড়িবার চুরি হইয়া গেলেও তাহা আপনার মৃত্যুর কারণ হয় না। আর একটি নূতন জামা আনিতে পারিবেন। জামা এ-ক্ষেত্রে অপ্রধান। ধনবানের ধনরাশি অপহৃত হইলে তাহার প্রাণশক্তি অপহৃত হয় না। মানুষটি বাঁচিয়া থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিলে কি দেখিতে পাই, তাহা পরে বলিতেছি।

এ কথা সত্য যে, ভারতবর্ষ এখন আর একটি রাজনৈতিক শক্তি নয়, ভারতবর্ষ দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ একটি জাতি। নিজেদের শাসনকার্যে ভারতবাসীর কোন হাত নাই। ত্রিশকোটি পরাধীন দাস ভিন্ন ভারতবাসী আর কিছুই নয়। ভারতবাসীর জনপ্রতি মাসিক আয় গড়ে দুই শিলিং মাত্র। জনসাধারণের অধিকাংশের পক্ষে উপবাসই স্বাভাবিক অবস্থা। ফলে আয়ের বিন্দুমাত্র স্বল্পতা ঘটিলে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সামান্য দুর্ভিক্ষের অর্থ বহু লোকের মৃত্যু। এই দিক্ দিয়া দেখিলে শুধু ধ্বংসস্তূপ—আশাহীন ধ্বংসাবশেষই দেখিতে পাই।

কিন্তু আমরা জানি, ভারতবাসী কখনও ধনসম্পদের চেষ্টা করে নাই। পৃথিবীর যে-কোন জাতি অপেক্ষা বিপুলতর অর্থসম্পদের অধিকারী হইয়াও ভারতবাসী কোন দিন অর্থের জন্য লালায়িত হয় নাই। যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষ এক শক্তিমান্ জাতি ছিল, কিন্তু তাহার কখনও ক্ষমতার লোভ ছিল না। অন্য জাতিকে জয় করিবার জন্য ভারতবাসী কখনও বাহিরে যায় নাই। নিজেদের সীমার মধ্যেই তাহারা সন্তুষ্ট ছিল, বাহিরের সহিত বিবাদে রত হয় নাই। ভারতীয় জাতি কখনও সাম্রাজ্য-লাভের আকাঙ্ক্ষা করে নাই। পরাক্রম ও সম্পদ এ-জাতির আদর্শ ছিল না।

তবে? ভারতবাসী ভুল করিয়াছিল কি ঠিক পথে চলিয়াছিল, তাহা এখানে আলোচ্য নয়। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে এই একটি জাতিই গভীরভাবে বিশ্বাস করিত—এই জীবনই একমাত্র সত্য নয়। ঈশ্বরই সত্য। সুখে দুঃখে তিনিই তাহার আশ্রয়স্থল। ভারতবর্ষের অধঃপতনকালে এইজন্যই সর্বপ্রথম ধর্মের অবনতি ঘটিয়াছিল। হিন্দুগণ ধর্মের ভাবে পানাহার করে, ধর্মের ভাবে নিদ্রা যায়, ধর্মের ভাবে বিচরণ করে, ধর্মের ভাবে বিবাহাদি করে, ধর্মের ভাবে দস্যুবৃত্তি করে।

আপনারা কি কখনও এমন দেশ দেখিয়াছেন? সেখানে যদি আপনি দস্যুদল গঠন করিতে চান, তবে দলের নেতাকে কোনরূপ ধর্ম প্রচার করিতে হইবে, তারপর কতকগুলি অসার দার্শনিকতত্ত্ব সূত্রাকারে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে, 'এই দস্যুবৃত্তিই ভগবান্-লাভের সবচেয়ে সুগম ও সহজ পন্থা'। তবেই নেতা তাহার দল গঠন করিতে পারিবে। অন্যথা নয়। ইহাতেই প্রতিপন্ন হয়, এ-জাতির লক্ষ্য ও প্রাণশক্তি—ধর্ম। এই ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ হয় নাই বলিয়াই জাতি এখনও বাঁচিয়া আছে।

রোমের কথা মনে করুন। রোমের জাতীয় লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা ও উহার বিস্তার। যে মুহূর্তে এই সাম্রজ্যবাদে বাধা পড়িল, অমনি রোম চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধ্বংস হইল। গ্রীসের আদর্শ ছিল বুদ্ধিবৃত্তি। যে মুহূর্তে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সঙ্কট দেখা দিল, গ্রীসও অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গেল। ঠিক এই অবস্থাই বর্তমান কালের স্পেন ও অন্যান্য নবীন দেশগুলির হইয়াছে। প্রত্যেক জাতিরই এ পৃথিবীতে একটি উদ্দেশ্য ও আদর্শ থাকে। যতক্ষণ এই লক্ষ্যটির উপর কোন আঘাত না আসে ততক্ষণ বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও জাতি বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু যে মুহূর্তে সেই আদর্শটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে ঐ জাতিরও মৃত্যু ঘটে।

ভারতে সেই প্রাণশক্তি আজিও অব্যাহত। এই শক্তি ভারতবাসী কখনও ত্যাগ করে নাই। ভারতীয়দের সর্বপ্রকার কুসংস্কার সত্ত্বেও এই প্রাণশক্তি আজিও জাতির জীবনে সমভাবে প্রবাহিত। অতি ভয়ানক ঘৃণ্য কুসংস্কারসকল ভারতবর্ষে বর্তমান। তাহাতে কিছুই আসে যায় না। জাতির জীবনপ্রবাহ ও জীবনোদ্দেশ্য আজিও তেমনই আছে।

ভারতবাসীরা কোনকালেই একটি শক্তিশালী বিজয়ী জাতি হইতে পারিবে না। কোনদিন তাহারা রাজনীতির ক্ষেত্রে এক বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হইবে না। এ-কাজ তাহাদের নয়। বিশ্বসভায় ইহা ভারতবর্ষের ভূমিকা নয়। ভারতের ভূমিকা কি? ভারতবর্ষের আদর্শ—ভগবান্, একমাত্র ভগবান্। যতদিন ভারতবর্ষ মৃত্যুপণ করিয়াও ভগবানকে ধরিয়া থাকিবে, ততদিন তাহার আশা আছে।

অতএব বিশ্লেষণান্তে আপনার সিদ্ধান্ত হইবে, বাহিরের এই দুঃখ-দারিদ্র্য অকিঞ্চিৎকর, ইহা অন্তরের মানুষটিকে মারিতে পারে নাই; সে মানুষটি আজিও বাঁচিয়া আছে, এখনও তাহার আশা আছে।

দেখিতে পাইবেন, সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়িয়া ধর্মবিষয়ক কার্যধারা চলিয়াছে। এমন একটি বৎসর আমার মনে পড়ে না—যে-বৎসর কয়েকটি নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় নাই। স্রোত যত তীব্র হয়, ততই উহাতে ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হইতে থাকে। সম্প্রদায়সমূহ অবনতির লক্ষণ নয়—জীবনের পরিচায়ক। সম্প্রদায়ের সংখ্যা আরও বাড়িতে থাকুক। এমন দিন আসুক, যখন প্রত্যেক মানুষ এক একটি সম্প্রদায় হইয়া দাঁড়াইবে। সম্প্রদায় লইয়া কলহের কোন কারণ নাই।

এখন আপনারা নিজেদের দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আমি কোনরূপ সমালোচনা করিতেছি না। এদেশের সামাজিক বিধিবিধান, রাজনৈতিক সংগঠন প্রভৃতি সব কিছুই ইহজীবনের যাত্রাপথ সুগম করিবার জন্য রচিত হইয়াছে। মানুষ যতদিন বাঁচিয়া থাকে, ততদিন খুব সুখে থাকিতে পারে। আপনাদের রাস্তাঘাটের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন—কি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন! কি সুন্দর সব শহর! কত উপায়েই না মানুষ অর্থোপার্জন করিতে পারে! জীবনের সুখ-সম্ভোগের কত পথ! কিন্তু যদি কেহ এখানে বলে, 'আমি কোন কাজ করিতে চাই না, শুধু ঐ বৃক্ষতলে বসিয়া ধ্যান করিব', তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে জেলে যাইতে হইবে। কোন সুযোগই তাহাকে দেওয়া হইবে না—কোন সুযোগই নয়। সকলের সহিত তাল মিলাইয়া চলিলেই এ-সমাজে মানুষের বাঁচিয়া থাকা সম্ভব। ইহলৌকিক সুখসম্ভোগের মত্ততায় তাহাকে যোগ দিতে হইবে, অন্যথা মৃত্যু অনিবার্য।

ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। সেখানে যদি কেহ বলে, 'পর্বতশিখরে ধ্যানাসনে বসিয়া নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আমি আমার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিব', সকলেই তাহাকে বলিবে, 'যাও, ঈশ্বর তোমার সহায় হউন'। একটি কথাও তাহাকে বলিতে হইবে না। কেহ তাহাকে একখণ্ড পরিধেয় বস্ত্র দিবে, অনায়াসে তাহার অভাবপূরণ হইবে। কিন্তু যদি কেহ বলে, 'এ-জীবনটা আমি একটু উপভোগ করিতে চাই', অমনি সমস্ত দরজা তাহার নিকট বন্ধ হইয়া যাইবে।

আমি বলি, উভয় দেশের ধারণাই অযৌক্তিক। এদেশে যদি কেহ স্থির আসনে বসিয়া নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে চায়, তবে কেন সে সুযোগ পাইবে না, তাহা বুঝিতে পারি না। অধিকাংশ লোকে যাহা করে, প্রত্যেকের পক্ষেই এখানে কেন তাহাই কর্তব্য হইবে? আমি ইহার কোন কারণ দেখিতে পাই না। আবার ভারতবর্ষে কোন ব্যক্তি কেন ইহজীবনে সুখ-সম্ভোগ ও অর্থোপার্জন করিবে না, তাহারও কারণ খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু দেখুন, জোর করিয়া কোটি কোটি লোককে তাহাদের বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। ইহা ঋষিমুনিদের অত্যাচার। এ-অত্যাচার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের, মনীষীদের, এ-অত্যাচার অধ্যাত্মবাদীর, জ্ঞানী পুরুষের। আর মনে রাখিবেন, অজ্ঞ-জনের অত্যাচার অপেক্ষা জ্ঞানবানের অত্যাচার অনেক বেশী শক্তিশালী। নিজেদের মত অন্যের ঘাড়ে চাপাইবার জন্য জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানেরা সহস্র বিধিনিষেধের প্রচলন করিয়াছেন। যে-সকল বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করা অজ্ঞ-জনের সাধ্য নয়।

আমি বলি, এ অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। একজন আধ্যাত্মিক মহামানব সৃষ্টি করিবার জন্য কোটি কোটি মানুষকে বলি দিয়া লাভ নাই। যদি এমন কোন সমাজ গঠন করা সম্ভব হয়, যেখানে আধ্যাত্মিক মহামানবেরও আবির্ভাব হইবে, সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অন্যান্য সকলেও সুখে থাকিবে, ভাল কথা; কিন্তু যদি কোটি কোটি মানুষকে নিষ্পেষিত করিয়া একজন আধ্যাত্মিক মহামানব সৃষ্টি করিতে হয়, তাহা অন্যায়। বরং বিশ্ব-মানবের মুক্তির জন্য একজন মহাপুরুষের দুঃখভোগ শ্রেয়।

প্রত্যেক জাতির মধ্যে আপনাকে সেই জাতির বিশিষ্ট পন্থা অনুযায়ী কাজ করিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত সেই ব্যক্তির নিজস্ব ভাষায় কথা বলিতে হইবে। ইংলণ্ড বা আমেরিকায় যদি ধর্মপ্রচার করিতে যান, তাহা হইলে রাজনৈতিক পন্থা অনুসারে আপনাকে কাজ করিতে হইবে। সেখানে পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী ভোট-ব্যালট, প্রেসিডেণ্ট-নির্বাচন প্রভৃতি দ্বারা সংস্থা ও সমিতি গঠন করিতে হইবে, কারণ উহাই পাশ্চাত্যজাতির ভাষা ও রীতি। পক্ষান্তরে আপনি যদি ভারতবর্ষে রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে চান, তাহা হইলে আপনাকে ধর্মের ভাষায় কথা বলিতে হইবে। অনেকটা এইভাবে বলিতে হইবেঃ যে-ব্যক্তি প্রত্যহ প্রাতে তাহার গৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহার অশেষ পুণ্য হইবে, সে স্বর্গে যাইবে অথবা ঈশ্বর লাভ করিবে। ঐভাবে না বলিলে তাহারা শুনিবে না। এ শুধু ভাষার ব্যাপার। বিষয়বস্তু কিন্তু একই। কিন্তু কোন জাতির হৃদয়ে প্রবেশ করিতে হইলে আপনাকে সেই জাতির ভাষায় কথা বলিতে হইবে। কথাটি খুবই ন্যায়সঙ্গত—এ-বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করা আমাদের উচিত নয়।

আমি যে-সম্প্রদায়ভুক্ত, তাহাকে বলা হয় সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়। ‘সন্ন্যাসী’ শব্দের অর্থ ‘যে-ব্যক্তি সম্যকরূপে ত্যাগ করিয়াছে।’ ইহা অতি প্রাচীন সম্প্রদায়। যীশুর জন্মের ৫৬০ বৎসর পূর্বে বুদ্ধও এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার সম্প্রদায়ের অন্যতম সংস্কারক মাত্র। এত প্রাচীন এই সম্প্রদায়! পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদেও আপনি সন্ন্যাসীর উল্লেখ পাইবেন। প্রাচীন ভারতে নিয়ম ছিল যে, প্রত্যেক নরনারীকে শেষ জীবনে সমাজ হইতে বিদায় লইয়া একমাত্র স্বীয় মুক্তি ও ভগবৎ-চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে হইবে। ইহা ছিল চরম ঘটনা—মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি বিশেষ। সুতরাং প্রাচীনকালে বৃদ্ধগণ সন্ন্যাস অবলম্বন করিতেন। পরবর্তী কালে তরুণ যুবকগণ সংসার ত্যাগ করিতে লাগিল। যুবকগণ কর্মঠ। বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া সর্বক্ষণ মৃত্যুচিন্তা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং তাহারা ধর্মপ্রচার, বিভিন্ন সম্প্রদায়-গঠন প্রভৃতি

কার্যে ব্রতী হইল। এইরূপে যুবক বুদ্ধ তাঁহার মহান্ সংস্কারকার্য আরম্ভ করেন। তিনি যদি বৃদ্ধ হইতেন, তবে অবশ্যই নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াই নীরবে নির্বাণ লাভ করিতেন।

সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় বলিতে 'চার্চ' বুঝায় না এবং সেই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা পুরোহিত নন। পুরোহিত ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ভারতবর্ষে সমাজিক জীবনের অন্যান্য কাজের মত পুরোহিত-বৃত্তিও একটি জন্মগত পেশা। সূত্রধরের পুত্র যেমন সূত্রধর হয়, কর্মকারের পুত্র যেমন কর্মকার হয়, ঠিক সেইভাবে পুরোহিতের সন্তানও পুরোহিত হয়। পুরোহিতকে বিবাহ করিতে হয়। অবিবাহিতকে হিন্দুরা অসম্পূর্ণ মনে করে। তাই ধর্মগত আচার-অনুষ্ঠানে অবিবাহিতের অধিকার নাই।

সন্ন্যাসীদের সম্পত্তি থাকে না, তাঁহারা বিবাহ করেন না। তাঁহাদের কোন সংস্থা নাই। তাঁহাদের একমাত্র বন্ধন গুরুশিষ্যের বন্ধন। এই বন্ধনটি ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য। শুধু শিক্ষাদানের জন্য যিনি আসেন এবং সেই শিক্ষার জন্য কিছু মূল্যদান করিয়াই যাঁহার সহিত সম্বন্ধ চুকিয়া যায়, তিনি প্রকৃত শিক্ষক নন। ভারতবর্ষে ইহা সত্যসত্যই দত্তক গ্রহণের মত। শিক্ষাদাতা গুরু আমার পিতার অধিক, আমি তাঁহার সন্তান—সব দিক্ দিয়া আমি তাঁহার সন্তান। সর্বাগ্রে—পিতারও অগ্রে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিব এবং তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিব; কারণ ভারতবাসীরা বলে, পিতা আমার জন্মদান করিয়াছেন, কিন্তু গুরু আমাকে মুক্তির পথ দেখাইয়াছেন, সুতরাং গুরু পিতা অপেক্ষা মহত্তর। আজীবন আমরা গুরুর প্রতি এই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পোষণ করি। গুরু-শিষ্যের মধ্যে এই সম্বন্ধই বর্তমান। আমি আমার শিষ্যদিগকে দত্তকরূপে গ্রহণ করি। অনেক সময় গুরু হয়তো তরুণ, শিষ্য বয়োবৃদ্ধ। তাহাতে কিছু আসে যায় না। শিষ্য সন্তান, সে আমাকে 'পিতা' বলিয়া সম্বোধন করিবে; আমাকেও তাহাকে পুত্র বা কন্যারূপে সম্বোধন করিতে হইবে।

এক বৃদ্ধকে আমি গুরুরূপে পাইয়াছিলাম, তিনি এক অদ্ভুত লোক। পাণ্ডিত্য তাঁহার কিছুই ছিল না, পড়াশুনাও বিশেষ করেন নাই। কিন্তু শৈশব হইতেই সত্যের প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। স্বধর্ম-চর্চার মধ্য দিয়া তাঁহার সাধনার আরম্ভ। পরে তিনি অন্যান্য ধর্মমতের মধ্য দিয়া সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় একের পর এক সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ে যোগদান করিলেন। কিছুকাল তিনি সম্প্রদায়গুলির নির্দেশ অনুযায়ী সাধন করিতেন, সেই সেই সম্প্রদায়ের ভক্তদের

সহিত বাস করিয়া তাহাদের ভাবাদর্শে তন্ময় হইয়া যাইতেন। কয়েক বৎসর পর আবার তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ে যাইতেন। এইভাবে সকল সাধনার অন্তে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন—সব মতই ভাল। কোন ধর্মমতেরই তিনি সমালোচনা করিতেন না; তিনি বলিতেন, বিভিন্ন ধর্মমতগুলি একই সত্যে পৌঁছিবার বিভিন্ন পথ মাত্র। আর তিনি বলিতেনঃ এতগুলি পথ থাকা তো খুবই গৌরবের বিষয়, কারণ, ঈশ্বরলাভের পথ যদি একটিমাত্র হইত, তবে হয়তো উহা একজন ব্যক্তির পক্ষেই উপযোগী হইত। পথের সংখ্যা যত বেশী থাকিবে, ততই আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে সত্যলাভের সুযোগ ঘটিবে। যদি এক ভাষায় শিখিতে না পারি, তবে আর এক ভাষায় শিখিবার চেষ্টা করিব, সকল ধর্মমতের প্রতি তাঁহার এমনই শ্রদ্ধা ছিল।

যে-সকল ভাব আমি প্রচার করিতেছি, সেগুলি তাঁহার চিন্তারাশিরই প্রতিধ্বনি মাত্র। ইহাদের একটিও আমার নিজস্ব নয় শুধু মন্দগুলি ছাড়া। আমার উক্তির মধ্যে যাহা মিথ্যা ও মন্দ, সেইগুলিই আমার। সত্য ও কল্যাণকর যে-সকল কথা আমি উচ্চারণ করিয়াছি, সবই তাঁহার বাণীর প্রতিধ্বনিমাত্র। আপনাদিগকে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার রচিত তাঁহার জীবনচরিত১পড়িয়া দেখিতে বলি।

তাঁহারই চরণপ্রান্তে কয়েকজন যুবকের সহিত একত্র আমি এই ভাবধারা লাভ করিয়াছি। তখন আমি বালকমাত্র। প্রায় ষোল বৎসর বয়সে আমি তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম। অন্যান্য সঙ্গীদের কেহ আরও ছোট, কেহ বা একটু বড়। সবসুদ্ধ বার জন বা কিছু বেশী হইবে। সকলে মিলিয়া এই আর্দশ-প্রচারের কথা ভাবিলাম। শুধু প্রচার নয়, এই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে চাহিলাম। ইহার অর্থ—আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্য দিয়া হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা, বৌদ্ধের করুণা, খ্রীষ্টানের কর্মপ্রবণতা ও ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ফুটাইয়া তোলা। প্রতিজ্ঞা করিলাম, 'এই মুহূর্তেই আমরা একটি বিশ্বজনীন ধর্ম প্রবর্তন করিব; আর বিলম্ব নয়।'

আমাদের বৃদ্ধ গুরুদেব কখনও মুদ্রা স্পর্শ করিতেন না। সামান্য খাদ্য, বস্ত্র যাহা প্রয়োজনীয়, তাহাই তিনি গ্রহণ করিতেন, বেশী কিছু নয়। অন্য কোনরূপ দান তাঁহাকে নেওয়ান যাইত না। আশ্চর্য আধ্যাত্মিক ভাবরাশির সহিত এই নির্বিঘ্নতার ফলে তাঁহার কোনরূপ বন্ধন ছিল না। ভারতীয় সন্ন্যাসী আজ হয়তো রাজবন্ধু, রাজ-অতিথি—কাল তিনি ভিখারী, বৃক্ষতলশায়ী। সকলের সংস্পর্শে তাঁহাকে আসিতে হইবে। সর্বদা তাঁহাকে পরিভ্রমণ করিতে হইবে। প্রবাদ আছে, 'গড়ান পাথরে শেওলা

জমে না।’ গত চৌদ্দ বৎসরকাল আমি কোন স্থানে তিন মাসের বেশী থাকি নাই— সর্বদা ঘুরিয়াছি। আমরা সকলেই ঐরূপ করিয়া থাকি।

মুষ্টিমেয় ঐ কয়টি বালক এই মহান্ ভাবধারার প্রেরণায় নিজেদের জীবন গড়িয়া তুলিতে লাগিল। সর্বজনীন ধর্ম, দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি প্রভৃতি তত্ত্বের দিক্ দিয়া খুবই ভাল—কিন্তু কাজে এগুলি ফুটাইয়া তোলা চাই।

তারপর একদিন গুরুদেবের প্রয়াণকাল উপস্থিত হইল। সকলে মিলিয়া যথাসাধ্য তাঁহার সেবা করিলাম। আমাদের বন্ধু-বান্ধব বিশেষ কেহ ছিল না। এই সব অদ্ভুত ধারণা-পোষণকারী তরুণদের কথা কে-ই বা শুনিবে? অন্ততঃ ভারতবর্ষে তরুণেরা তো কিছুই নয়। একবার ভাবিয়া দেখুন, বারটি বালক মানুষের কাছে বড় বড় আদর্শের কথা বলিতেছে, সেই আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে দৃঢ়সংকল্প। সকলেই হাসিত। হাসি হইতে ক্রমে গুরুতর বিষয়ে পরিণতি ঘটিত। রীতিমত অত্যাচার আরম্ভ হইল। ঠাট্টা-বিদ্রূপ যতই প্রবল হইয়া উঠিল, আমরাও তত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম।

তারপর আসিল দারুণ দুঃসময়—ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে এবং অন্যান্য ভ্রাতাদের পক্ষেও। কিন্তু আমার পক্ষে সে কি নিদারুণ দুর্ভাগ্য। একদিকে মা ও ভাইয়েরা। পিতার মৃত্যুতে আমরা তখন চরম দারিদ্র্যে উপনীত। বেশীর ভাগ দিন না খাইয়া থাকিতে হইত। পরিবারের একমাত্র আমিই আশা-ভরসা—সাহায্য করিবার উপযুক্ত ছিলাম। আমার সম্মুখে তখন দুইটি জগৎ। একদিকে মাতা ও ভ্রাতাদিগকে না খাইয়া মরিতে দেখিতে হইবে; অপর দিকে বিশ্বাস করিতাম যে, গুরুদেবের ভাবধারা ভারতের তথা জগতের পক্ষে কল্যাণকর, সুতরাং এই আদর্শ জগতে প্রচার করিয়া কার্যে পরিণত করিতেই হইবে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই দ্বন্দ্ব চলিল। কখনও কখনও পাঁচ ছয় দিন ধরিয়া অবিরত প্রার্থনা করিতাম। সে কি হৃদয়-বেদনা! আমি তখন দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলাম! তরুণ হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহ আত্মীয়গণের দিকে টানিতেছে—অতি প্রিয়জনদের দুরবস্থা সহ্য করিতে পারিতেছি না। অপর পক্ষে সহানুভূতি জানাইবার একটি লোকও নাই। বালকের কল্পনার প্রতি কে সহানুভূতি দেখাইবে? যে কল্পনার জন্য অপরকে এত কষ্ট পাইতে হয়, সেই কল্পনার প্রতি কাহারই বা সহানুভূতি জাগিতে পারে? একজন ছাড়া কেহই সহানুভূতি জানাইল না।

সেই একজনের সহানুভূতিই আশা ও আশীর্বাদ বহন করিয়া আনিল। তিনি এক নারী। আমাদের মহাযোগী গুরুদেব তাঁহাকে অতি অল্প বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন। পতি যৌবনে ধর্মোন্মাদনায় মগ্ন থাকাকালে একবার পত্নী তাঁহার সহিত দেখা করেন। অতিশৈশবে বিবাহ হইলেও বড় না হওয়া অবধি পত্নী স্বামীকে বিশেষ দেখিতে পান নাই। পরবর্তী কালে পত্নীর সহিত দেখা হইলে পতি বলিলেন, 'দেখ, আমি তোমার স্বামী। এই দেহের উপর তোমার দাবী আছে। কিন্তু বিবাহিত হইলেও যৌন-জীবন যাপন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এ বিষয়ে বিচারের ভার তোমাকেই দিলাম।' পত্নী সাশ্রুনয়নে বলিলেন, 'ভগবান্ তোমার সহায় হউন, তোমায় আশীর্বাদ করুন। আমি কি তোমাকে অধঃপাতে লইয়া যাইব? যদি পারি, তোমাকে সাহায্যই করিব। তুমি তোমার সাধনা লইয়া থাক।'

সেই নারী এরূপ প্রকৃতির ছিলেন। সাধনায় মগ্ন হইয়া স্বামী ক্রমে নিজের ভাবে সন্ন্যাসী হইয়া গেলেন। দূর হইতে পত্নী যথাশক্তি সাহায্য করিতে লাগিলেন। স্বামী যখন অধ্যাত্ম-জগতে এক বিরাট পুরুষ হইয়া দাঁড়াইলেন, স্ত্রী ফিরিয়া আসিলেন। বলিতে গেলে তিনিই তাঁহার প্রথম শিষ্যা। অবশিষ্ট জীবন তিনি স্বামীর সেবায় অতিবাহিত করিলেন। বাঁচিয়া আছেন, কি মরিয়া গিয়াছেন—ঐ লোকোত্তর মহাপুরুষের সে খেয়াল ছিল না। কথা বলিতে বলিতে তিনি এত তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর বসিলেও তাঁহার হুঁশ হইত না। জ্বলন্ত অঙ্গার! সদাসর্বদা তিনি ছিলেন এমনই দেহজ্ঞান-রহিত।

সেই নারী তাঁহারই সহধর্মিণী, তিনি ঐ বালকদের আদর্শের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করিতেন; কিন্তু তাঁহার কোন শক্তি ছিল না। আমাদের অপেক্ষা তিনি দরিদ্র ছিলেন। যাহা হউক আমরা সংগ্রামে ঝাঁপ দিলাম। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতাম যে, এই ভাবধারা একদিন সমগ্র ভারতবর্ষকে যুক্তিপরায়ণ করিয়া তুলিবে এবং নানা দেশ এবং নানা জাতির কল্যাণসাধন করিবে। এই বিশ্বাস হইতেই স্থির প্রতীতি জন্মিল যে, এই ভাবরাশি নষ্ট হওয়া অপেক্ষা কয়েক জন লোকের দুঃখ-বরণ করা ভাল। একজন মা ও দুইটি ভাই যদি মরে, কি আসে যায়? এও তো ত্যাগ। ত্যাগ কর—ত্যাগ ছাড়া কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন হয় না। বক্ষ চিরিয়া হৃৎপিণ্ড বাহির করিতে হইবে এবং সেই রক্তসিক্ত হৃদয় বেদীমূলে উৎসর্গ দিতে হইবে। তবেই তো মহৎ কার্য সাধিত হয়। অন্য কোন পথ আছে কি? কেহই সেই পথ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। আপনাদের মধ্যে

যে-কেহ কোন মহৎ কার্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহাকেই ভাবিয়া দেখিতে বলি। সে কী বিরাট মূল্য! সে কী বেদনা! কী নিদারুণ যন্ত্রণা! প্রত্যেকের জীবনে প্রতিটি সফলতার পিছনে কী ভয়ানক দুঃখভোগ থাকে, তাহা তো আপনাদের সকলেরই জানা আছে।

এইভাবেই আমাদের সেই তরুণ দলটির দিন কাটিতে লাগিল। চারিপাশের সকলের নিকটে অপমান ও লাঞ্ছনাই পাইলাম। অবশ্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অন্ন সংগ্রহ করিতে হইত। এখানে ওখানে দু-এক টুকরা রুটি মিলিত। একটি অতি পুরাতন ভগ্নপ্রায় বাড়ী বাসস্থান হিসাবে জুটিল, উহার তলায় গোখুরা সাপের বাসা, তাহাদের ফোঁস ফোঁস শব্দ শোনা যাইত। অল্প ভাড়ায় বাড়ী পাওয়ায় আমরা সেই গৃহে গিয়া বাস করিতে লাগিলাম।

এইরূপে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল। ইতোমধ্যে ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিলাম। উদ্দেশ্য—ক্রমশঃ এই ভাবধারা প্রচারের চেষ্টা। দশ বৎসর কাটিয়া গেল—কোন আলোকরেখাই দেখিতে পাইলাম না! দশটি বৎসর! সহস্রবার হতাশা আসিল; কিন্তু একটি জিনিষ আমাদের সর্বদা আশান্বিত করিয়া রাখিয়াছিল—সেটি হইল আমাদের পরস্পরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও গভীর ভালবাসা। প্রায় একশত নরনারী আমার চারিপাশে রহিয়াছে; কাল যদি আমি সাক্ষাৎ শয়তান হইয়া যাই, তাহারা বলিবে, 'আমরা এখনও আছি! আমরা তোমাকে কখনই ত্যাগ করিব না!' এই ভালবাসাই পরম আশীর্বাদ।

সুখে দুঃখে, দুর্ভিক্ষে যাতনায়, শ্মশানে, স্বর্গে বা নরকে যে আমাকে কখনই ত্যাগ করে না, সে-ই তো বন্ধু। এ বন্ধুত্ব কি তামাসা? এমন বন্ধুত্বের দ্বারা মোক্ষ-লাভও সম্ভব। আমরা যদি এমনভাবে ভালবাসিতে পারি, তবে এই ভালবাসাই আমাদের মুক্তি আনিয়া দিবে। এই বিশ্বস্ততার মধ্যেই একাগ্রতার সার নিহিত। যদি তোমার সেই বিশ্বাস, সেই শক্তি, সেই ভালবাসা থাকে, তবে জগতে তোমার কোন দেবার্চনার প্রয়োজন নাই। সেই দুঃখের দিনে এই ভালবাসাই আমাদের হৃদয়ে সদা জাগ্রত ছিল। সেই ভালবাসাই আমাদিগকে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা এবং সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত পরিচালিত করিয়াছিল।

সেই তরুণদলটি এইভাবে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলাম। শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষেত্রেই বিরুদ্ধাচরণ

পাইলাম, সাহায্য আসিল অতি অল্পক্ষেত্রে। কারণ একটি দোষ আমাদের ছিল—আমরা ছিলাম দুঃখদারিদ্র্যে রুক্ষচিত্ত। জীবনে যাহাকে নিজের পথ নিজেই করিয়া লইতে হয়, সে একটু রুক্ষ হয়; শান্ত কোমল ও ভদ্র হইবার—'ভদ্র মহোদয় ও মহোদয়া' ইত্যাদি বলিবার বেশী সময় তাহার থাকে না। নিজেদের জীবনেই আপনারা উহা সর্বদা লক্ষ্য করিয়াছেন। এইরূপ ব্যক্তি যেন একটি আধারে অযত্নরক্ষিত অমসৃণ হীরকখণ্ড।

আমরা ঠিক সেইরূপ ছিলাম। 'কোন আপস চলিবে না।'—এই ছিল আমাদের মূলমন্ত্র। 'ইহাই আদর্শ এবং এ আদর্শ কার্যে পরিণত করিতে হইবে। মরিয়াও—রাজার নিকট যেমন এ আদর্শ প্রচার করিব, চাষার নিকট তেমনি এ আদর্শ তুলিয়া ধরিব।' স্বভাবতই আমরা বিরোধিতার সম্মুখীন হইলাম।

কিন্তু মনে রাখিবেন, ইহাই জীবনের অভিজ্ঞতা; যদি আপনি যথার্থই পরের মঙ্গল কামনা করেন, বিশ্বজগৎ আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াও কিছুই করিতে পারিবে না। আপনার শক্তির নিকট তাহারা পরাস্ত হইবেই। যদি আপনি আন্তরিক ও প্রকৃতই নিঃস্বার্থ হন, স্বয়ং ঈশ্বরের সমস্ত শক্তি আপনার মধ্যে জাগ্রত থাকিয়া সমস্ত বাধা বিপত্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করিবে। সেই বালকের দল এমনি ছিল। তাহারা ছিল প্রকৃতির হাত হইতে সদ্যোনিঃসৃত শিশুর মত পবিত্র; গুরুদেব বলিতেন, 'ভগবানের বেদীমূলে আমি অনাঘ্রাত পুষ্প ও অস্পৃষ্ট ফলই নিবেদন করিতে চাই।' মহাপুরুষের সেই বাণী আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিত। কলিকাতার পথে তিনি যে-সব বালককে যেন কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন, তাহাদের ভবিষ্যৎ তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন। 'এই ছেলেটি বা ঐ তরুণটি ভবিষ্যতে কী হয়, দেখিও'—তাঁহার এই ধরনের কথা শুনিয়া লোকে ঠাট্টা করিত। অবিচলিত বিশ্বাসে তিনি বলিতেন, 'মা আমাকে ইহা দেখাইয়া দিয়াছেন। আমি নিজে দুর্বল হইতে পারি, কিন্তু মা যখন এরূপ বলিয়াছেন, তখন তাঁহার ভুল হওয়া কখনও সম্ভব নয়। এইরূপ হইবেই।'

দশটি বৎসর কোন আশার আলো ছাড়াই কাটিয়া গেল। ইতোমধ্যে আমার শরীর ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। কখনও রাত্রি নয়টায় একবেলা আহার কখনও ভোরে আটটায় একবেলা আহার, তাও আবার তিনদিন পরে—এবং সর্বদাই অতি সামান্য কদর্য অন্ন। পরিণামে শরীরের উপর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ভিখারীকে কে-ই বা ভাল খাবার দেয়? আবার ভাল জিনিষ দিবার সামর্থ্যও ভারতবাসীর নাই। শুধু একবেলা

আহারের জন্য বেশীর ভাগ সময় পায়ে হাঁটিয়া, তুষারশৃঙ্গ চড়াই করিয়া, কখনও দশ মাইল পথ দুর্গম পর্বত চড়াই করিয়া চলিয়াছি। ভারতবর্ষে রুটিতে খাম্বির দেয় না। কখনও কখনও এই খাম্বির-না-দেওয়া রুটি বিশ-ত্রিশদিন ধরিয়া সঞ্চিত রাখা হয়, তখন ইহা ইঁটের চেয়েও শক্ত হয়। ভিখারীকে সেই রুটির অংশ দেওয়া হয়। একবেলা আহারের বন্দোবস্ত করিবার জন্য আমাকে দ্বারে দ্বারে ফিরিতে হইত। তদুপরি এই ইঁটের মত শক্ত রুটি চিবাইতে গিয়া মুখ দিয়া রক্ত পড়িত। এই রুটি চিবাইতে সত্য সত্যই দাঁত ভাঙে। নদী হইতে জল আনিয়া একটি পাত্রে ঐ রুটি একটি পাত্রে ভিজাইয়া রাখিতাম। মাসের পর মাস ঐভাবে থাকিতে হইয়াছে—ফলে শরীর অবশ্যই খারাপ হইতেছিল।

তারপর ভাবিলাম, ভারতবর্ষে চেষ্টা করিয়াছি, এবার অন্য দেশে করা যাক। এমনি সময় আপনাদের ধর্ম-মহাসভার অধিবেশন হইবার কথা ছিল। ভারতবর্ষ হইতে একজনকে ঐ সভায় প্রেরণ করিতে হইবে। আমি তখন একজন ভবঘুরে। তবু বলিলাম, 'ভারতবাসী তোমরা আমাকে প্রেরণ করিলে আমি যাইব। আমার কোন ক্ষতির ভয় নাই, ক্ষতি যদি হয় তাহাও গ্রাহ্য করি না।' অর্থ সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। অনেক দিনের আপ্রাণ চেষ্টায় শুধু আসিবার খরচ যোগাড় হইল; এবং আমি এদেশে আসিলাম। ধর্ম-মহাসভার দুই-এক মাস পূর্বে আমি আসিলাম, এবং পরিচয়হীন অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইলাম।

তারপর ধর্ম-মহাসভা আরম্ভ হইল, সেই সময় কতিপয় সহৃদয় বন্ধুর সহিত আলাপ হইলে তাঁহারা আমাকে খুবই সাহায্য করিলেন। কিছু কিছু অর্থ-সংগ্রহ, দুইটি পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতি যৎসামান্য কাজ আরম্ভ করিলাম। তারপর ইংলণ্ডে গেলাম। সেখানেও কাজ চলিল। সেই সময় আমেরিকায় থাকিয়াও ভারতের জন্য কাজ চালাইলাম।

ভারতের জন্য আমার পরিকল্পনা যেভাবে রূপ পাইয়াছে এবং কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, তাহা এইঃ আমি আপনাদিগকে ভারতের সন্ন্যাসীদের কথা বলিয়াছি। কেমন করিয়া আমরা কোনরূপ মূল্য গ্রহণ না করিয়া অথবা একখণ্ড রুটির মূল্যে দ্বারে দ্বারে ধর্মপ্রচার করিয়া থাকি, তাহাও বলিয়াছি। সেইজন্যই ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের ব্যক্তিও ধর্মের মহত্তম ভাবরাশি ধারণ করে। এ সকলই এই সন্ন্যাসীদের কাজ। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যায়—'ইংরেজ কাহারা?' সে উত্তর দিতে পারিবে না। হয়তো বলিবে, 'পুঁথিতে যে-সব দৈত্যদানবের কথা আছে—ইংরেজরা তাহাদেরই

বংশধর—তাই না?' 'তোমাদের শাসন- কর্তা কে?' 'জানি না।' 'শাসনতন্ত্র কি?'—তাহারা জানে না। কিন্তু দর্শনের মূলতত্ত্ব তাহারা জানে। যে ইহজগতে তাহারা দুঃখকষ্ট ভোগ করে, সেই জগৎ সম্বন্ধে তাহাদের ব্যবহারিক জ্ঞানেরই অভাব। এই সব লক্ষ লক্ষ মানুষ পরলোকের জন্য প্রস্তুত—এই কি যথেষ্ট? কখনই নয়। একটুকরা ভাল রুটি এবং একখণ্ড ভাল কম্বল তাহাদের প্রয়োজন। বড় প্রশ্ন এই, এ-সকল লক্ষ লক্ষ পতিত জনগণের জন্য সেই ভাল রুটি আর ভাল কম্বল কোথা হইতে মিলিবে?

প্রথমেই আপনাদিগকে বলিব, তাহাদের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে, কারণ পৃথিবীতে তাহারা সবচেয়ে শান্ত জাতি। তাহারা যে ভীরু, তা নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে তাহারা অসুর-পরাক্রমে যুদ্ধ করে। ইংরেজের শ্রেষ্ঠ সৈন্যদল ভারতীয় কৃষক-সম্প্রদায় হইতে সংগৃহীত। মৃত্যুকে তাহারা গ্রাহ্য করে না। তাহাদের মনোভাব এইঃ 'এ জন্মের পূর্বে অন্তত বিশ বার মরিয়াছি, হয়তো তারপর আরও অসংখ্যবার মরিব। তাহাতে কী আসে যায়?' তাহারা কখনও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে না। বিশেষ ভাবপ্রবণ না হইলেও যোদ্ধা হিসাবে তাহারা ভাল।

তাহাদের জন্মগত প্রবৃত্তি অবশ্য কৃষিকর্মে। আপনি তাহাদের সর্বস্ব কাড়িয়া লউন, তাহাদের হত্যা করুন, করভারে জর্জরিত করুন, যাহা ইচ্ছা করুন—যতক্ষণ তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে ধর্ম আচরণ করিতে দিতেছেন, তাহারা শান্ত ও নম্র থাকিবে। তাহারা কখনও অন্যের ধর্মে হস্তক্ষেপ করে না। 'আমাদের ভাবানুযায়ী ঈশ্বরের আরাধনা করিবার অধিকার আমাদের দাও আর সব কাড়িয়া লও'—ইহাই তাহাদের মনোভাব। ইংরেজরা যখনই ঐ জায়গায় হস্তক্ষেপ করে, অমনি গণ্ডগোল শুরু হয়। উহাই ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ—ধর্ম লইয়া নির্যাতন ভারতবাসী সহ্য করিবে না। ভারতবাসীর ধর্মে হস্তক্ষেপ করিতে গিয়াই বিশাল মুসলমান রাজ্যগুলি একেবারে ফাটিয়া বিলয় পাইল।

অধিকন্তু ভারতের জনসাধারণ শান্ত, নম্র, ভদ্র—সর্বোপরি তাহারা পাপাসক্ত নয়। কোনপ্রকার উত্তেজিত মাদকদ্রব্য প্রচলিত না থাকায় তাহারা অন্য যে কোন দেশের জনসাধারণ অপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। এখানকার বস্তি-জীবনের সহিত তুলনা করিয়া আপনারা ভারতবর্ষের দরিদ্র জনসাধারণের সুন্দর নৈতিক জীবন বুঝিতে পারিবেন না। বস্তি মানেই দারিদ্র্য! কিন্তু ভারতবর্ষে দারিদ্র্যের অর্থ পাপ, অশ্লীলতা ও অপরাধ-প্রবণতা নয়। অন্যান্য দেশে এমন ব্যবস্থা যে, নোংরা ও অলস ব্যক্তিরাই

দারিদ্র্য হয়! নগর-জীবন ও উহার বিলাসব্যসন চায়, এমন মূর্খ বা বদমাশ ব্যতীত আর কাহাকেও এ-সব দেশে দরিদ্র থাকিতে হয় না। তাহারা কিছুতেই গ্রামে যাইবে না। তাহারা বলে, 'আমরা এই শহরেই বেশ ফূর্তিতে আছি। তোমরা অবশ্যই আমাদের আহার যোগাইবে।' ভারতবর্ষের ব্যাপার এরূপ নয়, সেখানে গরীবেরা উদয়াস্ত খাটিয়া মরে, আর এক জন আসিয়া তাহাদের শ্রমের ফল কাড়িয়া লয়। তাহাদের সন্তানেরা উপবাসী থাকে। লক্ষ লক্ষ টন গম ভারতে উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও ক্বচিৎ কখনও একটি কণা কৃষকের মুখে যায়। আপনারা পশু-পক্ষীকেও যে শস্য খাওয়াইতে চান না, ভারতের কৃষক সেই শস্যে প্রাণধারণ করে।

এই পবিত্র সরল কৃষককূল কেন দুঃখভোগ করিবে? ভারতের নিমজ্জমান জনসাধারণ ও অবনমিত নারীসমাজের কথা আপনারা এত শুনিতে পান, কিন্তু কেহই তো আমাদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হন না। অনেকে বলেনঃ 'তোমরা যদি আমাদের নিজেদের স্বভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তন কর, তবেই তোমরা ভাল হইবে, তবেই তোমাদের সাহায্য করা চলে। হিন্দুদের সাহায্য করা বৃথা।' কিন্তু ইঁহারা বিভিন্ন জাতির ইতিহাস জানেন না। ভারতবাসী যদি তাহাদের ধর্ম ও আনুষঙ্গিক রীতিনীতিগুলি পরিবর্তন করে, তবে আর ভারতবর্ষ থাকিবে না, কারণ ধর্মই ভারতবাসীর প্রাণশক্তি। ভারতীয় জাতিই লুপ্ত হইয়া গেলে আপনাদের সাহায্য গ্রহণ করিবার জন্য সেখানে আর কেহই থাকিবে না।

আর একটি মহৎ শিক্ষণীয় বিষয় আছে, বস্তুতঃ আপনারা কাহাকেও সাহায্য করিতে পারেন না। আমরা কে কাহার জন্য কি করিতে পারি? আপনি আপনার রীতি অনুসারে গড়িয়া উঠিতেছেন, আর আমি আমার ভাবে। সকল পথই শেষ পর্যন্ত রোমে আসিয়া মিলিত হয়—এ কথাটি মনে রাখিয়া আমি হয়তো আপনাদের জীবনে কিছুটা গতি সঞ্চার করিতে পারি। জাতীয় জীবন ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। এ পর্যন্ত কোন জাতিগত সভ্যতাই সম্পূর্ণ সার্থক হয় নাই। ঐ সভ্যতাকে কিছুটা আগাইয়া দাও, তবেই উহা স্বীয় লক্ষ্যে পৌঁছিবে। ঐ সভ্যতাকে আমূল পরিবর্তিত করিতে চেষ্টা করিবেন না। একটি জাতির প্রচলিত প্রথা, নিয়মকানুন, রীতিনীতি বাদ দিলে তাহার আর কী অবশিষ্ট থাকে? ঐগুলিই জাতিকে সংহত করিয়া রাখে।

কিন্তু অতি পণ্ডিত এক বিদেশী আসিয়া বলিলেন, ‘দেখ, তোমাদের সহস্র বৎসরের রীতিনীতি নিয়ম-কানুন ছাড়িয়া দিয়া আমার এই নিরেট পাত্রটি গ্রহণ কর।’—ইহা নিতান্ত মূর্খতা।

পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে হইবে, কিন্তু এ-বিষয়ে আমাদের আর একটু অগ্রসর হইতে হইবে। সাহায্য করিতে গিয়া নিঃস্বার্থ হওয়ার প্রয়োজন। ‘আমি তোমাকে যেরূপ করিতে বলি, ঠিক সেরূপ করিলে তবে তোমায় সাহায্য করিব, নতুবা নয়।’—ইহার নাম কি সাহায্য?

অতএব হিন্দু যদি তোমাদিগকে আধ্যাত্মিক সাহায্য করিতে চায়, সে সাহায্যে নিয়ন্ত্রণের কোন প্রশ্ন থাকিবে না; সাহায্য—সেবা, পূর্ণ নিঃস্বার্থতা। আমি দিলাম, এখানেই উহা শেষ। আমার নিকট হইতে উহা চলিয়া গেল। আমার মন, আমার শক্তি, আমার যাহা কিছু দিবার আছে, সব দিয়াছি, দেওয়ার ভাব লইয়াই দিয়াছি, আর কিছু নয়। অনেক সময় দেখিয়াছি, যাহারা অর্ধেক পৃথিবী শোষণ করিয়া ফিরিয়াছে, তাহারাই ‘অসভ্য’ হিদেনদিগকে ধর্মান্তরিত করিবার কাজে কুড়ি হাজার ডলার দান করিয়াছে। কিসের জন্য? ঐ হিদেনদের উপকারের জন্য, না তাহাদের নিজেদের আত্মার পরিত্রাণের জন্য? একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি।

পাপের সমুচিত ফল ফলিতেছে। আমরা মানুষেরা নিজের চক্ষুকেই ফাঁকি দিতে চাই। কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে স্ব-স্বরূপে তিনি সদা বিরাজিত। তিনি তো কোনদিন ভোলেন না। আমরা কোনদিনই তাঁহাকে প্রতারিত করিতে পারি না। তাঁহার চোখকে কখনই ফাঁকি দেওয়া যায় না। যথার্থ পরোপকারের প্রেরণা সহস্র বৎসর পরেও ফলবতী হয়। বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সুযোগ পাইলেই তাহা আবার বজ্রের মত ফাটিয়া পড়িতে চায়। আর যে ভাবাবেগের পশ্চাতে স্বার্থান্বেষী মনোবৃত্তি থাকে—সংবাদপত্রে শিরোনামার সমারোহ

এবং লক্ষ লক্ষ লোকের করতালি লাভ করিলেও উহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবেই। আমি কোন প্রকার গর্ব করিয়া বলিতেছি না, কিন্তু মনে রাখিবেন—আমি আপনাদিগকে সেই মুষ্টিমেয় যুবকদের কথা বলিতেছি। আজ ভারতবর্ষে এমন একটি গ্রাম নাই, এমন নরনারী নাই, যাহারা তাহাদের কাজ জানে না এবং তাহাদিগকে আন্তরিক আশীর্বাদ করে না। এমন একটি দুর্ভিক্ষ নাই, যেখানে এই যুবকদল ঝাঁপাইয়া পড়িয়া যতগুলি

মানুষকে পারে বাঁচাইবার চেষ্টা করে না। এই সেবা হৃদয়কে স্পর্শ করিবেই। দেশবাসী তাহাদের কথা জানিতে পারিয়াছে। যখনই সম্ভব, তাহাদের সাহায্য করুন, কিন্তু সেই সাহায্যের পিছনে কী উদ্দেশ্য কাজ করিতেছে, লক্ষ্য রাখিবেন। স্বার্থপূর্ণ হইলে সেই দান দাতা বা গ্রহীতা—কাহারও উপকারে আসিবে না। সাহায্য যদি নিঃস্বার্থ হয়, তবে উহা গ্রহীতার পক্ষে কল্যাণকর হইবে, এবং লক্ষগুণ কল্যাণকর হইবে আপনার নিজের পক্ষে; আপনার জীবন যেমন সত্য, এ-কথা তেমনি নিশ্চিত সত্য, জানিবেন। জগদীশ্বরকে কখনও ফাঁকি দেওয়া যায় না। কর্মফলকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব। সুতরাং আমার পরিকল্পনাগুলি ভারতের জনগণকে লক্ষ্য করিয়া। ধরুন, আপনি সমগ্র ভারতবর্ষে বিদ্যালয় স্থাপন করিতে শুরু করিলেন, তথাপি আপনি তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে পারিবেন না। কেমন করিয়া পারিবেন? চার বৎসরের একটি ছেলে বরং লাঙ্গল ধরিবে, অথবা অন্য কোন কাজ করিবে, তবু সে আপনার বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইবে না। তাহার পক্ষে বিদ্যালয়ে যাওয়া অসম্ভব। আত্মরক্ষাই মানুষের প্রথম প্রেরণা। কিন্তু যদি পর্বত মহম্মদের কাছে না আসে, মহম্মদকেই পর্বতের নিকট যাইতে হইবে। আমি বলি, শিক্ষা কেন দ্বারে দ্বারে যাইবে না? চাষার ছেলে যদি বিদ্যালয়ে আসিতে না পারে, তাহা হইলে কৃষিক্ষেত্রে অথবা কারখানায়—যেখানে সে আছে, সেখানেই তাহাকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। ছায়ার মত তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাও। শত সহস্র সন্ন্যাসী জনসাধারণকে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বিদ্যা দান করিতেছেন; কেন এই সন্ন্যাসীরাই জাগতিক ক্ষেত্রেও বিদ্যাবুদ্ধি বিতরণ করিবেন না? জনসাধারণের কাছে তাঁহারা ইতিহাস বা অন্যান্য বহু বিষয়ের কথা বলিবেন না কেন? শ্রবণের মাধ্যমেই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা লাভ হয়। যে শিক্ষা আমরা মায়েদের কাছ হইতে কানে শুনিয়া লাভ করিয়াছি, উহাই আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। গ্রন্থাদি অনেক পরে দেখা দিয়াছে। পুঁথিগত বিদ্যা কিছুই নয়। কানে শুনিয়া আমরাই চরিত্র-গঠনকারী শ্রেষ্ঠ নীতিসমূহ পাই। তারপর জনসাধারণের আগ্রহ যখন বাড়িবে, তখন তাহারা আপনাদের বইও পড়িবে। প্রথমে কাজ শুরু করিয়া দেওয়া যাক—ইহাই আমার মনোভাব।

দেখুন, আপনাদিগকে অবশ্যই বলিব সন্ন্যাস-ব্যবস্থায় আমি খুব বেশী বিশ্বাসী নই। ঐ ব্যবস্থার অনেক গুণ আছে, অনেক দোষও আছে। সন্ন্যাসী ও গৃহস্থদের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকা উচিত। কিন্তু ভারতে সন্ন্যাস আশ্রমের প্রতিই সমস্ত শক্তি আকৃষ্ট হইয়াছে। আমরা সন্ন্যাসীরা শ্রেষ্ঠ শক্তির প্রতীক। সন্ন্যাসী রাজার চেয়ে বড়। ভারতবর্ষে

এমন কোন শাসক-নৃপতি নাই, যিনি ‘গৈরিকবসন’-ধারীর সম্মুখে বসিয়া থাকিতে সাহস করেন। তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ান। যদিও এই সন্ন্যাসীরাই জনগণের আত্মরক্ষার প্রধান অবলম্বন। তবুও ভাল লোকের হাতেও এত ক্ষমতা থাকা ঠিক নয়। সন্ন্যাসীরা পৌরোহিত্য ও অধ্যাত্মজ্ঞানের মাঝখানে দণ্ডায়মান। তাঁহারা জ্ঞানবিস্তার ও সংস্কারের কেন্দ্রস্বরূপ! ইঁহারা ঠিক য়াহুদীদের ভাববাদীদের (Prophets) মত, এই মহাপুরুষগণ সর্বদা পৌরোহিত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া কুসংস্কার দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। ভারতবর্ষের সন্ন্যাসীরাও এই ধরনের। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এতখানি ক্ষমতা সেখানে ভাল নয়। অন্য কোন উন্নততর পন্থা আবিষ্কার করিতে হইবে। কিন্তু স্বল্পতম বাধার পথেই কাজ করা সম্ভব। সমগ্র জাতির আত্মা সন্ন্যাসের পক্ষপাতী। আপনি ভারতবর্ষে গৃহস্থরূপে কোন ধর্ম প্রচার করুন, হিন্দু জনসাধারণ বিমুখ হইয়া প্রস্থান করিবে। যদি আপনি সংসার ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে হিন্দুরা বলিবে, ‘লোকটি ভাল, সংসার-ত্যাগী, খাঁটি লোক, মুখে যা বলে কাজেও তাই করে।’ আমি যাহা বলিতে চাহিতেছি, তাহা এই যে সন্ন্যাস একটি অসাধারণ শক্তির প্রতীক। আমরা এইটুকু করিতে পারি, ইহার রূপান্তর সাধন করিতে পারি, অন্য রূপ দিতে পারি— পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদের হাতে অবস্থিত এই প্রচণ্ড শক্তির রূপান্তর ঘটাইতে হইবে, উহাই জনসাধারণকে উন্নত করিয়া তুলিবে।

পরিকল্পনাটি এতক্ষণে কাগজে কলমে সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলি, আমি আদর্শবাদের স্তর হইতেই এ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলাম। এ পর্যন্ত পরিকল্পনাটি শিথিল ও আদর্শবাদীই ছিল। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই উহা সংহত ও নিখুঁত হইতে লাগিল; প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে নামিয়া আমি উহার ত্রুটি প্রভৃতি লক্ষ্য করিলাম।

বাস্তব ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ করিতে গিয়া আমি কী আবিষ্কার করিলাম? প্রথমতঃ এই সন্ন্যাসীদের কি ভাবে লোকশিক্ষা দিতে হইবে সেই বিষয়ে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার কেন্দ্র থাকা প্রয়োজন। যেমন ধরুন, আমার একটি লোককে আমি ক্যামেরা দিয়া পাঠাইলাম; তাহাকে ঐ-সকল বিষয়ে সর্বপ্রথম শিক্ষিত হইতে হইবে। ভারতবর্ষে প্রায় সব লোকই অশিক্ষিত, সুতরাং শিক্ষার জন্য প্রচণ্ড শক্তিশালী বহু কেন্দ্র প্রয়োজন। ইহার অর্থ কি দাঁড়ায়?—টাকা। আদর্শবাদের জগৎ হইতে আপনি প্রতিদিনের কর্মক্ষেত্রে নামিয়া আসিলেন।

আমি আপনাদের দেশে চার বৎসর ও ইংলণ্ডে দুই বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়াছি। কয়েকজন বন্ধু আমাকে সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া আমি কৃতজ্ঞ। তাঁহাদের একজন আজ আপনাদের মধ্যেই এখানে আছেন। আমেরিকান ও ইংরেজ বন্ধুরা আমার সঙ্গে ভারতে গিয়াছেন এবং অতি-সাধারণভাবে কাজের সূচনা হইয়াছে। কয়েকজন ইংরেজ সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে এক বেচারী তো অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া ভারতে মৃত্যুই বরণ করিলেন। এক ইংরেজ দম্পতি অবসর গ্রহণ করিয়া, নিজেদের সামান্য যাহা কিছু সংস্থান আছে, তাহা দ্বারা হিমালয়ে একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া শিক্ষা প্রচার করিতেছেন। আমি তাঁহাদিগকে আমার দ্বারা স্থাপিত 'প্রবুদ্ধ ভারত' (Awakened India) নামে একটি পত্রিকার ভার দিয়াছি। তাঁহারা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাদান ও অন্যান্য কাজে ব্রতী আছেন। আমার আর একটি কেন্দ্র আছে কলিকাতায়। সকল বৃহৎ আন্দোলনই রাজধানী হইতে আরম্ভ করা প্রয়োজন। রাজধানী কাহাকে বলে? রাজধানী একটি জাতির হৃৎপিণ্ড। সমুদয় রক্ত হৃৎপিণ্ডে আসিয়া জমা হয়, সেখান হইতে সর্বত্র সঞ্চারিত হয়; তেমনি সব সম্পদ্, সব ভাবাদর্শ, সব শিক্ষা, সব আধ্যাত্মিকতা প্রথমে রাজধানীর অভিমুখে গিয়া সে-স্থান হইতে অন্যত্র সঞ্চারিত হয়।

আপনাদিগকে আমি আনন্দের সহিত বলি যে, সাধারণভাবে কাজটি আরম্ভ করিতে পারা গিয়াছে। কিন্তু ঠিক ঐরূপ কাজ আমি সমান্তরালভাবে মেয়েদের জন্যও করিতে চাই। আমার আদর্শ—প্রত্যেকে স্বাবলম্বী হইবে। আমার সাহায্য শুধু দূর হইতে। ভারতীয় নারী, ইংরেজ নারী এবং আশা করি, আমেরিকান নারীরাও এই ব্রত গ্রহণ করিবে। যখনই তাহারা কাজে হাত দিবে, অমনি আমি হাত গুটাইয়া লইব। কোন পুরুষ নারীর উপর হুকুম চালাইবে না। কোন নারীও পুরুষের উপর হুকুম চালাইবে না। প্রত্যেকেই স্বাধীন। যদি কোন বন্ধন থাকে, তবে তাহা কেবল প্রীতির বন্ধন। পুরুষ নারীর জন্য যাহা করিয়া দিতে পারে, তাহা অপেক্ষা নারী অনেক ভালভাবে নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবে। পুরুষেরা মেয়েদের ভাগ্য গঠনের ভার গ্রহণ করাতেই নারীজাতির যত কিছু অনিষ্ট হইয়াছে। একটি প্রারম্ভিক ভুল লইয়া আমি কাজ শুরু করিতে চাই না। একটি ক্ষুদ্র ভ্রান্তি ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া চলিবে এবং শেষ অবধি এত বৃহৎ আকার ধারণ করিবে যে, উহাকে সংশোধন করা কঠিন হইয়া পড়িবে। সুতরাং আমি যদি ভুল করিয়া পুরুষকে নারীর কর্মধারা নির্ণয় করিবার কাজে লাগাই, তাহা হইলে নারীরা কখনও ঐ নির্ভরতার ভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না—উহাই প্রথা

হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু আমার একটি সুবিধা আছে। আপনাদিগকে আমার গুরুদেবের সহধর্মিণীর কথা বলিয়াছি। আমাদের সকলেরই তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। তিনি কখনও আমাদের উপর হুকুম চালান না। সুতরাং ব্যাপারটি সম্পূর্ণ নিরাপদ। কর্মের এই অংশটি নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

২. ভারতবন্ধু অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার

[৬ জুন, ১৮৯৬ খ্রীঃ লণ্ডন হইতে 'ব্রহ্মবাদিন্'২ পত্রিকার জন্য লিখিত।]

'ব্রহ্মবাদিন্'—সম্পাদক মহাশয়,

আমাদের 'ব্রহ্মবাদিনের' পক্ষে কর্মের আদর্শ চিরকালই থাকিবে—'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন,' কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে কখনই নয়—তথাপি কোন অকপট কর্মীই খানিকটা জানাজানি এবং সমাদর লাভ না করিয়া কর্মক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতে পারেন না।

আমাদের কার্যের আরম্ভ খুবই ভাল হইয়াছে, আর আমাদের বন্ধুগণ এই বিষয়ে যে দৃঢ় আন্তরিকতা দেখাইয়াছেন, শতমুখে তাহার প্রশংসা করিলেও পর্যাপ্ত বলা হইল বলিয়া বোধ হয় না। অকপট বিশ্বাস ও সৎ অভিসন্ধি নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে, আর এই দুই অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিও নিশ্চয়ই সর্ববিঘ্ন পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে।

কপট অলৌকিক জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিগণ হইতে সর্বদা দূরে থাকিবে। অলৌকিক জ্ঞান হওয়া যে অসম্ভব—তাহা নয়, তবে বন্ধুগণ, তোমরা জানিবে যে, আমাদের এই জগতে যাহারা এরূপ জ্ঞানের দাবী করে, তাহাদের মধ্যে শতকরা নব্বই-জনের কাম-কাঞ্চন-যশঃস্পৃহারূপ গুপ্ত অভিসন্ধি আছে, আর বাকী দশজনের মধ্যে নয়জন লোকের দরকার দার্শনিকগণের অপেক্ষা চিকিৎসকগণের সতর্ক মনোযোগ।

আমাদের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন—চরিত্রগঠন, যাহাকে 'প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞা' বলা যায়। ইহা যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির আবশ্যক, ব্যক্তির সমষ্টি সমাজেও তদ্রূপ। প্রত্যেক নূতন উদ্যম, এমন কি ধর্মপ্রচারের নূতন উদ্যমও জগৎ সন্দেহের চক্ষে দেখে বলিয়া বিরক্ত

হইও না। তাহাদের অপরাধ কি? কতবার কত লোকে তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে! যতই সংসার কোন নূতন সম্প্রদায়কে সন্দেহের চোখে দেখে, অথবা উহার প্রতি কতকটা বৈরভাবাপন্ন হয়, ততই উহার পক্ষে মঙ্গল। যদি এই সম্প্রদায়ে প্রচারের উপযুক্ত কোন সত্য থাকে, যদি বাস্তবিক কোন অভাব-মোচনের জন্যই উহার জন্ম হইয়া থাকে, তবে শীঘ্রই নিন্দা প্রশংসায় এবং ঘৃণা প্রীতিতে পরিণত হয়। আজকাল লোকে ধর্মকে কোনরূপ সামাজিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়রূপে গ্রহণ করে। এই বিষয়ে সাবধান থাকিবে। ধর্মের উদ্দেশ্য ধর্ম। যে ধর্ম কেবল সাংসারিক সুখের উপায়স্বরূপ, তাহা আর যাহাই হউক, ধর্ম নয়। আর অবাধে ইন্দ্রিয়সুখভোগ ব্যতীত মনুষ্যজীবনের অপর কোন উদ্দেশ্য নাই—এ-কথা বলিলে ঈশ্বরের এবং মানুষের বিরুদ্ধে ঘোরতর অপরাধ করা হয়।

যে ব্যক্তিতে সত্য, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থপরতা বর্তমান, স্বর্গে মর্ত্যে বা পাতালে এমন কোন শক্তি নাই যে, তাঁহাকে চাপিয়া মারিতে পারে। এইগুলি সম্বল থাকিলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বিপক্ষে দাঁড়াইলেও একলা এক ব্যক্তি সেই প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইতে পারে।

সর্বোপরি আপস করিতে যাওয়া বিষয়ে সাবধান! আমার এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, কাহারও সহিত বিরোধ করিতে হইবে; কিন্তু সুখেই হউক, দুঃখেই হউক, নিজের ভাব সর্বদা ধরিয়া থাকিতে হইবে, দল বাড়াইবার উদ্দেশ্যে তোমার মতগুলি অপরের নানারূপ খেয়ালের অনুযায়ী করিতে যাইও না। তোমার আত্মাই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, তোমার আবার অন্য আশ্রয়ের প্রয়োজন কি? সহিষ্ণুতা, প্রীতি ও দৃঢ়তার সহিত অপেক্ষা কর; যদি এখন কোন সাহায্যকারী না পাও, সময়ে পাইবে। তাড়াতাড়ির আবশ্যকতা কি? সমস্ত মহৎ কার্যেরই আরম্ভের সময় উহার প্রাণশক্তির অস্তিত্বই যেন ধরিতে পারা যায় না।

কে ভাবিয়াছিল যে, সুদূর বঙ্গীয় পল্লীগ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণতনয়ের জীবন ও উপদেশ এই কয়েক বৎসরের মধ্যে এমন দূরদেশে গিয়া পৌঁছিবে, যাহা আমাদের পূর্বপুরুষেরা স্বপ্নেও কখনও ভাবেন নাই? আমি ভগবান্ রামকৃষ্ণের কথা বলিতেছি। শুনিয়াছ কি, অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী' পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং যদি উপযুক্ত উপাদান পান, তবে আনন্দের সহিত তাঁহার জীবনী ও উপদেশের আরও বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ-সম্বলিত একখানি গ্রন্থ লিখিতে প্রস্তুত আছেন! অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার একজন অসাধারণ ব্যক্তি। আমি

কয়েক দিন পূর্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। প্রকৃতপক্ষে বলা উচিত, আমি তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গিয়াছিলাম। কারণ যে-কোন ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালবাসেন—তিনি নারীই হউন, পুরুষই হউন, তিনি যে-কোন সম্প্রদায়-মত বা জাতিভুক্ত হউন না কেন—তাঁহাকে দর্শন করিতে যাওয়া আমি তীর্থযাত্রাতুল্য জ্ঞান করি। 'মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ'—আমার ভক্তেরা যাহারা ভক্ত, তাহারা আমার সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। ইহা কি সত্য নয়?

কেশবচন্দ্র সেনের জীবনে হঠাৎ গুরুতর পরিবর্তন কি শক্তিতে সাধিত হইল, অধ্যাপক প্রথমে তাহাই অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন; তারপর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং ঐগুলির চর্চা আরম্ভ করেন। আমি বলিলাম, 'অধ্যাপক মহাশয়, আজকাল সহস্র সহস্র লোকে রামকৃষ্ণের পূজা করিতেছে।' অধ্যাপক বলিলেন, 'এরূপ ব্যক্তিকে লোকে পূজা করিবে না তো কাহাকে পূজা করিবে?' অধ্যাপক যেন সহৃদয়তার মূর্তিবিশেষ। তিনি স্টার্ডি সাহেব ও আমাকে তাঁহার সহিত মধ্যাহ্ন-আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন এবং আমাদিগকে অক্সফোর্ডের কতকগুলি কলেজ ও বোডলিয়ান পুস্তকাগার (Bodleian Library) দেখাইলেন। রেলওয়ে ষ্টেশন পর্যন্ত আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিতে আসিলেন, আর আমাদিগকে এত যত্ন কেন করিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের একজন শিষ্যের সহিত তো আর প্রতিদিন সাক্ষাৎ হয় না।'

তাঁহাকে দেখিয়া বাস্তবিক আমি নূতন দৃষ্টিলাভ করিয়াছি। সুন্দর-উদ্যানসমন্বিত সেই মনোরম ক্ষুদ্র গৃহ, সপ্ততিবর্ষবয়ঃক্রম সত্ত্বেও তাঁহার স্থির প্রসন্ন আনন, বালসুলভ মসৃণ ললাট, রজতশুভ্র কেশ, ঋষি-হৃদয়ের কোন নিভৃত অন্তরালে গভীর আধ্যাত্মিকতার খনির অস্তিত্বসূচক সেই মুখের প্রত্যেক রেখা, তাঁহার সমগ্র জীবনের (যে-জীবন প্রাচীন ভারতের ঋষিগণের চিন্তারাশির প্রতি সহানুভূতি-আকর্ষণ, উহার প্রতি লোকের বিরোধ ও ঘৃণা-অপনয়ন এবং অবশেষে শ্রদ্ধা-উৎপাদনরূপ দীর্ঘকালব্যাপী দুঃসাধ্য কার্যে ব্যাপৃত ছিল) সঙ্গিনী সেই উচ্চাশয়া সহধর্মিণী, তাঁহার সেই উদ্যানের তরুরাজি, পুষ্পনিচয়, তথাকার নিস্তব্ধ ভাব ও নির্মল আকাশ—এই সমুদয় মিলিয়া কল্পনায় আমাকে প্রাচীন ভারতের সেই গৌরবময় যুগে লইয়া গেলে—যখন আমাদের ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণ, এবং উচ্চাশয় বাণপ্রস্থিগণ বাস করিতেন—সেই অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠাদির যুগে।

আমি তাঁহাকে ভাষাতত্ত্ববিদ্ বা পণ্ডিতরূপে দেখি নাই, দেখিলাম যেন কোন আত্মা দিন দিন ব্রহ্মের সহিত নিজের একত্ব অনুভব করিতেছে, যেন কোন হৃদয় অনন্তের সহিত এক হইবার জন্য প্রতি মুহূর্তে প্রসারিত হইতেছে। যেখানে অপরে শুষ্ক অবান্তর বিচাররূপ মরুতে দিশাহারা, সেখানে তিনি এক জীবনপ্রদ উৎসের সন্ধান পাইয়াছেন। তাঁহার হৃৎস্পন্দন প্রকৃতই উপনিষদের সেই ছন্দে ধ্বনিত হইতেছে, 'তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ'—সেই এক আত্মাকে জান, অন্য কথা ত্যাগ কর।

যদিও তিনি একজন পৃথিবী-আলোড়নকারী পণ্ডিত ও দার্শনিক, তথাপি তাঁহার পাণ্ডিত্য ও দর্শন তাঁহাকে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চে লইয়া গিয়া চৈতন্যসত্তার সাক্ষাৎকারে সমর্থ করিয়াছে, তাঁহার অপরা বিদ্যা বাস্তবিকই তাঁহাকে পরাবিদ্যালাভে সহায়তা করিয়াছে। ইহাই প্রকৃত বিদ্যা—বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্। জ্ঞান যদি আমাদিগকে সেই পরাৎপরের নিকট না লইয়া যায়, তবে জ্ঞানের সার্থকতা কি?

আর ভারতের উপর তাঁহার কী অনুরাগ! যদি আমার সে অনুরাগের শতাংশের একাংশও থাকিত, তাহা হইলে আমি ধন্য হইতাম। এই অসাধারণ মনস্বী পঞ্চাশ বা ততোধিক বৎসর ভারতীয় চিন্তারাজ্যে বাস ও বিচরণ করিয়াছেন, পরম আগ্রহ ও হৃদয়ের ভালবাসার সহিত সংস্কৃত সাহিত্যরূপ অনন্ত অরণ্যের আলো ও ছায়ার বিনিময় পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, শেষে ঐ-সকল তাঁহার হৃদয়ে বসিয়া গিয়াছে এবং তাঁহার সমগ্র সত্তায় উহার রঙ ধরাইয়া দিয়াছে।

ম্যাক্সমূলার একজন ঘোর বৈদান্তিক। তিনি বাস্তবিকই বেদান্ত-রূপ রাগিণীর নানা স্বর-বিস্তারের ভিতর উহার প্রধান সুরটিকে ধরিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, বেদান্ত সেই একমাত্র আলোক, যাহা পৃথিবীর সকল সম্প্রদায় ও মতকে আলোকিত করিতেছে, উহা সেই এক তত্ত্ব, সমুদয় ধর্মই যাহার কার্যে পরিণত রূপমাত্র। আর রামকৃষ্ণ পরমহংস কি ছিলেন? তিনি এই প্রাচীন তত্ত্বের প্রত্যক্ষ উদাহরণ, প্রাচীন ভারতের সাকার বিগ্রহ ও ভবিষ্যৎ ভারতের পূর্বাভাস—তাঁহার ভিতর দিয়াই সকল জাতি আধ্যাত্মিক আলোক লাভ করিবে। চলিত কথায় আছে, জহুরীই জহর চেনে। তাই বলি, ইহা বিস্ময়ের বিষয় না যে, ভারতীয় চিন্তাগগনে কোন নূতন নক্ষত্র উদিত হইলেই, ভারতবাসিগণ উহার মহত্ত্ব বুঝিবার পূর্বেই এই পাশ্চাত্য ঋষি উহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং উহার বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন!

আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, 'আপনি কবে ভারতে আসিতেছেন? ভারতবাসীর পূর্বপুরুষগণের চিন্তারাশি আপনি যথার্থভাবে লোকের সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং ভারতের সকলেই আপনার শুভাগমনে আনন্দিত হইবে।' বৃদ্ধ ঋষির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাঁহার নয়নে এক বিন্দু অশ্রু যেন দেখা দিল, মাথা একটু নাড়িয়া ধীরে ধীরে এই কথাগুলি বলিলেন, 'তাহা হইলে আমি আর ফিরিব না; আপনাদিগকে সেখানেই আমাকে চিতায় সমর্পণ করিতে হইবে।' আর অধিক প্রশ্ন মানব-হৃদয়ের পবিত্র রহস্যপূর্ণ রাজ্যে অনধিকার প্রবেশের ন্যায় বোধ হইল। কে জানে, হয়তো কবি যাহা বলিয়াছিলেন, ইহা তাহাই—

'তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বম্ ।
ভাবস্থিরানি জননান্তরসৌহৃদানি ॥'

তিনি নিশ্চয়ই অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ পূর্বজন্মের বন্ধুত্বের কথা ভাবিতেছেন। তাঁহার জীবন জগতের পক্ষে পরম মঙ্গলস্বরূপ হইয়াছে। ঈশ্বর করুন, যেন বর্তমান শরীর ত্যাগ করিবার পূর্বে তাঁহার জীবনে বহু বর্ষ কাটিয়া যায়।

৩. ডক্টর পল ডয়সন

১৮৯৬ খ্রীঃ 'ব্রহ্মবাদিন্'-সম্পাদককে লিখিত।

দশ বৎসর অধিক অতীত হইল, কোন মধ্যবিত্ত পাদরির আটটি সন্তানের অন্যতম, জনৈক অল্পবয়স্ক জার্মান ছাত্র একদিন অধ্যাপক ল্যাসেনকে একটি নূতন ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে—ইওরোপীয় পণ্ডিতবর্গের পক্ষে তখনকার কালেও সম্পূর্ণ নূতন ভাষা ও সাহিত্য অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে শুনিল। এই বক্তৃতাগুলি শুনিতে অবশ্য পয়সা লাগিত না, কারণ এমন কি এখন পর্যন্ত কোন ব্যক্তির পক্ষে কোন ইওরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিখাইয়া অর্থোপার্জন করা অসম্ভব—অবশ্য যদি বিশ্ববিদ্যালয় তাহার পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তবে স্বতন্ত্র কথা।

অধ্যাপক ল্যাসেন জার্মানীর সংস্কৃতবিদ্যা-প্রবর্তকগণের—সেই বীরহৃদয় জার্মান পণ্ডিতদলের একরূপ শেষ প্রতিনিধি। এই পণ্ডিতকুল বাস্তবিকই বীরপুরুষ ছিলেন,

কারণ জ্ঞানের প্রতি পবিত্র ও নিঃস্বার্থ প্রেম ব্যতীত তখন জার্মান মনীষিগণের ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণের অন্য কি কারণ বিদ্যমান ছিল? সেই বহুদর্শী অধ্যাপক ‘শকুন্তলা’র একটি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। আর সেদিন আমাদের এই যুবক ছাত্রটি যেরূপ আগ্রহ ও মনোযোগের সহিত ল্যাসেনের ব্যাখ্যা শুনিতেছিল, এরূপ আগ্রহবান্ শ্রোতা আর কেহই সেখানে উপস্থিত ছিল না। ব্যাখ্যাত বিষয়টি অবশ্য চিত্তাকর্ষক ও আশ্চর্য বোধ হইতেছিল, কিন্তু আরও বিস্ময়কর ছিল সেই অপরিচিত ভাষা; উহার অপরিচিত শব্দগুলি—অনভ্যস্ত ইওরোপীয় মুখ হইতে উচ্চারিত হইলে উহার ব্যঞ্জনবর্ণগুলি যেরূপ কিম্ভূতকিমাকার শোনায়, সেইরূপভাবে উচ্চারিত হইলেও যুবককে অদ্ভুতভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল। সে নিজ বাসস্থানে ফিরিল, কিন্তু যাহা শুনিয়াছিল, রাত্রির নিদ্রায় তাহা ভুলিতে পারিল না। সে যেন এতদিনের অজ্ঞাত অচেনা দেশের চকিত দর্শন পাইয়াছে, এই দেশ যেন তাহার দৃষ্ট অন্য সকল দেশ অপেক্ষা বর্ণে অধিকতর সমুজ্জ্বল; উহার যেমন মোহিনীশক্তি, এই উদ্দাম যুবক-হৃদয় আর কখনও তেমন অনুভব করে নাই।

তাহার বন্ধুবর্গ স্বভাবতই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কবে এই যুবকের তীক্ষ্ণ মেধা সম্যক পরিস্ফুট হইবে। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, সে কোন উচ্চ-শিক্ষিতের বৃত্তিতে প্রবেশ করিয়া সাধারণের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হইবে, সর্বোপরি উচ্চ বেতন ও পদমর্যাদার ভাগী হইবে। কিন্তু কোথা হইতে এই সংস্কৃত আসিয়া জুটিল! অধিকাংশ ইওরোপীয় পণ্ডিত তখন ইহার নামও শুনেন নাই। আর উপার্জনের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে—পূর্বেই বলিয়াছি, সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হইয়া অর্থোপার্জন করা পাশ্চাত্য দেশে এখনও অসম্ভব ব্যাপার। তথাপি যুবকটির সংস্কৃত শিখিবার আগ্রহ অতি প্রবল হইল।

দুঃখের বিষয়, আধুনিক ভারতীয় আমাদের পক্ষে বিদ্যার জন্য বিদ্যাশিক্ষার আগ্রহটা কিরূপ ব্যাপার, তাহা বুঝাই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তথাপি আমরা এখনও নবদ্বীপ, বারাণসী ও ভারতের কোন কোন স্থানে পণ্ডিতগণের ভিতর, বিশেষতঃ সন্ন্যাসীদের ভিতর বয়স্ক ও যুবক উভয় শ্রেণীর লোকই দেখিতে পাই, যাঁহারা এইরূপ জ্ঞান-তৃষ্ণায় উন্মত্ত। আধুনিক ইওরোপীয়ভাবাপন্ন হিন্দুদের বিলাসোপকরণশূন্য, তাহাদের অপেক্ষা সহস্রগুণে অধ্যয়নের অল্পসুযোগবিশিষ্ট, রাত্রির পর রাত্রি তৈল-প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে হস্ত লিখিত-পুঁথির প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি (যাহাতে অন্য যে কোন জাতির

ছাত্রের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইত), কোন দুর্লভ পুঁথি বা বিখ্যাত অধ্যাপকের অনুসন্ধানে শত শত ক্রোশ ভিক্ষামাত্রোপজীবী হইয়া পদব্রজে ভ্রমণকারী, বৎসরের পর বৎসর যতদিন না কেশ শুভ্র হইতেছে এবং বয়সের ভারে শরীর অক্ষম হইয়া পড়িতেছে, ততদিন নিজ পঠিতব্য বিষয়ে অদ্‌ভুতভাবে দেহমনের সমুদয় শক্তি-প্রয়োগে নিযুক্ত—এইরূপ ছাত্র ঈশ্বরকৃপায় আমাদের দেশ হইতে এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। এখন ভারত যাহাকে নিজ মূল্যবান্ সম্পত্তি বলিয়া গৌরব করিয়া থাকে, তাহা নিশ্চয়ই অতীত কালে তাহার উপযুক্ত সন্তানগণের এরূপ পরিশ্রমের ফল। ভারতের প্রাচীন যুগের পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্যের গভীরতা ও সারবত্তা এবং স্বার্থগন্ধহীনতা ও উদ্দেশ্যের ঐকান্তিকতার সহিত আধুনিক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষায় যে-ফল লাভ হইতেছে, তাহার তুলনা করিলেই আমার উপযুক্ত মন্তব্যের সত্যতা সুস্পষ্ট হইবে। যদি আমাদের দেশবাসিগণ অন্যান্য জাতির মধ্যে ভারতের ঐতিহাসিক অতীতযুগের উপযুক্ত নিজ পদগৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়া আবার উঠিতে চায়, তবে তাহাদের জীবনে যথার্থ পাণ্ডিত্যের জন্য স্বার্থহীন অকপট উৎসাহ ও সাগ্রহ চিন্তা আবার প্রবলভাবে জাগরিত হওয়া আবশ্যক। এইরূপ জ্ঞান-স্পৃহাই জার্মানীকে তাহার বর্তমান পদবীতে জগতের সমুদয় জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ না হউক, শ্রেষ্ঠগণের অন্যতম পদবীতে—উন্নীত করিয়াছে।

এই জার্মান ছাত্রের হৃদয়ে সংস্কৃত শিক্ষার বাসনা প্রবল হইয়াছিল। অবশ্য এই সংস্কৃত শিক্ষা পর্বতারোহণের মত সুদীর্ঘ ও কঠোর পরিশ্রমসাধ্য। এই পাশ্চাত্য বিদ্যার্থীর জীবন ও অন্যান্য সফলকাম বিদ্যার্থিগণের চিরপরিচিত কাহিনীর মত—তাঁহাদের সেই কঠোর পরিশ্রম, অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ কিন্তু অদম্য উৎসাহের সহিত নিজব্রতে দৃঢ়ভাবে লাগিয়া থাকিয়া যথার্থ বীরজনোচিত সাফল্য লাভের গৌরবময় পরিণতি। এইভাবে যুবকের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। আর এখন শুধু ইওরোপ নয়, সমগ্র ভারতও এই কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক পল ডয়সনকে জানে। আমি আমেরিকা ও ইওরোপে অনেক সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপক দেখিয়াছি, তাঁহাদের কেহ কেহ বৈদান্তিক ভাবের প্রতি অতিশয় সহানুভূতিসম্পন্ন। আমি তাঁহার মনীষা ও নিঃস্বার্থ কার্যে উৎসর্গীকৃত জীবন দেখিয়া মুগ্ধ। কিন্তু পল ডয়সন (অথবা ইনি নিজে যেমন সংস্কৃতে 'দেবসেনা' বলিয়া অভিহিত হইতে পছন্দ করেন) এবং বৃদ্ধ ম্যাক্সমূলারকে ভারতের ও ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীর সর্বাপেক্ষা অকৃত্রিম বন্ধু বলিয়া ধারণা হইয়াছে। কিয়েল নগরে এই উৎসাহী বৈদান্তিকের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাত,

তাঁহার ভারতভ্রমণের সঙ্গিনী ধীরপ্রকৃতি সহধর্মিণী ও তাঁহার প্রাণপুত্তলী বালিকা কন্যা, জার্মানী ও হল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া আমাদের একসঙ্গে লণ্ডনযাত্রা এবং লণ্ডনে ও উহার আশেপাশে আমাদের আনন্দপূর্ণ দেখাসাক্ষাৎ—আমার জীবনের অন্যান্য মধুর স্মৃতিগুলির অন্যতম বলিয়া চিরকাল হৃদয়ে গ্রথিত থাকিবে।

ইওরোপের প্রথম যুগের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ সমালোচনাশক্তি অপেক্ষা অধিক কল্পনাশক্তি লইয়া সংস্কৃত-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহারা জানিতেন অল্প, সেই অল্প জ্ঞান হইতে আশা করিতেন অনেক, আর অনেক সময় তাঁহারা অল্পস্বল্প যাহা জানিতেন, তাহা লইয়াই বাড়াবাড়ি করিবার চেষ্টা করিতেন। আবার সেই কালেও 'শকুন্তলা'কে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করার পাগলামিও একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। ইহাদের পরে স্বভাবতই একদল প্রতিক্রিয়াশীল স্থূলদর্শী সমালোচকের অভ্যুদয় হইল, যাঁহাদিগকে প্রকৃত পণ্ডিত-পদবাচ্যই বলা যাইতে পারে না। ইঁহারা সংস্কৃতের কিছু জানিতেন না বলিয়াই হয়তো সংস্কৃত-চর্চা হইতে কোন ফললাভের আশা করিতেন না, বরং প্রাচ্যদেশীয় যাহা কিছু তাহাই উপহাস করিতেন। প্রথমোক্ত দলের—যাঁহারা ভারতীয় সাহিত্যে কল্পনার চক্ষে কেবল নন্দনকাননই দর্শন করিতেন, তাঁহাদের বৃথা কল্পনাপ্রিয়তার ইঁহারা কঠোর সমালোচনা করিলেন বটে, কিন্তু নিজেরা আবার এমন সব সিদ্ধান্ত করিতে লাগিলেন যে, বেশী কিছু না বলিলেও ঐগুলিকে প্রথমোক্ত দলের সিদ্ধান্তের মতই বিশেষ অসমীচীন ও অতিশয় দুঃসাহসিক বলা যাইতে পারে। আর এই বিষয়ে তাঁহাদের সাহস স্বভাবতই বাড়িয়া যাইবার কারণ—ভারতীয় ভাবের প্রতি সহানুভূতিশূন্য এবং চিন্তা না করিয়া অতি ক্ষিপ্র সিদ্ধান্তকারী এই-সকল পণ্ডিত ও সমালোচক এমন শ্রোতৃবর্গের নিকট তাঁহাদের বক্তব্য বিষয়গুলি বলিতেছিলেন, যাঁহাদের ঐ বিষয়ে কোন মতামত দিবার একমাত্র অধিকার ছিল তাঁহাদের সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞতা। এইরূপ সমালোচক পণ্ডিতগণের মস্তিষ্ক হইতে নানারূপ বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রসূত হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে! হঠাৎ বেচারা হিন্দুরা একদিন প্রাতঃকালে জাগিয়া দেখিল, তাহাদের নিজস্ব বলিয়া যাহা ছিল, তাহার কিছুই নাই—এক অপরিচিত জাতি তাহাদের নিকট হইতে শিল্পকলা কাড়িয়া লইয়াছে, আর একজাতি তাহাদের স্থাপত্য কাড়িয়া লইয়াছে, আর এক তৃতীয় জাতি তাহাদের প্রাচীন বিজ্ঞান সমুদয় কাড়িয়া লইয়াছে, এমন কি ধর্মও তাহাদের নিজস্ব নয়! হাঁ—ধর্মও এক পহ্লবী প্রস্তর-নির্মিত ক্রুশের সঙ্গে ভারতে আসিয়াছে! এইরূপ মৌলিক গবেষণা-পরম্পরারূপ উত্তেজনাপূর্ণ যুগের পর এখন

অপেক্ষাকৃত ভাল সময় আসিয়াছে। এখন লোকে বুঝিয়াছে, যথার্থ গভীর বিদ্যাবত্তার কিছু মূলধন না লইয়া কেবল হঠকারিতাবশতঃ কতকগুলি আনুমানিক সিদ্ধান্ত করিয়া বসা, প্রাচ্যতত্ত্ব গবেষণা-ব্যাপারেও হাস্যোদ্দীপক ব্যর্থতাই প্রসব করে এবং ভারতের প্রাচীন ভাবধারাগুলিকে সদম্ভ অবজ্ঞা সহকারে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। কারণ ঐগুলির মধ্যে এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহা লোকে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না।

সুখের বিষয়, ইওরোপে আজকাল একদল নূতন ধরনের সংস্কৃত পণ্ডিতের অভ্যুদয় হইতেছে, যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্, সহানুভূতিসম্পন্ন ও যথার্থ পণ্ডিত। ইঁহারা শ্রদ্ধাবান্—কারণ ইঁহারা অপেক্ষাকৃত উচ্চদরের মানুষ, এবং সহানুভূতিসম্পন্ন—কারণ ইঁহারা প্রকৃতই বিদ্বান্। আর আমাদের ম্যাক্সমূলারই প্রাচীনদলরূপ শৃঙ্খলের সহিত নূতন দলের সংযোগগ্রন্থি। আমরা হিন্দুগণ পাশ্চাত্য অন্যান্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের অপেক্ষা ইঁহারই নিকট অধিক ঋণী। তিনি যৌবনে যুবকোচিত উৎসাহের সহিত যে সুবৃহৎ কার্য আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় সাফল্যে পরিণত করিয়াছিলেন, সেই কথা ভাবিতে গেলে আমার বিস্ময়ের অবধি থাকে না। ইঁহার সম্বন্ধে একবার ভাবিয়া দেখ—হিন্দুদের চক্ষেও অস্পষ্ট লেখা প্রাচীন হস্তলিখিত-পুঁথি লইয়া দিনরাত ঘাঁটিতেছেন—উহা আবার এমন ভাষায় রচিত, যাহা ভারতবাসীর পক্ষেও আয়ত্ত করিতে সারাজীবন লাগিয়া যায়; এমন কোন অভাবগ্রস্ত পণ্ডিতের সাহায্যও পান নাই, যাঁহাকে মাসে মাসে কিছু দিলে তাঁহার মস্তিষ্ক কিনিয়া লইতে পারা যায়—আর 'অতি নূতন গবেষণাপূর্ণ' কোন পুস্তকের ভূমিকায় তাঁহার নামটির উল্লেখ মাত্র করিলে ইহার কদর বাড়িয়া যায়। এই ব্যক্তির কথা ভাবিয়া দেখ—সময়ে সময়ে সায়ণ-ভাষ্যের অন্তর্গত কোন শব্দ বা বাক্যের যথার্থ পাঠোদ্ধারে ও অর্থ-আবিষ্কারে দিনের পর দিন এবং কখনও কখনও মাসের পর মাস কাটাইয়া দিতেছেন। (তিনি আমাকে স্বয়ং এই কথা বলিয়াছেন), এবং এই দীর্ঘকালব্যপী অধ্যাবসায়ের ফলে পরিশেষে বৈদিক সাহিত্যরূপ অরণ্যের মধ্য দিয়া অপরের পক্ষে চলিবার সহজ রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিতে কৃতকার্য হইয়াছেন; এই ব্যক্তি ও তাঁহার কার্য সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখ, তারপর বল—তিনি আমাদের জন্য বাস্তবিক কি করিয়াছেন! অবশ্য তিনি তাঁহার বহু রচনার মধ্যে যাহা কিছু বলিয়াছেন, সেই-সবের সহিত আমরা সকলে একমত না হইতে পারি; এরূপ সম্পূর্ণ একমত হওয়া অবশ্যই অসম্ভব। কিন্তু ঐকমত্য হউক বা নাই হউক, এই সত্যটির কখনও অপলাপ করা যাইতে পারে না যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণের সাহিত্য রক্ষা ও বিস্তার করিবার জন্য এবং উহার প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্য

আমাদের মধ্যে যে কেহ যতদূর সম্ভব আশা করিতে পারি, এই এক ব্যক্তি তাহার সহস্রগুণ অধিক করিয়াছেন, আর তিনি এই কার্য অতি শ্রদ্ধা-ও প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে করিয়াছেন।

যদি ম্যাক্সমূলারকে এই নূতন আন্দোলনের প্রাচীন অগ্রদূত বলা যায়, তবে ডয়সন নিশ্চয়ই যে উহার একজন নবীন অগ্রগামী রক্ষিপদবাচ্য, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রখনিতে যে-সকল ভাব ও আধ্যাত্মিকতার অমূল্য রত্নসমূহ নিহিত আছে, ভাষাতত্ত্বের আলোচনার আগ্রহ অনেক দিন ধরিয়া সেগুলিকে আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রাখিয়াছিল। ম্যাক্সমূলার সেগুলির কয়েকটি সম্মুখে আনিয়া সাধারণের দৃষ্টিগোচর করিলেন এবং শ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ববিৎ বলিয়া তাঁহার কথার যে প্রামাণ্য তাহারই বলে তিনি ঐ বিষয়ে সাধারণের মনোযোগ বলপূর্বক আকর্ষণ করিলেন। ডয়সনের ভাষাতত্ত্ব আলোচনার দিকে সেরূপ কোন ঝোঁক ছিল না। বরং তিনি দার্শনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত ছিলেন এবং প্রাচীন গ্রীস ও বর্তমান জার্মান তত্ত্বালোচনা-প্রণালী ও সিদ্ধান্তসমূহ তাঁহার বিশেষ জানা ছিল। ডয়সন ম্যাক্সমূলারের পথ অনুসরণ করিয়া অতি সাহসের সহিত উপনিষদের গভীর দার্শনিক তত্ত্বসাগরে ডুব দিলেন; তিনি দেখিলেন, ঐগুলি সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং বুদ্ধিবৃত্তি তপ্ত করে—তখন তিনি পূর্ববৎ সাহসের সহিত ঐ তথ্য সমগ্র জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের মধ্যে একমাত্র ডয়সনই বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁহার মত খুব স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। অধিকাংশ পণ্ডিত যেমন 'অপরে কি বলিবে', এই ভয়ে জড়সড়, ডয়সন কখনও সেইরূপ মনে করেন নাই। বাস্তবিকই এই জগতে এমন সাহসী লোকের আবশ্যক হইয়াছে, যাঁহারা সাহসের সহিত প্রকৃত সত্য সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিতে পারেন। ইওরোপ সম্বন্ধে এ-কথা আবার বিশেষভাবে সত্য—সে দেশের পণ্ডিতবর্গ সমাজের ভয়ে বা অনুরূপ কারণে এমন সব বিভিন্ন ধর্মমত ও আচার-ব্যবহার দুর্বলভাবে সমর্থন করেন এবং সেগুলির দোষ চাপা দিবার চেষ্টা করেন, যেগুলিতে সম্ভবতঃ তাঁহাদের অনেকে যথার্থভাবে বিশ্বাসী নন। সুতরাং ম্যাক্সমূলার ও ডয়সনের এইরূপ সাহসের সহিত খোলাখুলিভাবে সত্যের সমর্থনের জন্য বাস্তবিক তাঁহারা বিশেষ প্রশংসার ভাগী। তাঁহারা আমাদের শাস্ত্রসমূহের গুণ-ভাগ-প্রদর্শনে যেরূপ সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, সেইরূপ সাহসের সহিত উহার দোষভাগ—পরবর্তী কালে ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীতে যে-সকল গলদ প্রবেশ করিয়াছে, বিশেষতঃ আমাদের সামাজিক প্রয়োজনে উহাদের প্রয়োগ-সম্বন্ধে যে-সকল ত্রুটি

হইয়াছে—তাহাও যেন সাহসের সহিত প্রদর্শন করেন। বর্তমান কালে আমাদের এইরূপ খাঁটি বন্ধুর সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে—যাঁহারা ভারতে যে রোগ দিন দিন বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিতেছে, উহার প্রতিকার করিতে পারিবেন। রোগটি হইল এইঃ একদিকে দাসবৎ প্রাচীন প্রথার অতি-চাটুকারিতা—প্রত্যেক গ্রাম্য কুসংস্কারকে আমাদের শাস্ত্রের সার সত্য বলিয়া ধরিয়া থাকিতে চায়, আবার অপরদিকে পৈশাচিক নিন্দাবাদ—যাহা আমাদের মধ্যে ও আমাদের ইতিহাসের মধ্যে ভাল কিছুই দেখিতে পায় না এবং পারে তো এই ধর্ম ও দর্শনের লীলাভূমি আমাদের প্রাচীন জন্মভূমির সমুদয় আধ্যাত্মিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে এখনই ভাঙিয়া চুরিয়া ধূলিসাৎ করিতে চায়। উপরিউক্ত ভারত বন্ধুগণ এই উভয়বিধ চূড়ান্ত একদেশী ভাবে, গতিরোধ করিতে পারেন।

৪. অধিকারিবাদের দোষ

বেলুড় মঠে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্যগণের নিকট কথিত।

প্রাচীন ঋষিগণের উপর আমি অসীম শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন, কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁহাদের দোহাই দিয়া যেভাবে জনসমাজে লোকশিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে, সেই শিক্ষাপ্রণালী আমি বিশেষ আপত্তিকর মনে করি। ঐ সময় হইতে স্মৃতিকারেরা সর্বদাই 'ইহা কর, উহা করিও না' ইত্যাদি-রূপ বিধিনিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু 'কেন এই কাজ করিতে হইবে? কেন ইহা করিব না?'—বিধিনিষেধগুলির উদ্দেশ্য বা যুক্তি তাঁহারা কখনই দেন নাই। এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী আগাগোড়া বড়ই অনিষ্টকর—ইহাতে যথার্থ উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইয়া লোকের ঘাড়ে কতকগুলি অনর্থের বোঝা চাপান হয় মাত্র। এই বিধিনিষেধগুলির উদ্দেশ্য সাধারণ লোকের নিকট গোপন করিয়া রাখিবার এই কারণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে যে, তাহারা ঐ উদ্দেশ্য বুঝিবার যথার্থ অধিকারী নয়—সেইজন্য তাহাদের নিকট বলিলেও তাহারা উহা বুঝিবে না। এই অধিকারিবাদের অনেকটা খাঁটি স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁহারা ভাবিতেন, তাঁহারা যে-বিষয়ে বিশেষ চর্চা করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, লোককে যদি তাহা জানাইয়া দেওয়া হয়, তবে তাহারা আর তাঁহাদিগকে আচার্যের উচ্চ আসনে বসাইবে না। এই কারণেই তাঁহারা অধিকারিবাদের মতটা বিশেষভাবে সমর্থন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সামর্থ্যরহিত

বলিয়া যদি কোন লোককে তোমরা উচ্চ বিষয় জানিবার অনধিকারী বা অনুপযুক্ত মনে কর, তবে তো তোমাদের তাহাকে অধিক পরিমাণে শিক্ষা দিয়া যাহাতে সে ঐ তত্ত্বসকল বুঝিবার শক্তি-লাভ করিয়া উপযুক্ত হয়, সেজন্য চেষ্টা করা উচিত; তাহার বুদ্ধি যাহাতে মার্জিত ও সবল হয়, সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ সে যাহাতে ধারণা করিতে পারে, সেজন্য তাহাকে অল্প শিক্ষা না দিয়া বরং বেশী শিক্ষা দেওয়াই তো উচিত। এই অধিকারিবাদ-মতাবলম্বিগণ—মানবাত্মার মধ্যে যে গূঢ়ভাবে সমুদয় শক্তি রহিয়াছে—এ কথাটা যেন একেবারে ভুলিয়া যান, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তিই জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে, যদি তাহাকে তাহার ভাষায়, তাহার উপযোগিভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়। যে আচার্য অপরের জ্ঞানোন্মেষ করিতে পারিতেছেন না, তিনি তাঁহার শিষ্যগণের নিন্দা না করিয়া এবং উচ্চতর জ্ঞান তাহাদের জন্য নয়, এই বৃথা হেতুবাদে তাহাদিগকে চিরদিনের জন্য অজ্ঞান ও কুসংস্কারে ফেলিয়া না রাখিয়া তিনি যে তাহাদিগকে তাহাদের ভাষায়, তাহাদের উপযোগিভাবে শিক্ষা দিয়া তাহাদের জ্ঞানোন্মেষ করিয়া দিতে পারিতেছেন না, সেজন্য যেন বিরলে অশ্রুবিসর্জন করেন। সত্য যাহা, তাহা নির্ভয়ে সকলের সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশ করিয়া বল—দুর্বল অধিকারিগণের ইহাতে বুদ্ধিভেদ হইবে, এ আশঙ্কা করিও না। মানুষ নিজে ঘোর স্বার্থপর, তাই সে চায় না যে, সে যতদূর জ্ঞানলাভ করিয়াছে, অপরেও তাহা লাভ করুক—তাহার আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে লোকে তাহাকে মানিবে না, সে অপরের নিকট হইতে যে-সকল সুযোগ-সুবিধা পাইতেছে, অন্যের নিকট হইতে যে বিশেষ সম্মান পাইতেছে, তাহা আর পাইবে না। সেইজন্য সে তর্ক করিয়া থাকে যে, দুর্বলচিত্ত লোকের নিকট উচ্চতম আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কথা বলিলে তাহাদের বুদ্ধি গুলাইয়া যাইবে। অতএব আমরা শ্লোক শুনি—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

কর্মাসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে জ্ঞানের উপদেশ দিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাদের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। কিন্তু জ্ঞানী যুক্তভাবে কর্মসমুদয় স্বয়ং আচরণ করিয়া তাহাদিগকে কর্মে নিযুক্ত রাখিবেন।

আলোকের দ্বারা অন্ধকার দূর না হইয়া পূর্বাপেক্ষা গভীরতর অন্ধকারের সৃষ্টি হইয়া থাকে—এই স্ববিরোধী বাক্যে আমার বিশ্বাস হয় না। অমৃতস্বরূপ সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে

ডুবিলে মানুষ মরে—এ কথা যেমন, পূর্বোক্ত কথাটিও তদ্রূপ। কি অসম্ভব কথা! জ্ঞানের অর্থ—অজ্ঞানজ ভ্রমসমূহ হইতে মুক্ত হওয়া! সেই জ্ঞানের দ্বারা ভ্রম আসিবে—জ্ঞানালোক আসিলে মাথা গুলাইয়া যাইবে!! ইহা কি কখনও সম্ভব! এইরূপ মতবাদের উৎপত্তির প্রকৃত কারণ এই যে, মানুষ সাধারণ লোকের নিকট হইতে সম্মান হারাইবার ভয়ে খাঁটি সত্য যাহা, তাহা প্রচার করিতে সাহসী হয় না। তাহারা সনাতন সত্যের সহিত ভ্রমপূর্ণ কুসংস্কারগুলির একটা আপস করিতে চেষ্টা করে এবং সেইজন্য এই মতবাদের পোষকতা করে যে, লোকাচার ও দেশাচার মানিতেই হইবে। সাবধান, তোমরা কখনও এইরূপ আপস করিতে যাইও না; সাবধান, এইরূপে পুরাতন ভাঙাঘরের উপর এক পোঁচ চুণকাম করিয়া উহাকে নূতন করিয়া চালাইতে চেষ্টা করিও না। মড়াটার উপর কতকগুলো ফুল চাপা দিয়া উহার বীভৎস দৃশ্য ঢাকিতে যাইও না। 'তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙঘয়েৎ'—তথাপি মনে মনেও লোকাচার লঙঘন করিবে না—এইসব বাক্য গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দাও। এইরূপ আপস করিতে গেলে ফল এই হয় যে, মহান্ সত্যগুলি অতি শীঘ্রই নানা কুসংস্কাররূপ আবর্জনাস্তূপের নীচে চাপা পড়িয়া যায়, আর মানুষ ঐগুলিকে পরম আগ্রহে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। এমন কি শ্রীকৃষ্ণ নির্ভীকভাবে গীতার যে মহান্ সত্যসমূহ প্রচার করিয়া গেলেন উহারাও পরবর্তী কালের শিষ্য প্রশিষ্যদের হাতে অসম্পূর্ণ অপব্যাখ্যা লাভ করিয়াছিল। ফলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রটির মধ্যে এমন অনেক জিনিষ ঢুকিয়াছে, যাহা মানুষকে পথভ্রান্ত করিতে পারে।

এই আপসের চেষ্টা আসে ঘোর কাপুরুষতা হইতে, লোকভয় হইতে। তোমরা নির্ভীক হও। আমার শিষ্যগণের সর্বোপরি খুব নির্ভীক হওয়া চাই। কোন কারণে কাহারও সহিত কোনরূপ আপস করা চলিবে না। উচ্চতম সত্যসমূহ অধিকারিনির্বিশেষে প্রচার করিতে থাক। লোকে তোমাকে মানিবে না অথবা লোকের সঙ্গে অনর্থক বিবাদ বাধিবে—এ ভয় করিও না। এইটি নিশ্চয় জানিও যে, সত্যকে পরিত্যাগ করিবার শত শত প্রলোভন সত্ত্বেও যদি তোমরা সত্যকে ধরিয়া থাকিতে পার, তোমাদের ভিতর এমন এক দৈব বল আসিবে, যাহার সম্মুখে মানুষ—তোমরা যাহা বিশ্বাস কর না, তাহা বলিতে সাহসী হইবে না। যদি তোমরা চতুর্দশ বৎসর ধরিয়া সত্য পথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া ক্রমাগত সত্যের যথার্থ সেবা করিতে পার, তবে তোমরা লোককে যাহা বলিবে, তাহাকে তাহার সত্যতা বুঝিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। এইরূপে তোমরা

সর্বসাধারণের মহা কল্যাণ করিতে পারিবে, তোমাদের দ্বারা লোকের বন্ধন ঘুচিয়া যাইবে, তোমরা সমুদয় জাতিকে উন্নত করিতে পারিবে।

৫. সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ

[বেলুড় মঠে তদীয় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্যগণের নিকট কথাপ্রসঙ্গে বলেনঃ]

সন্ন্যাসীদের কার্যে যথা, মঠ ও মণ্ডলী-পরিচালনা, জনসমাজে ধর্মপ্রচার ও অনুষ্ঠানপ্রণালীর প্রবর্তন, ত্যাগ ও ধর্মমতামত-সম্বন্ধীয় স্বাধীন চিন্তার সীমানিরূপণ ইত্যাদিতে সংসারী ব্যক্তির কোন মতামত দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত নহে। সন্ন্যাসী ধনী লোকের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখবে না—তার কাজ গরীবকে নিয়ে। সন্ন্যাসীর কর্তব্য পরম যত্নের সহিত প্রাণপণে গরীবদের সেবা করা আর এরূপ সেবা করতে পারলে পরমানন্দ অনুভব করা। আমাদের দেশের সকল সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের ভিতর ধনী লোকের তোষামোদ করা এবং তাদের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করার ভাব প্রবেশ করাতে সেগুলি উৎসন্ন যেতে বসেছে। যথার্থ সন্ন্যাসী যিনি, তাঁর কায়মনোবাক্যে এটা ত্যাগ করা উচিত। এভাবে ধনী লোকের পেছনে ঘোরা বেশ্যারই উপযুক্ত, সংসারত্যাগীর পক্ষে নয়। কাম-কাঞ্চনত্যাগীই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূলমন্ত্র, সুতরাং ঘোর কাম-কাঞ্চনে মগ্ন ব্যক্তি কি করে তাঁর শিষ্য বা ভক্তরূপে পরিগণিত হতে পারে? তিনি ভগবতীর নিকট প্রার্থনা করতেন, ‘মা, কথা কইবার জন্যে আমার কাছে এমন একজন লোক এনে দে, যার ভেতর কাম-কাঞ্চনের লেশমাত্র নেই, সংসারী লোকের সঙ্গে কথা কয়ে কয়ে আমার মুখ জ্বলে গেল।’ তিনি আরও বলতেন, ‘সংসারী এবং অপবিত্র লোকের স্পর্শ আমি সহ্য করতে পারি না।’ তিনি ‘ত্যাগীর বাদশা’ ছিলেন—সংসারী লোক কখনও তাঁকে প্রচার করতে পারে না। সংসারী গৃহস্থ লোক কখনও সম্পূর্ণ অকপট হতে পারে না, কারণ তার কিছু না কিছু স্বার্থপর উদ্দেশ্য থাকবেই। ভগবান্ স্বয়ং যদি গৃহস্থরূপে অবতীর্ণ হন, আমি তাঁকে কখনও অকপট বলে বিশ্বাস করতে পারি না। গৃহস্থলোক যদি কোন ধর্মসম্প্রদায়ের নেতা হয়, তবে সে ধর্মের নামে নিজেরই স্বার্থসিদ্ধি করতে থাকে, আর তার ফল এই হয় যে, সম্প্রদায়টি একেবারে আগাগোড়া গলদে পূর্ণ হয়ে যায়। গৃহস্থগণ যে-সকল

ধর্মান্দোলনের নেতা হয়েছেন, সবগুলিরই ঐ এক দশা হয়েছে। ত্যাগ ব্যতীত ধর্ম দাঁড়াতেই পারে না।

এই সময়ে একজন সন্ন্যাসী শিষ্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্বামীজী, ঠিক ঠিক কাঞ্চন ত্যাগ কাহাকে বলা যায়?' স্বামীজী হেসে বললেনঃ হাঁ, তোর প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝেছি। সংসার ত্যাগ করে এসেই আমার এবং মঠের টাকাকড়ি রাখবার ভার তোর ওপর পড়েছে কিনা, তাই তোর মনে এই সন্দেহ হয়েছে। এখন এর মধ্যে বুঝতে হবে এইটুকু যে, উপায় আর উদ্দেশ্য। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যে বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্বিত হয়ে থাকে। অনেক সময়ে দেখা যায়, উদ্দেশ্য একই, কিন্তু তার জন্য বিভিন্ন দেশকালপাত্রে বিভিন্ন উপায় অবলম্বিত হচ্ছে। সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্য—নিজের মুক্তিসাধন এবং জগতের হিত করা—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।' আর ঐ উদ্দেশ্য-সাধনের প্রধান উপায়—কাম-কাঞ্চনত্যাগ। কিন্তু এটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, 'ত্যাগ' অর্থে মনের আসক্তি-ত্যাগ—সর্বপ্রকার স্বার্থের ভাব ত্যাগ। নইলে আমি অপরের নিকট টাকা গচ্ছিত রাখলাম—হাতে টাকা ছুঁলাম না, কিন্তু টাকা দ্বারা যে-সব সুবিধে হয়, সব ভোগ করতে লাগলাম—তাকে কি আর ত্যাগ বলা যায়? যে সময়ে গৃহস্থেরা মনু ও অন্যান্য স্মৃতিকারগণের উপদেশ মেনে সন্ন্যাসী অতিথিদের জন্য তাদের খাদ্যের কিয়দংশ পৃথক্ করে রেখে দিতেন, সে-সন্ন্যাসীর পক্ষে কাছে পয়সা-কড়ি কিছু না রেখে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করলে কাঞ্চনত্যাগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত। এখন কিন্তু কাল-ধর্মে গৃহস্থের সে ভাব বড়ই কম—বিশেষতঃ বাঙলাদেশে তো মাধুকরী ভিক্ষের প্রথাই নেই। এখন মাধুকরী ভিক্ষের ওপর নির্ভর করে থাকবার চেষ্টা করলে অনর্‌থক শক্তিক্ষয়ই হবে,৩কিছু লাভ হবে না। ভিক্ষের বিধান কেবল সন্ন্যাসীর পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যদ্বয়ের সিদ্ধির জন্য, কিন্তু ঐ উপায়ে এখন আর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। সুতরাং এ অবস্থায় যদি কোন সন্ন্যাসী নিজের জীবনযাত্রার উপযোগী মাত্র অর্থ সংগ্রহ করে যে উদ্দেশ্যে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, তার সিদ্ধির জন্যে সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করেন, তা হলে তাতে সন্ন্যাসধর্মের মূল উদ্দেশ্যের বিপরীতাচরণ হয় না। অনেক সময় লোকে অজ্ঞতাবশতঃ উপায়কেই উদ্দেশ্য করে তোলে। দু-একটা দৃষ্টান্ত ভেবে দেখ। অনেক লোকের জীবনের উদ্দেশ্য—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ। তার উপায়রূপে সে টাকা রোজগার করতে আরম্ভ করে। কিন্তু এখানেও উদ্দেশ্য ভুলে উপায়ের প্রতি এতদূর আসক্ত হয় যে, টাকা-সঞ্চয়ই করতে থাকে, তা ব্যয় করে যে ভোগ করবে, তার ক্ষমতা পর্যন্ত তার থাকে না। আরও দেখ, কাপড়-চোপড় কাচবার

উদ্দেশ্য—শুচি ও শুদ্ধ হওয়া। কিন্তু আমরা অনেক সময়ে কাপড়-চোপড় শুধু একবার জলে ফেলে নিংড়িয়ে নিলেই শুচি হলাম মনে করি। এই-সব জায়গায় আমরা উপায়কে উদ্দেশ্যের আসনে বসিয়ে গোলমাল করে ফেলি। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য কখনই ভুল করা উচিত নয়।

৬. মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা

ধর্মালোচনা-প্রসঙ্গে কথিত

দক্ষিণ ভারতে অত্যন্ত প্রতাপশালী এক রাজবংশ ছিল। বিভিন্ন কালের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জন্ম হইতে গণনা করিয়া কোষ্ঠী সংগ্রহ করিয়া রাখার একটি নিয়ম তাঁহারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ঐ-সব কোষ্ঠীতে নির্দিষ্ট ভবিষ্যতের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেন এবং পরে সঙঘটিত বাস্তব ঘটনার সঙ্গে তুলনা করিতেন। প্রায় হাজার বৎসর ধরিয়া এইরূপ করার ফলে তাঁহারা কতকগুলি ঐক্য খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। সেইগুলি হইতে সাধারণ সূত্র নির্ণয় করিয়া এক বিরাট গ্রন্থ প্রণীত হইল। কালক্রমে সেই রাজবংশ লুপ্ত হইলেও, জ্যোতিষীদের বংশটি বাঁচিয়া রহিল এবং সেই গ্রন্থটি তাহাদের অধিকারে আসিল। সম্ভবতঃ এইভাবেই ফলিত জ্যোতিষ-বিদ্যার উদ্ভব হইয়াছিল। যে-সকল কুসংস্কার হিন্দুদের প্রভূত অনিষ্ট-সাধন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটি হইল এই জ্যোতিষের খুঁটিনাটির প্রতি অত্যধিক মনোযোগ।

আমার ধারণা ভারতে ফলিত জ্যোতিষ-বিদ্যা গ্রীকগণই প্রথম প্রবর্তন করে এবং তাহারা হিন্দুগণের নিকট হইতে জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া ইওরোপে লইয়া যায়। ভারতে বিশেষ জ্যামিতিক পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত অনেক পুরাতন বেদী দেখিতে পাওয়া যায় এবং নক্ষত্রের বিশেষ বিশেষ অবস্থানকালে কতকগুলি ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠিত হইত। সেজন্য আমার মনে হয়, গ্রীকগণ হিন্দুদের ফলিত জ্যোতিষ-বিদ্যা দিয়াছে এবং হিন্দুরা তাহাদের দিয়াছে জ্যোতির্বিজ্ঞান।

কয়েকজন জ্যোতিষীকে আমি অদ্‌ভুত ভবিষ্যদ্বাণী করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা যে কেবল নক্ষত্র বা সেই জাতীয় কোন ব্যাপার হইতে ঐ-সব উক্তি করিতেন, এইরূপ

বিশ্বাসের কারণ আমি পাই নাই। অনেক ক্ষেত্রে তাহা নিছক অপরের মনকে বুঝিবার ক্ষমতা। কখনও কখনও আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সে-সব সম্পূর্ণ বাজে কথা।

লণ্ডনে আমার কাছে এক যুবক প্রায়ই আসিত এবং জিজ্ঞাসা করিত, 'আগামী বছর আমার অদৃষ্টে কী আছে?' আমি তাহার ঐরূপ প্রশ্নের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সে বলে, 'আমার সব টাকাপয়সা নষ্ট হয়ে গেছে, আমি এখন খুবই গরীব।' অনেকের কাছে টাকাই একমাত্র ভগবান্। দুর্বল লোকগুলি যখন সব কিছু খোয়াইয়া আরও দুর্বল হইয়া পড়ে, তখন তাহারা যত অপ্রাকৃত উপায়ে টাকা রোজগার করিবার ধান্ধায় থাকে এবং ফলিত জ্যোতিষ বা ঐ ধরনের জিনিষের আশ্রয় নেয়। 'কাপুরুষ ও মূর্খরাই অদৃষ্টের দোহাই দেয়'—সংস্কৃত প্রবচনে এইরূপ আছে। কিন্তু যিনি শক্তিমান্ তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলেন, 'আমিই আমার অদৃষ্ট গড়িব।' যাহারা বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছে, তাহারাই নিয়তির কথা বলে। যুবকেরা সাধারণতঃ জ্যোতিষের দিকে ঘেঁষে না। গ্রহসমূহের প্রভাব হয়তো আমাদের উপর রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমাদের বেশী কিছু আসে যায় না। বুদ্ধ বলিয়াছেন, 'যাহারা নক্ষত্র গণনা, এরূপ অন্য বিদ্যা বা মিথ্যা চালাকি দ্বারা জীবকা অর্জন করে, তাহাদের সর্বদা বর্জন করিবে।' তাঁহর উক্তি নির্ভরযোগ্য, কেননা তাঁহার মত শ্রেষ্ঠ হিন্দু এ পর্যন্ত কেহ জন্মান নাই। নক্ষত্রগুলি আসুক, তাহাতে ক্ষতি কি? একটি নক্ষত্র দ্বারা যদি আমার জীবন বিপর্যস্ত হয়, তবে আমার জীবনের মূল্য এক কানাকড়িও নয়। জ্যোতিষ-বিদ্যায় বা ঐ ধরনের রহস্যপূর্ণ ব্যাপারে বিশ্বাস সাধারণতঃ দুর্বল চিত্তের লক্ষণ; অতএব যখনই আমাদের মনে সে-সব জিনিষ প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে, তখনই আমাদের উচিত চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া, উত্তম খাদ্য খাওয়া ও উপযুক্ত বিশ্রাম গ্রহণ করা।

কোন ঘটনার ব্যাখ্যা যদি তাহার স্বকীয় প্রকৃতির মধ্য হইতে খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তবে বাহিরে তাহার কারণ সন্ধান মত আহাম্মকি। জগৎ যদি নিজেই নিজেকে ব্যাখ্যা করে, তাহা হইলে বাহিরে ব্যাখ্যা খুঁজিতে যাওয়া নির্বোধের কাজ। মানুষের জীবনে এমন কিছু কি তোমরা কখনও দেখিয়াছ, যাহা তাহার নিজের শক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না? সুতরাং নক্ষত্র বা জগতের অন্য কিছুর নিকট যাইবার কি প্রয়োজন? আমার নিজের কর্মই আমার বর্তমান অবস্থার যথোচিত ব্যাখ্যা। স্বয়ং যীশুর বেলায়ও এই একই কথা। আমরা জানি, তাঁহার পিতা ছিলেন সামান্য একজন ছুতার মিস্ত্রী। তাঁহার

শক্তির ব্যাখ্যা খুঁজিবার জন্য আমাদের অন্য কাহারও কাছে যাইবার প্রয়োজন নাই। যীশু তাঁহার নিজ অতীতেরই ফল, যে অতীতের সবটুকুই ছিল তাঁহার আবির্ভাবের প্রস্তুতিপর্ব। বুদ্ধ বারবার জীবদেহ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কিভাবে ঐ-সকল জন্মের মধ্য দিয়া তিনি পরিণামে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন তাহারও বিবরণ তিনি দিয়াছেন। সুতরাং এগুলি ব্যাখ্যা করিবার জন্য নক্ষত্রের দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন আছে কি? নক্ষত্রগুলির সামান্য প্রভাব হয়তো থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে মনোযোগ না দিয়া এবং না ঘাবড়াইয়া আমাদের কর্তব্য হইল ঐগুলিকে উপেক্ষা করা। আমার সমস্ত শিক্ষার প্রথম ও প্রধান কথা এইঃ যাহা কিছু তোমার আধ্যাত্মিক, মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতা আনে, তাহা পায়ের আঙ্গুল দিয়া স্পর্শ করিবে না। মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক শক্তি রহিয়াছে, তাহার বিকাশই ধর্ম। অনন্ত শক্তি যেন একটি স্প্রিং-এর ন্যায় কুণ্ডলীবদ্ধ হইয়া এই ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে রহিয়াছে এবং সেই চাপা শক্তি ক্রমে বিস্তৃতিলাভ করিতেছে। নানা দেহ ধারণ করিয়া ইহা নিজেকে বিকাশ করিতে চায়। যে দেহগুলি এই বিকাশের অনুপযুক্ত, সেইগুলিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ঐ শক্তি উন্নততর দেহ গ্রহণ করে। ইহাই মানুষের ইতিহাস—ধর্ম, সভ্যতা বা প্রগতির ইতিহাস। সেই বিশালবপু শৃঙ্খলিত দৈত্য প্রমিথিউসের বন্ধন ছিঁড়িয়া যাইতেছে। সর্বত্রই এই শক্তির বিকাশ। জ্যোতিষ প্রভৃতি অনুরূপ ভাবের মধ্যে কণামাত্র সত্য থাকিলেও সেইগুলি বর্জন করা উচিত।

একটি পুরানো গল্পে আছে, জনৈক জ্যোতিষী রাজার নিকট আসিয়া বলিল, 'আপনি ছয় মাসের মধ্যে মারা যাইবেন।' রাজা ভয়ে জ্ঞানবুদ্ধি হারাইয়া ফেলিলেন এবং তখনই তাঁহার মরিবার উপক্রম হইল। কিন্তু মন্ত্রী ছিলেন চতুর ব্যক্তি; তিনি রাজাকে বলিলেন যে, ঐ জ্যোতিষীরা নেহাতই মূর্খ। রাজা তাঁহার কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। সুতরাং জ্যোতিষীরা যে নির্বোধ, তাহা রাজাকে দেখাইয়া দিবার জন্য জ্যোতিষীকে আর একবার রাজপ্রসাদে আমন্ত্রণ করা ছাড়া মন্ত্রী অন্য কোন উপায় দেখিলেন না। জ্যোতিষী আসিলে তাহার গণনা নির্ভুল কিনা মন্ত্রী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্যোতিষী বলিল, তাহার গণনা ভুল হইতে পারে না, কিন্তু মন্ত্রীর সন্তুষ্টির জন্য সে আবার আদ্যোপান্ত গণনা করিয়া অবশেষে জানাইল যে, তাহা একেবারে নির্ভুল। রাজার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। মন্ত্রী জ্যোতিষীকে বলিলেন, 'আপনি কখন মরিবেন, মনে করেন?' উত্তরে সে বলিল, 'বার বৎসরের মধ্যে।' মন্ত্রী তাড়াতাড়ি তাঁহার

তরবারিখানি বাহির করিয়া জ্যোতিষীর মুণ্ডচ্ছেদ করিলেন; তারপর রাজাকে বলিলেন, 'দেখছেন, কত বড় মিথ্যাবাদী! এই মুহূর্তেই ইহার পরমায়ু শেষ হয়ে গেল।'

যদি তোমাদের জাতিকে বাঁচাইতে চাও, তবে ঐ-সব জিনিষ হইতে দূরে থাক। যাহা শ্রেয়ঃ তাহার একমাত্র পরীক্ষা হইল—উহা আমাদের বলবান্ করে। শুভের মধ্যেই জীবন, অশুভ মৃত্যুস্বরূপ। এই-সব কুসংস্কারপূর্ণ ভাব তোমাদের দেশে ব্যাঙের ছাতার মত গজাইতেছে এবং বস্তুর যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণে অসমর্থ নারীগণই ঐগুলি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত। ইহার কারণ—তাঁহারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিলেও এখনও বোধশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হন নাই। কোন উপন্যাসের গোড়া হইতে কয়েক লাইনের একটি কবিতার উদ্ধৃতি মুখস্থ করিয়া কোন মহিলা বলেন—তিনি গোটা ব্রাউনিং জানেন। আর একজন খানতিনেক বক্তৃতা শুনিয়াই ভাবেন, তিনি জগতের সব কিছু জানিয়া ফেলিয়াছেন। মুশকিল এই, তাঁহারা নারীর সহজাত কুসংস্কারগুলি ছাড়িতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের প্রচুর অর্থ আর কিছু বিদ্যা আছে; কিন্তু তাঁহারা যখন পরিবর্তনের এই মধ্যবর্তী অবস্থা অতিক্রম করিয়া শক্ত হইয়া দাঁড়াইবেন, তখনই সব ঠিক হইয়া যাইবে। এখন তাঁহারা কতকগুলি বচনবাগীশের হাতের পুতুল। দুঃখিত হইও না, কাহাকেও আঘাত করার ইচ্ছা আমার নাই, কিন্তু আমাকে সত্য বলিতেই হইবে। দেখিতে পাইতেছ না কি, তোমরা কিভাবে এ-সবের দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হইতেছ? দেখিতেছ না কি, এই-সব মেয়েরা কতখানি ঐকান্তিক এবং সকলের অন্তর্নিহিত দেবত্ব কখনও মরিতে পারে না। সেই দিব্যভাবকে আহ্বান করিতে জানাই সাধনা।

যতই দিন যাইতেছে, প্রতিদিন ততই আমার ধারণা দৃঢ়তর হইতেছে যে, প্রত্যেক মানুষ দিব্যস্বভাব। পুরুষ বা স্ত্রী যতই জঘন্য চরিত্রের হউক না কেন, তাহার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিনাশ নাই। শুধু সে জানে না, কিভাবে সেই দেবত্বে পৌঁছিতে হয় এবং সেই সত্যের প্রতীক্ষায় আছে। দুষ্ট লোকেরা সর্বপ্রকার বুজরুকির সাহায্যে সেই পুরুষ বা স্ত্রীকে প্রতারিত করার চেষ্টা করিতেছে। যদি একজন অপরকে অর্থের জন্য প্রতারণা করে, তোমরা বল—সে নির্বোধ ও বদমাশ। আর যে অন্যকে অধ্যাত্মপথে প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা করে, তাহার অন্যায় আরও কত বেশী! কী জঘন্য! সত্যের একমাত্র পরীক্ষা এই যে, ইহা তোমাকে সবল করিবে এবং কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে লইয়া যাইবে। দার্শনিকের কর্তব্য মানুষকে কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে লইয়া যাওয়া। এমন কি এই জগৎ,

এই দেহ ও মন কুসংস্কাররাশি মাত্র; তোমরা অনন্ত আত্মা! আকাশের মিটমিট-করা তারাগুলি দ্বারা তুমি প্রতারিত হইবে! সেটা লজ্জার কথা। দিব্যাত্মা তোমরা—মিটমিট-করা ক্ষীণালোক নক্ষত্রগুলি তাহাদের অস্তিত্বের জন্য তোমারই কাছে ঋণী।

একদা হিমালয়প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলাম, আমাদের সম্মুখে ছিল সুদীর্ঘ পথ। কপর্দকহীন সন্ন্যাসী আমরা; যানবাহন কোথায় পাইব? সুতরাং সমস্ত পথ আমাদের পায়ে হাঁটিতে হইল। আমাদের সঙ্গে ছিলেন এক বৃদ্ধ সাধু। কয়েকশত মাইল চড়াই-উৎরাইয়ের পথ তখনও পড়িয়া আছে—সেই দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ সাধু বলিলেন, 'কিভাবে আমি এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিব? আমি আর হাঁটিতে পারিতেছি না; আমার হৃদযন্ত্র বিকল হইয়া যাইবে।' আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'আপনার পায়ের দিকে তাকান।' তিনি উহা করিলে আমি বলিলাম, 'আপনার পায়ের নীচে যে-পথ পড়িয়া আছে, তাহা আপনিই অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন এবং সামনে যে-পথ দেখিতেছেন, তাহাও সেই একই পথ। শীঘ্রই সেই পথও আপনার পায়ের নীচে আসিবে।' উচ্চতম বস্তুগুলি তোমাদের পায়ের তলায়, কারণ তোমরা দিব্য নক্ষত্র। এ-সব বস্তুই তোমাদের পায়ের তলায়। ইচ্ছা করিলে তোমরা নক্ষত্রগুলি মুঠিতে ধরিয়া গিলিয়া ফেলিতে পার, তোমাদের যথার্থ স্বরূপের এমনই শক্তি! বলীয়ান হও, সমস্ত কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে ওঠ এবং মুক্ত হও।

৭. ঐক্য

[১৯০০ খ্রীঃ জুন মাসে নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিতে প্রদত্ত একটি বক্তৃতার স্মারকলিপি।]

ভারতে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মতবাদ—হয় ঐক্যের একটি মূল ভাব অথবা দ্বৈতভাব থেকে বিকাশ লাভ করেছে।

মতবাদগুলি সবই বেদান্তের অন্তর্গত এবং বেদান্তের সাহায্যে ব্যাখ্যাত। তাদের শেষ সার কথা হল ঐক্যের শিক্ষা। যাঁকে আমরা বহুরূপে দেখছি, তিনিই ঈশ্বর। বস্তুজাত পৃথিবী এবং বহুবিধ ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান আমরা অনুভব করি, তবু মাত্র একটি সত্তাই বিদ্যমান।

এই-সমস্ত বিভিন্ন নাম কেবল সেই 'এক'-এর প্রকাশের মাত্রাগত পার্থক্যকে দেখিয়ে দেয়। আজ যে কীট, কাল সে দেবতা। এই যে-সকল স্বাতন্ত্র্যকে আমরা এত ভালবাসি, সে-সবই এক অনন্ত সত্তার অংশমাত্র, এবং সেগুলির ভেদ কেবল প্রকাশের মাত্রায়। সেই অনন্ত সত্যকে জানাই মুক্তিলাভ।

উপাসনার প্রণালী সম্পর্কে আমাদের যতই বিভ্রান্তি ঘটুক না কেন, বস্তুতঃ মুক্তির জন্যই আমাদের সকল চেষ্টা। আমরা সুখও চাই না, দুঃখও চাই না; চাই মুক্তি। এই একটি লক্ষ্যের মধ্যেই আছে মানুষের সকল অতৃপ্ত তৃষ্ণার মূল রহস্য। হিন্দুও বলে, বৌদ্ধও বলে—মানুষের তৃষ্ণা হল অধিক ও অধিকতরকে পাবার জন্য একটি জ্বলন্ত অপূরণীয় আকাঙ্ক্ষা।

তোমরা আমেরিকানরা সর্বদা আরও সুখ আর সম্ভোগের সন্ধান করছ। এ-কথা সত্য যে, বাইরে তোমরা পরিতৃপ্ত হবে না, কিন্তু ভিতরে—গভীরে তোমরা যা খুঁজছ, তা হল মুক্তি।

এই বাসনার বিশালতা বস্তুতঃ মানুষের নিজের অনন্তত্বের লক্ষণ। যেহেতু মানুষ অনন্ত, তাই বাসনা এবং বাসনাপূর্তি অনন্ত আকার ধারণ করলেই সে পরিতৃপ্ত হতে পারে।

তাহলে কোন্ বস্তু মানুষকে তৃপ্ত করতে পারে? কাঞ্চন নয়, সম্ভোগ নয়, সৌন্দর্য নয়। শুধু এক অনন্তই তাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে, এবং সেই অনন্ত সে নিজেই। এ-কথা যখন সে উপলব্ধি করে, কেবল তখনই মুক্তি আসে।

'এই বাঁশিটি তার রন্ধ্ররূপী সকল ইন্দ্রিয়, সকল চেতনা, অনুভূতি ও সঙ্গীত নিয়ে শুধু একটি রাগিণীই গাইছে। যে-বন থেকে তাকে ছেদন করা হয়েছিল, সেখানেই ফিরে যাবার সে প্রত্যাশী।'

'—নিজেকে উদ্ধার কর নিজের দ্বারা,
নিজেকে ডুবতে দিও না কখনও,
কারণ তুমিই তোমার পরম বন্ধু,
আবার তুমিই তোমার পরম শত্রু।'

অনন্তকে সাহায্য করতে পারে কে? অন্ধকারের মধ্য দিয়ে যে হাতখানা তোমার কাছে আসছে, তাকেও তোমার নিজেরই হাত হতে হবে।

ভীতি ও বাসনা—এই দুটি কারণই এ-সবের মূলে। কে তাদের সৃষ্টি করে? আমরা নিজেরাই। আমাদের জীবন যেন স্বপ্ন থেকে স্বপ্নান্তরে যাত্রা। অনন্ত স্বপ্নের স্রষ্টা মানুষ সীমাবদ্ধ স্বপ্ন দেখে চলেছে!

আহা! বাইরের কোন বস্তুই যে নিত্য বস্তু নয়—এ যে কী অপূর্ব আশীর্বাদ! এই আপেক্ষিক জগতে কিছুই চিরন্তন নয়—এ-কথা শুনে যাদের বুক কেঁপে ওঠে, তারা ঐ কথাগুলির অর্থ জানে না।

আমি যেন অনন্ত নীলাকাশ। আমার উপর দিয়ে এই নানা রঙের মেঘ ভেসে চলে যায়, কখনও বা এক মুহূর্ত থাকে, তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি সেই চিরন্তন নীলই থেকে যাই। আমি সব কিছুর সাক্ষী, সেই চিরন্তন সাক্ষী। আমি দেখি বলেই প্রকৃতি আছে। আমি না দেখলে প্রকৃতি থাকে না। আমাদের কেহই কিছু দেখতে বা কিছু বলতে পারতাম না, যদি এই অনন্ত ঐক্য এক মুহূর্তের জন্যও ভেঙে যেত।

৮. হিন্দু ও গ্রীকজাতি

তিনটি পর্বত মানুষের অগ্রগতির সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মানঃ হিমালয়—ভারতীয় আর্য-সভ্যতার, সিনাই—হিব্রু-সভ্যতার, অলিম্পাস—গ্রীক-সভ্যতার। আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান আবহাওয়ায় অবিরাম কর্ম করিতে সমর্থ হইল না; সুতরাং তাহারা চিন্তাশীল ও অন্তর্মুখী হইয়া ধর্মের উন্নতিসাধন করিল। তাহারাই আবিষ্কার করিল যে, মানবমনের শক্তি সীমাহীন; অতএব তাহারা মানসিক ক্ষমতা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিল। ইহার মাধ্যমে তাহারা শিখিল যে, মানুষের মধ্যে এক অনন্ত সত্তা লুক্কায়িত আছে, এবং ঐ সত্তা শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে। এই সত্তার বিকাশ-সাধনই তাহাদের চরম উদ্দেশ্য হইল।

আর্যজাতির অপর একটি শাখা ক্ষুদ্রতর ও অধিকতর সৌন্দর্যমণ্ডিত গ্রীস দেশে প্রবেশ করিল। গ্রীসের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকূল হওয়ায় তাহাদের কার্যকলাপ

বহির্মুখ হইয়া পড়িল এবং এইরূপে তাহারা বাহ্যশিল্প ও বাহিরের স্বাধীনতার বিকাশ-সাধন করিল। গ্রীকজাতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা অনুসন্ধান করিয়াছিল। হিন্দুগণ সর্বদাই আধ্যাত্মিক মুক্তি অন্বেষণ করিয়াছে। উভয় পক্ষই একদেশদর্শী। জাতীয় সংরক্ষণ অথবা স্বাদেশিকতার প্রতি ভারতীয়গণের তত মনোযোগ নাই, তাহারা কেবল ধর্মরক্ষায় তৎপর; অপর পক্ষে গ্রীকজাতির নিকট এবং ইওরোপে (যেখানে গ্রীক সভ্যতার ধারা অনুসৃত হইয়াছে) স্বদেশের স্থান অগ্রে। সামাজিক মুক্তি উপেক্ষা করিয়া কেবল আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য প্রযত্ন রুচিবিশেষ, কিন্তু উহার বিপরীত অর্থাৎ আধ্যাত্মিক মুক্তি উপেক্ষা করিয়া কেবল সামাজিক মুক্তির জন্য যত্নবান হওয়া আরও দোষাবহ। আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক—উভয়বিধ মুক্তির জন্যই চেষ্টা প্রয়োজন।

৯. মানুষ ও খ্রীষ্টের মধ্যে প্রভেদ

অভিব্যক্ত হয়ে গেলে জীবে জীবে অনেক প্রভেদ। অভিব্যক্ত জীবরূপে তুমি কখনও খ্রীষ্ট হতে পারবে না। মাটি দিয়ে একটি হাতী গড়, আবার সেই মাটি থেকেই একটি ইঁদুর গড়। তাদের জলে ডোবাও—দুটিই একাকার হয়ে যাবে। মৃত্তিকারূপে তাদের চিরন্তন ঐক্য, নির্মিত বস্তু হিসাবে তাদের চিরন্তন পার্থক্য। ঈশ্বর ও মানুষ—নিত্যই হল উভয়ের উপাদান। নিত্যরূপে সর্বব্যাপী সত্তারূপে আমরা সকলে এক; অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে ঈশ্বর চিরন্তন প্রভু এবং আমরা চিরন্তন ভৃত্য।

তোমাদের মধ্যে তিনটি জিনিষ আছেঃ দেহ, মন ও আত্মা। আত্মা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, মনের জন্ম-মৃত্যু আছে, এবং দেহেরও আছে। তুমি সেই আত্মা, কিন্তু সচরাচর তোমার ধারণা শরীরটাই বুঝি তুমি। এক ব্যক্তি যখন বলে, 'আমি এখানে' তখন সে শরীরটার কথাই ভাবে। তারপর আসে আর একটি মুহূর্ত, যখন তুমি সর্বোচ্চ স্তরে বিরাজ করছ; তুমি তখন বল না, 'আমি এখানে'। তখন যদি কোন ব্যক্তি তোমাকে গালাগালি করে বা অভিশাপ দেয়, তোমার কোন ক্রোধ বা বিরক্তি হয় না, কারণ তুমি হলে আত্মা। 'যখন নিজেকে মন বলে ভাবি, তখন হে চিরন্তন অগ্নি, আমি তোমার স্ফুলিঙ্গমাত্র। আর নিজেকে যখন আত্মা বলে অনুভব করি, তখন তুমি ও আমি অভেদ'—এক ভক্ত বলেছিলেন ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে। তাহলে মন আত্মার অগ্রবর্তী হয় কি করে?

ঈশ্বর যুক্তিবিচার করেন না; যদি সত্যই জান, তবে যুক্তিবিচার করবে কেন? গোটাকতক তথ্যকে জানবার জন্য এবং তার ভিত্তিতে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম দাঁড় করাবার জন্য আমরা যে কীটের মত সন্ধান করে ফিরছি, সেই চেষ্টায় গড়ে ওঠা সমস্ত জিনিষগুলি আবার ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, এ-সবই আমাদের দুর্বলতার চিহ্ন।

মন ও যাবতীয় বস্তুর উপর আত্মা প্রতিফলিত হয়। আত্মার আলোকই মনকে চেতনায় স্পন্দিত করে। সব কিছুই আত্মার প্রকাশ; মনগুলি অসংখ্য দর্পণের মত। যাকে তোমরা ভালবাসা, ভয়, ঘৃণা, পুণ্য বা পাপ বল, সব কিছুই আত্মার প্রতিফলন; প্রতিফলকটি নিম্নস্তরের হলে প্রতিফলনও ভাল হয় ।

১০. খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ কি অভিন্ন?

আমার একটা বিশেষ ধারণা হল বুদ্ধই খ্রীষ্ট হয়েছিলেন। বুদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ‘পাঁচ-শ বছর পরে আবার আমি আসব’ এবং পাঁচ-শ বছর পরে খ্রীষ্ট এসেছিলেন। এঁরা সমগ্র মানব-প্রকৃতির দুই আলোকস্তম্ভ। দুটি মানুষ আবির্ভূত হয়েছিলেন—বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট; এঁরা দুটি বিরাট শক্তি—দুটি প্রচণ্ড বিশাল ব্যক্তিত্ব, দুটি ঈশ্বর। জগৎটাকে তাঁরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিলেন। পৃথিবীর যেখানেই সামান্য জ্ঞান আছে, সেখানেই মানুষ বুদ্ধ কিম্বা খ্রীষ্টের নামে মাথা নোয়ায়। তাঁদের মত আর হওয়া খুবই কঠিন, তবে আশা করি, আরও হবে। পাঁচ-শ বছর পরে এলেন মহম্মদ, আরও পাঁচ-শ বছর পরে প্রোটেষ্টাণ্ট তরঙ্গ নিয়ে এলেন লুথার, এবং তারপরে আবার পাঁচ-শ বছর কেটে গেছে। কয়েক হাজার বছরের মধ্যে যীশু ও বুদ্ধের মত দু-জন মানুষ জন্মান একটা বিরাট ব্যাপার। এমন দু-জন মানুষই কি যথেষ্ট নয়? খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ ঈশ্বর ছিলেন, অন্যেরা হলেন ধর্মাচার্য। এই দুজনের জীবন অনুশীলন কর এবং তাঁদের মধ্যে শক্তির বিকাশ লক্ষ্য কর—দেখ কী শান্ত, অপ্রতিরোধের জীবন—ঝুলিতে একটি কপর্দকও নেই, এমন দরিদ্র ভিক্ষুকের মত, সারা জীবন ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত, ধর্মদ্রোহী ও নির্বোধ বলে কথিত—আর ভেবে দেখ, সমগ্র মানবজাতির উপর কী বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তি তাঁরা মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

১১. পাপ থেকে পরিত্রাণ

অজ্ঞান থেকে মুক্তি পেলে তবেই আমরা পাপ থেকে নিস্তার পাব। অজ্ঞতাই কারণ, পাপ হল তার ফল।

১২. রামায়ণ-প্রসঙ্গে

[আলোচনামুখে ছোট ছোট মন্তব্য]

তাঁহাকেই পূজা কর, যিনি সর্বদা আমাদের নিকট রহিয়াছেন, আমরা ভাল অথবা মন্দ যাহাই করি না কেন, যিনি কখনও আমাদের পরিত্যাগ করেন না; কারণ ভালবাসা কখনও হীন করে না, ভালবাসায় বিনিময় নাই, স্বার্থপরতা নাই।

রাম ছিলেন বৃদ্ধ নৃপতির জীবনস্বরূপ; কিন্তু তিনি রাজা, সুতরাং তাঁহাকে অঙ্গীকার পালন করিতেই হইয়াছিল।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ বলিয়াছিলেন, 'রাম যেখানে গমন করিবেন, আমি সেখানেই যাইব।'

হিন্দুগণের নিকট জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ মাতৃসমা।

অবশেষে তিনি দিগন্তরেখার শেষ প্রান্তে অবস্থিত ক্ষীণ শশিকলার ন্যায় ম্লান ও কৃশ সীতাকে দেখিতে পাইলেন।

সীতা সতীত্বের প্রতিমূর্তি; স্বীয় পতি ব্যতীত অপর কোন পুরুষের অঙ্গ তিনি কদাচ স্পর্শ করেন নাই।

রাম বলিয়াছিলেন, 'পবিত্র? সীতা পবিত্রতা স্বয়ং।'

নাটক ও সঙ্গীতমাত্রই ধর্ম। সঙ্গীতমাত্রেই—তাহা প্রেমের অথবা অন্য যে-কোন সঙ্গীত হউক না কেন—যদি কেহ তাহার সমগ্র হৃদয় সেই সঙ্গীতে ঢালিয়া দিতে পারে,

তবে তাহাতেই তাহার মুক্তিলাভ। আর কিছু করিবার প্রয়োজন নাই। যদি কাহারও আত্মা সঙ্গীতে মগ্ন হয়, তবে তাহাতেই তাহার মুক্তি। লোকে বলে, সঙ্গীত একই লক্ষ্যে লইয়া যায়।

পত্নী সহধর্মিণী। হিন্দুকে শত শত ধর্মানুষ্ঠান করিতে হয়। পত্নী না থাকিলে একটি অনুষ্ঠানেও তাহার অধিকার নাই। পুরোহিত পতি ও পত্নীকে একত্র আবদ্ধ করিয়া দেন এবং তাঁহারা উভয়ে একসঙ্গে মন্দির প্রদক্ষিণ করে এবং শ্রেষ্ঠ তীর্থসমূহ পরিক্রমা করিয়া থাকে।

রাম দেহ বিসর্জন করিয়া পরলোকে সীতার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

সীতা পবিত্র, বিশুদ্ধ এবং সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত।

১৩. জগজ্জননীর কাছে প্রত্যাবর্তন

ধাত্রী যখন কোন শিশুকে উদ্যানে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে খেলা করতে থাকে, মা হয়তো তখন শিশুকে ঘরে ডেকে পাঠায়। শিশু তখন খেলায় মত্ত, সে বলে, ‘যাব না; আমি খেতে চাই না।’ খানিক বাদেই খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে শিশু বলে, ‘আমি মার কাছে যাব।’ ধাত্রী বলে, ‘এই দেখ নতুন পুতুল’, কিন্তু শিশুটি বলে, ‘না, না, পুতুল চাই না, আমি মার কাছে যাব’ এবং যতক্ষণ না যেতে পারে কাঁদতে থাকে। আমরা সবাই এক একটি শিশু। ঈশ্বর হলেন জননী। আমরা টাকাকড়ি, ধনদৌলত, ইহজগতের এইসব জিনিষ খুঁজে বেড়াচ্ছি, কিন্তু সময় আসবেই, যখন আমাদের খেলা ভাঙবে; এবং তখন এই প্রকৃতিরূপ ধাত্রী আমাদের আরও পুতুল দিতে চাইলেও আমরা বলব, ‘না, ঢের হয়েছে, এবার ঈশ্বরের কাছে যাব।’

১৪. ঈশ্বর থেকে স্বতন্ত্র কোন ব্যক্তিসত্তা নেই

আমরা যদি ঈশ্বর থেকে অবিচ্ছিন্ন এবং তাঁর সঙ্গে সর্বদাই একসত্তা হই, তাহলে আমাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বলে কি কিছুই নেই? হ্যাঁ আছে; তা হল ঈশ্বর। আমাদের ব্যক্তিসত্তা হল ঈশ্বর। তুমি এখন যা, সেটা যথার্থ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নয়। সে এক সত্যের দিকে তুমি এগিয়ে চলেছ। স্বাতন্ত্র্য কথাটার অর্থ হল যাকে ভাগ করা যায় না। আমরা এখন যে অবস্থায় আছি, তাকে কেমন করে স্বাতন্ত্র্যের অবস্থা বলবে? এখন এক ঘণ্টা তুমি এক-রকম চিন্তা করছ, আবার পরের ঘণ্টায় অন্যরকম এবং দু-ঘণ্টা পরে আর এক-রকম। স্বাতন্ত্র্য হল তাই, যা অপরিবর্তনীয়। বর্তমান অবস্থা চিরকাল বজায় থাকলে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক ব্যাপার হবে, তাহলে চোর চিরকাল চোরই থেকে যাবে, বদমাশ চিরকাল থাকবে বদমাশ। শিশু অবস্থায় যে মরবে, তাকে চিরদিন শিশুই থাকতে হবে। প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য হল তাই, যার কখনও পরিবর্তন হয় না এবং কখনও হবে না; এবং তা হল আমাদের অন্তরে সমাসীন ঈশ্বর।

ভারতবর্ষে যা কিছু কল্যাণকর, বিশুদ্ধ ও পবিত্র, সীতা বলতে তাই বুঝায়; নারীর মধ্যে নারীত্ব বলতে যা বুঝায়—সীতা তাই।

সীতা ধৈর্যশীলা, সহিষ্ণু, চির বিশ্বস্তা, চির বিশুদ্ধা পত্নী। তাঁর সমস্ত দুঃখের মধ্যে রামের বিরুদ্ধে একটিও কর্কশ বাক্য উচ্চারিত হয় নাই। সীতা কখনও আঘাতের পরিবর্তে আঘাত দেন নাই। 'সীতা ভব!'—সীতা হও।

১৫. খ্রীষ্ট আবার কবে অবতীর্ণ হবেন?

এ-সব ব্যাপারেও আমি বিশেষ মাথা ঘামাই না। আমার কাজ হল মূলনীতি নিয়ে। ভগবান্ বার বার আবির্ভূত হন, আমি শুধু এ-কথাই প্রচার করি; রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধরূপে তিনি ভারতে এসেছেন এবং আবার তিনি আসবেন। এ-কথা প্রায় স্পষ্টভাবেই দেখান যেতে পারে যে, প্রতি পাঁচশত বৎসর অন্তর পৃথিবী নিমজ্জমান হয় এবং তখন প্রচণ্ড একটা আধ্যাত্মিক তরঙ্গ আসে, আর সেই তরঙ্গের শীর্ষে থাকেন একজন খ্রীষ্ট।

সারা জগতে এখন একটা বিরাট পরিবর্তন আসছে এবং সেটি একই চক্রপথে ঘটছে। মানুষ দেখছে, সে জীবনের উপর আধিপত্য হারিয়ে ফেলেছে; তাদের গতি কোন্ দিকে? নিম্নে না ঊর্ধ্বে? ঊর্ধ্বে নিশ্চয়ই। নিম্নে কিরূপে হবে? ভাঙনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়; নিজের দেহ দিয়ে, জীবন দিয়ে সেই ফাটল ভরাট কর। তোমরা বেঁচে থাকতে কি করে দুনিয়াকে তলিয়ে যেতে দেবে?

১৬. ১৮৯২-৯৩ খ্রীঃ মান্দ্রাজে গৃহীত স্মারকলিপি হইতে

হিন্দুধর্মের তিনটি মূল তত্ত্বঃ ঈশ্বর, আপ্তবাক্যস্বরূপ বেদ, কর্ম ও পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস। যদি কেহ ঠিক ঠিক মর্ম গ্রহণপূর্বক বেদ অধ্যয়ন করে, তবে উহার মধ্যে সে সমন্বয়ের ধর্ম দেখিতে পাইবে।

অন্যান্য ধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের পার্থক্য এই যে, হিন্দুধর্মে আমরা সত্য হইতে সত্যে উপনীত হই—নিম্নতর সত্য হইতে ঊর্ধ্বতর সত্যে, কখনও মিথ্যা হইতে সত্যে নয়।

ক্রমবিকাশের দৃষ্টিতে বেদ অনুশীলন করা উচিত। একত্বের উপলব্ধিরূপ ধর্মের পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত ধর্ম-চেতনার অগ্রগতির সমগ্র ইতিহাস উহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

বেদ অনাদি ও নিত্য। ইহার অর্থ এরূপ নয়—যেমন কেহ কেহ ভ্রমবশতঃ মনে করেন যে, উহার বাক্য (শব্দ)-সমূহই অনাদি, শাশ্বত; কিন্তু উহার আধ্যাত্মিক নিয়মসমূহই অনাদি। এই অপরিবর্তনীয় শাশ্বত নিয়মগুলি বিভিন্ন সময়ে মহাপুরুষ বা ঋষিগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐগুলির মধ্যে কতকগুলি বিস্মৃত ও কতকগুলি রক্ষিত হইয়াছে।

যখন বহু লোক বিভিন্ন কোণ ও দূরত্ব হইতে সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তখন নিজ নিজ দৃষ্টি অনুযায়ী সমুদ্রের এক একটি অংশ প্রত্যেকের দৃষ্টিগোচর হয়। প্রত্যেকে বলিয়া থাকে, সে যাহা দেখিয়াছে, তাহাই প্রকৃত সমুদ্র; তাহাদের সকলের কথাই সত্য, কারণ তাহারা সকলেই সেই এক বিশাল বিস্তৃত সমুদ্রের বিভিন্ন অংশ দেখিয়া থাকে। সেইরূপ যদিও বিভিন্ন শাস্ত্রে উক্তিসকল পৃথক্ ও পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হয়, সেগুলি সবই সত্য প্রকাশ করিয়া থাকে, কারণ ঐ-সকল উক্তি এক অনন্ত সত্তার বিভিন্ন বর্ণনা।

যখন কেহ সর্বপ্রথম মরীচিকা দেখে, তখন উহা তাহার নিকট সত্য বলিয়াই প্রতীত হয়, পরে তৃষ্ণা-নিবারণের বৃথা চেষ্টা করিয়া সে হৃদয়ঙ্গম করে যে, উহা মরীচিকা। কিন্তু ভবিষ্যতে যখনই ঐ দৃশ্য তাহার নয়নগোচর হয়, তখন উহা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া সত্ত্বেও সে যে মরীচিকা দেখিতেছে, এ-ধারণা তাহার মনে সর্বক্ষণ বিরাজ করে। জীবন্মুক্তের নিকট মায়ার জগৎ এইরূপ।

যেমন কতকগুলি ক্ষমতা কোন বিশেষ পরিবারের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বর্তমান থাকে, তেমনি বৈদিক রহস্যের কতকগুলি কোন কোন পরিবারের মধ্যেই কেবল জানা ছিল। এই পরিবারগুলির বিলোপ-সাধনের সহিত ঐ-সকল রহস্যও অন্তর্হিত হইয়াছে।

বৈদিক শব-ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা আয়ুর্বেদীয় বিদ্যা অপেক্ষা কম পূর্ণাঙ্গ ছিল না। শরীরের বহু অংশের বিভিন্ন নাম ছিল, যেহেতু যজ্ঞের জন্য তাহাদের পশু ব্যবচ্ছেদ করিতে

হইত। সমুদ্র অর্ণবপোতে পূর্ণ বলিয়া বর্ণিত হয়। সমুদ্রযাত্রার ফলে সাধারণ লোক বৌদ্ধ হইয়া যাইবে, কতকটা এই আশঙ্কাহেতু পরবর্তী কালে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হয়।

বৌদ্ধধর্ম বৈদিক পৌরোহিত্য-ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে নব-গঠিত ক্ষত্রিয়-সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ। বৌদ্ধধর্ম হইতে উহার সার গ্রহণ করিয়া লইয়া হিন্দুধর্ম বৌদ্ধমতকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের সকল আচার্যের প্রচেষ্টা ছিল, হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম উভয়ের মধ্যে মিলন স্থাপন। শঙ্করাচার্যের উপদেশের মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাব দেখা যায়। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার উপদেশ এতদূর বিকৃত করিয়াছিলেন যে, পরবর্তী কালের কোন কোন সংস্কারক আচার্যের অনুগামিগণকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—ইহা ঠিকই হইয়াছে।

স্পেন্সারের 'অজ্ঞেয়' কি বস্তু? উহা আমাদের মায়া। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ অজ্ঞেয়ের প্রসঙ্গে ভয় পান, কিন্তু আমাদের দার্শনিকগণ অজানার উদ্দেশ্যে একটি বিপুল অভিযান আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং উহাতে তাঁহারা জয়ী হইয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ শকুনির ন্যায় ঊর্ধ্বে বিচরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে নিম্নে গলিত শবের প্রতি। অজানাকে তাঁহারা অতিক্রম করিতে পারেন না, অতএব পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্বক সর্বশক্তিমান্ ডলারকেই পূজা করিয়া থাকেন।

জগতে উন্নতির দুইটি ধারা আছে—রাজনৈতিক ও ধর্মভিত্তিক। প্রথমটিতে গ্রীকরাই সব—আধুনিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রীসের প্রতিষ্ঠানগুলির সম্প্রসারণ মাত্র; শেষেরটিতে অর্থাৎ ধর্মের উন্নতির ব্যাপারে হিন্দুদেরই একচেটিয়া অধিকার।

আমার ধর্ম এরূপ একটি ধর্ম—খ্রীষ্টধর্ম যাহার একটি শাখা ও বৌদ্ধধর্ম যাহার বিদ্রোহী সন্তান।

যখন একটি মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়—যাহা হইতে অপর পদার্থগুলির উপাদান সিদ্ধ হয়, তখনই রসায়নবিদ্যা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়। অন্যান্য শক্তিসমূহ যে-শক্তির বিভিন্ন অভিব্যক্তি, সেই মূল শক্তিপ্রাপ্ত হইলে পদার্থবিদ্যার উন্নতির অবসান ঘটে। সেইরূপ আধ্যাত্মিক একত্বের সন্ধান পাইলে ধর্মের ক্ষেত্রে উন্নতি করিবার আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। হিন্দুধর্মে তাহাই ঘটিয়াছে।

বেদে নাই—এরূপ কোন ধর্ম-সম্বন্ধীয় নূতন ধারণা কোথাও প্রচারিত হয় নাই।

প্রত্যেক বিষয়ে দুই জাতীয় বিকাশ বর্তমান—বিশ্লেষণমূলক (analytical) ও সমন্বয়মূলক (synthetical)। প্রথমটিতে হিন্দুগণ অন্যান্য জাতিকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। শেষেরটিতে তাঁহাদের স্থান শূন্য।৪

হিন্দুগণ বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্ম বিষয় অনুধাবন করিবার ক্ষমতা অনুশীলন করিয়াছেন। এ পর্যন্ত কোন জাতি পাণিনির ন্যায় ব্যাকরণ উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হন নাই

।

রামানুজের বিশিষ্ট কাজ হইতেছে জৈন ও বৌদ্ধদের হিন্দুধর্মে লইয়া আসা। রামানুজ মূর্তিপূজার একজন শ্রেষ্ঠ সমর্থক। তিনি প্রেম ও বিশ্বাসকে মুক্তিলাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন।

এমন কি ভাগবতে জৈনদের চব্বিশ তীর্থঙ্করের অনুরূপ চব্বিশ অবতারের উল্লেখ আছে। ঋষভদেবের নাম উভয়ের মধ্যে বর্তমান।

যোগাভ্যাস করিলে সূক্ষ্ম বস্তু ধারণা করিবার ক্ষমতা হয়। সিদ্ধপুরুষ বিষয় হইতে গুণসমূহকে পৃথক্ করিয়া এবং বস্তুসত্তা প্রদানপূর্বক তাহাদের স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করিতে সমর্থ। অন্যান্য ব্যক্তিগণ হইতে এখানেই সিদ্ধপুরুষের শ্রেষ্ঠতা।

দুইটি বিপরীত বস্তু চরম অবস্থায় গিয়া সর্বদা মিলিত হয় এবং একরূপ দেখায়। শ্রেষ্ঠ আত্মবিস্মৃত ভক্ত, যাঁহার মন অনন্ত পরব্রহ্মের ধ্যানে মগ্ন এবং অত্যন্ত হীন মদ্যপায়ী উন্মাদ—এই দুইজনকে বাহ্যতঃ একরূপ দেখায়। সময় সময় উহাদের সাদৃশ্যহেতু একটিকে অপরটিতে পরিবর্তিত হইতে দেখিয়া আমরা আশ্চর্য হইয়া যাই।

অত্যন্ত দুর্বল-স্নায়ুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ধার্মিক হিসাবে কৃতকার্য হয়। তাহাদের মাথায় কিছু ঢুকিলে ঐ-বিষয়ে তাহারা অত্যধিক উৎসাহী হইয়া উঠে।

জনৈক ঈশ্বর-ভক্তকে উন্মাদ বলিয়া অভিযোগ করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, ‘এ-জগতে সকলেই উন্মাদ—কেহ কাঞ্চনের জন্য, কেহ কামিনীর জন্য এবং কেহ

ঈশ্বরের জন্য। ডুবিয়া মরাই যদি মানুষের অদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে পঙ্কিল জলাশয়ে ডুবিয়া মরা অপেক্ষা দুগ্ধ-সাগরে ডুবিয়া মরাই শ্রেয়ঃ।’

অনন্ত প্রেমময় ঈশ্বর এবং মহৎ ও অনন্ত প্রেমের পাত্রকে নীলবর্ণরূপে চিত্রিত করা হয়। কৃষ্ণের রঙ নীল, সলোমনের৫ প্রেমের ঈশ্বরের রঙও নীল। ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম যে, যাহা কিছু গভীর ও অসীম, তাহাই নীল রঙের সহিত যুক্ত। এক অঞ্জলি জল গ্রহণ কর, উহার কোন রঙ নাই। কিন্তু গভীর বিশাল সমুদ্রের দিকে তাকাও, দেখিবে উহা নীল। তোমার সন্নিহিত যে শূন্যস্থান, উহার কোন বর্ণ নাই, কিন্তু সীমাহীন আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে উহা নীল।

আদর্শবাদী হিন্দুদের মধ্যে যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব ছিল, ইহাই তাহার প্রমাণ। চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের কথাই ধর। হিন্দুর চিত্রকলায় কি দেখিতে পাও? সর্বপ্রকার কিম্ভূতকিমাকার ও অস্বাভাবিক মূর্তি। হিন্দু মন্দিরে কি নজরে পড়ে? ‘চতুর্ভঙ্গ’ নারায়ণ বা ঐ-জাতীয় কোন মূর্তি। কিন্তু কোন ইতালীয় পট অথবা গ্রীসদেশীয় মূর্তি সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখ, ইহাদের মধ্যে প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের কি অপূর্ব প্রকাশ! প্রদীপ হস্তে একটি নারীর চিত্র-অঙ্কনের জন্য হয়তো একজন বিশ বৎসর ধরিয়া নিজ হাতে প্রদীপ জ্বালিয়া বসিয়াছিল।

হিন্দুগণ আত্মসমীক্ষাপ্রসূত বিজ্ঞানসমূহে উন্নতি করিয়াছিলেন। বিভিন্ন-প্রকৃতি মানুষের জন্য বেদে বিভিন্ন ধর্মাচরণের বিধান দেওয়া হইয়াছে। বয়স্ককে যাহা শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা শিশুকে শিক্ষা দেওয়া চলে না।

গুরু হইবেন মানুষের চিকিৎসক। তিনি শিষ্যের প্রকৃতি অবগত হইয়া তাহার পক্ষে যাহা সর্বাপেক্ষা উপযোগী, সেই প্রণালী শিক্ষা দেবেন।

যোগাভ্যাসের অসংখ্য পথ আছে। কোন কোন প্রণালী কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিয়াছে। কিন্তু ঐগুলির মধ্যে সাধারণভাবে সকলের পক্ষে দুইটির গুরুত্ব অধিক—(১) ইন্দ্রিয় ও মনের যাবতীয় প্রত্যয়কে লয় করিয়া চরম সত্যে পৌঁছান, (২) আমিই সব, তুমিই সমগ্র বিশ্ব, এইরূপ চিন্তা করা। দ্বিতীয় পদ্ধতির সাধককে প্রথমটি অপেক্ষা দ্রুততর লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিলেও উহা সর্বাপেক্ষা নিরাপদ

নয়। সাধারণতঃ ঐ প্রণালী-অবলম্বনে মহা বিপদের আশঙ্কা আছে এবং ইহা সাধককে বিপথে পরিচালিত করিয়া উদ্দেশ্য-লাভে বিঘ্ন জন্মায়।

খ্রীষ্টধর্মে ও হিন্দুধর্মে উপদিষ্ট প্রেমের মধ্যে পার্থক্য এই যে, খ্রীষ্টধর্ম প্রতিবেশীকে ভালবাসিতে শিক্ষা দেয়, কারণ আমরা ইচ্ছা করি যে, প্রতিবেশীরাও আমাদিগকে ভালবাসুক। হিন্দুধর্মে প্রতিবেশীদিগকে আত্মবৎ ভালবাসিতে—বস্তুতঃ তাহাদের মধ্যে আমাদের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে বলে।

সচরাচর একটি বেজিকে লম্বা শিকলে বাঁধিয়া কাঁচের আলমারিতে রাখা হয়, যাহাতে সে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারে। আলমারির বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইলেও কোন বিপদের আভাস পাইলেই সে একলাফে কাঁচের আলমারিতে ঢুকিয়া পড়ে। যোগী এই পৃথিবীতে এভাবেই বিচরণ করেন।

সমগ্র বিশ্ব এক অবিচ্ছিন্ন সত্তা; ইহার একপ্রান্তে জড় জগৎ ও অপর প্রান্তে ঈশ্বর—কতকটা এইরূপ ভাব দ্বারা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের নীতি ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

বেদের বহু উক্তি সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব-জ্ঞাপক। দীর্ঘকাল উপাসনার ফলে ঋষিগণ ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন এবং অজ্ঞাত রাজ্যের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া জগৎকে ইহা যাচাই করিতে আহ্বান করিয়াছেন। দাম্ভিক লোকেরাই ঋষি-নির্দেশিত পথ অনুসরণ না করিয়া এবং তাঁহাদের উপদেশ পালন না করিয়া সমালোচনা ও বিরুদ্ধাচরণ করে। এখনও পর্যন্ত এমন কেহ সাহসপূর্বক বলিতে পারে নাই যে, ঋষিদের নির্দেশ যথাযথ পালন করিয়াও তাহার কোন প্রকার অনুভূতি হয় নাই এবং ঋষিগণ মিথ্যাবাদী। এরূপ বহু লোক আছে, যাহারা বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ পরীক্ষার মধ্য দিয়া গিয়া উপলব্ধি করিয়াছে যে, ঈশ্বর তাহাদিগকে ত্যাগ করেন নাই। জগৎ এরূপ যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস যদি আমাদিগকে কোন সান্ত্বনা না দেয়, তবে আত্মহত্যাই শ্রেয়ঃ।

একজন ধার্মিক প্রচারক প্রচারকার্যে বাহিরে গিয়াছিলেন। অকস্মাৎ কলেরায় আক্রান্ত হইয়া তাঁহার তিনটি পুত্র মারা যায়। ঐ ব্যক্তির পত্নী প্রিয় পুত্র তিনটির মৃতদেহ একখণ্ড বস্ত্রে আবৃত করিয়া গৃহের ফটকে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বামী প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি তাঁহাকে ঐ স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘স্বামিন্, আপনার নিকট কেহ কোন দ্রব্য গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন এবং

আপনার অনুপস্থিতিকালে আসিয়া হঠাৎ উহা ফেরৎ লইয়া গিয়াছেন। আপনি কি সেজন্য দুঃখিত হইবেন?' স্বামী উত্তর দিলেন 'নিশ্চয় নয়।' তখন পত্নী তাঁহাকে গৃহের মধ্যে লইয়া গিয়া বস্ত্রখণ্ড সরাইয়া মৃতদেহ তিনটি তাঁহাকে দেখাইলেন। স্বামী শান্তভাবে উহা সহ্য করিয়া শবদেহগুলি যথোচিত সৎকার করিলেন। বিশ্বের যাবতীয় ঘটনার নিয়ন্তা করুণাময় ঈশ্বরের অস্তিত্বে যাঁহাদের বিশ্বাস দৃঢ়, তাঁহারা ঐরূপ মনোবলের অধিকারী হন।

অখণ্ডকে কখনও চিন্তা করা যায় না। সীমাবচ্ছিন্ন না হইলে আমরা কোন বস্তুর ধারণা করিতে পারি না। অনন্ত ঈশ্বরকে সান্তরূপেই ধারণা ও পূজা করা সম্ভব।

জন ব্যাপটিস্ট ছিলেন একজন 'এসীন' (Essene)। উহা এক বৌদ্ধসম্প্রদায়বিশেষ। দুইটি শিবলিঙ্গকে আড়াআড়িভাবে স্থাপন করিলেই উহা খ্রীষ্টধর্মের ক্রুশে পরিণত হয়। প্রাচীন রোমের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনও বৌদ্ধপূজার্চনার চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

দক্ষিণ ভারতে কতকগুলি 'রাগের' বা সুরের প্রচলন আছে। ঐ রাগগুলিকে স্বতন্ত্র মনে করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে প্রধান ষড়্‌রাগ হইতেই ঐগুলির উৎপত্তি। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীতে মূর্চ্ছনা বা শব্দের দোদুল্যমান স্পন্দনের প্রয়োগ খুব কম। সেখানে পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীতযন্ত্রের ব্যবহারও দুর্লভ। দক্ষিণদেশের বীণাযন্ত্র প্রকৃত বীণা নয়। আমাদের সামরিক সঙ্গীত বা সামরিক কবিতা—কোনটাই নাই। ভবভূতি কিয়ৎপরিমাণে বীররসপ্রিয় কবি।

যীশুখ্রীষ্ট ছিলেন সন্ন্যাসী। তাঁহার ধর্ম মূলতঃ কেবল সন্ন্যাসীদের উপযোগী। তাঁহার শিক্ষার সারমর্ম—'ত্যাগ কর'; আর অধিক কিছু নাই। এই শিক্ষা কতিপয় বিশেষ অধিকারীরই উপযোগী।

'অপর গাল ফিরাইয়া দাও'—এই শিক্ষা কার্যতঃ অসম্ভব, অসাধ্য। পাশ্চাত্যগণ ইহা জানে। যাহারা ধর্মলাভের আকাঙ্ক্ষা করে, যাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণত্ব-লাভ, তাহাদের জন্যই ঐ উপদেশ। সাধারণ লোকের ধর্ম হইল—'নিজ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হও।' সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ—সকলের নিকট একই প্রকার নৈতিক উপদেশ প্রচার করা যাইতে পারে না।

সকল সাম্প্রদায়িক ধর্মই ধরিয়া লইয়াছে যে, সব মানুষই সমান। বিজ্ঞান কিন্তু উহা সমর্থন করে না। মানুষের শারীরিক পার্থক্য অপেক্ষা মানসিক পার্থক্য অধিক। হিন্দুধর্মের একটি মূল নীতি হইল প্রত্যেক মানুষই পৃথক্—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। এমন কি, মদ্যপ ও বেশ্যাসক্তের জন্যও হিন্দুধর্মে কিছু মন্ত্রের বিধান রহিয়াছে।

নীতি একটি আপেক্ষিক শব্দ। জগতে বিশুদ্ধ নীতি বলিয়া কোন পদার্থ আছে কি? ঐ ধারণা কুসংস্কার মাত্র। প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক ব্যক্তিকে একই আদর্শের দ্বারা বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই। প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক যুগের প্রতিটি ব্যক্তি বিশেষ অবস্থার অধীন। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবের পরিবর্তনও অপরিহার্য। এক সময়ে গোমাংস-ভক্ষণ নীতিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইত। তখন জলবায়ু শীতল ছিল এবং খাদ্য-শস্যের ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত ছিল না। খাদ্যের মধ্যে মাংসই ছিল প্রধান, সুতরাং সেই যুগে ও সেই সময়ে মাংস একরূপ অপরিহার্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে গোমাংস-ভক্ষণ নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য হয়।

ঈশ্বরই একমাত্র অপরিবর্তনীয়। সমাজ চলমান। জগৎ শব্দের অর্থ যাহা অনবরত চলিতেছে। ঈশ্বর অচল।

আমার কথা হইতেছে—'সংস্কার' নয়, কিন্তু 'অগ্রসর হও—চরৈবেতি।' জগতে উহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ার ফলে আমরা নিজদিগকে বিভিন্ন অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলার মধ্যেই জীবনের সকল রহস্য নিহিত। উহাই জীবন-বিকাশের অন্তর্নিহিত মূল নীতি। বহিঃপ্রকৃতি আমাদিগকে দাবাইয়া রাখিতে চায়, উহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ার ফলে আমরা নিজদিগকে বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী করিয়া তোলার অথবা পরিবেষ্টনীর সহিত খাপ-খাওয়াইয়া চলিবার ক্ষমতা লাভ করি। পরিবর্তিত অবস্থার উপযোগী করিয়া তোলার ক্ষমতা যাহার মধ্যে বেশী, সে-ই দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। আমি এই তত্ত্ব প্রচার না করিলেও সমাজ পরিবর্তিত হইতেছে ও হইবেই। মানুষকে হয় বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, নতুবা অনাহারী থাকিতে হইবে—এই প্রয়োজনই জগতে কার্য করিতেছে, খ্রীষ্টান ধর্ম অথবা বিজ্ঞান নয়।

হিমালয়ের মহোচ্চ শিখরেই জগতের শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কেহ সেখানে কিছুকাল বাস করে, তবে পূর্বে সে যতই অস্থির-চিত্ত থাকুক না কেন, অবশ্যই মানসিক শান্তি লাভ করিবে।

ঈশ্বর যাবতীয় বিশ্ব-বিধানের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। ঈশ্বরের সত্যকে একবার জানিতে পারিলে অন্যান্য সব কিছুকে ইহার অধীন বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। পতনশীল বস্তুগুলির ক্ষেত্রে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-নিয়মের যে স্থান, ধর্মের ক্ষেত্রে ঈশ্বরেরও সেই স্থান।

প্রত্যেক পূজাই উচ্চস্তরের প্রার্থনা। যে-ব্যক্তি ধ্যান অথবা মানস-পূজা করিতে অক্ষম, তাহার পক্ষেই পূজা বা আনুষ্ঠানিক অর্চনার প্রয়োজন। তাহার পক্ষে কোন স্থূল বস্তু প্রয়োজন।

সাহসী ব্যক্তিরাই অকপট হইতে পারে। সিংহের সহিত শৃগালের তুলনা কর।

ঈশ্বর ও প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু ভাল, তাহাকে ভালবাসা শিশুর পক্ষেও সম্ভব। কিন্তু ভয়ঙ্কর ও দুঃখজনক বস্তুকেও ভালবাসিতে হইবে। সন্তান যখন দুঃখ দেয়, তখনও পিতা তাহার প্রতি স্নেহ পোষণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার, তিনি মানবজাতির উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গোপীলীলা প্রেমধর্মের পরাকাষ্ঠা, এই প্রেমে সকল ব্যক্তিত্ব লোপ পায় এবং পরম মিলন ঘটে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ প্রচার করিয়াছেন, 'আমাকে পাইবার জন্য অন্যান্য সকল বন্ধন ত্যাগ কর'—গোপীলীলায় এই তত্ত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভক্তিতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য বৃন্দাবন-লীলার শরণ লও। এ-বিষয়ে বহু সংখ্যক পুস্তক আছে। ভক্তি ভারতবর্ষের সর্বজনীন ধর্ম। হিন্দুজাতির বৃহত্তম অংশ শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্তী।

দরিদ্র, ভিক্ষুক, পাপী, পুত্র, পিতা, পত্নী—শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই ঈশ্বর। আমাদের সর্বপ্রকার মায়িক সম্বন্ধের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ হইয়া তিনি এগুলিকে পবিত্র করেন এবং পরিণামে মুক্তি প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ-ভগবান্ দার্শনিক ও পণ্ডিতের নিকট নিজেকে লুকাইয়া রাখেন, প্রকট হন অজ্ঞ ও শিশুর নিকট। শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাস ও প্রেমের দেবতা—পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। গোপীদিগের নিকট প্রেম ও ঈশ্বর এক বস্তু। তাহারা জানিত শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ।

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ কর্তব্য শিক্ষা দিতেছেন, বৃন্দাবনে প্রেম। তাঁহার বংশধরগণ দুর্বৃত্ত বলিয়া তিনি তাহাদের পরস্পরের বিনাশ নিবারণ করেন নাই।

ঈশ্বর সম্বন্ধে য়াহুদী ও মুসলমানগণের ধারণা যে, তিনি একজন আদালতের বড় বিচারক। আমাদের ঈশ্বর বাহিরে কঠোর, কিন্তু অন্তরে প্রেম ও করুণায় পূর্ণ।

অদ্বৈতবাদ কি, তাহা না বুঝিয়া কেহ কেহ উহার উল্টা অর্থ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ আবার কি? পাপ-পুণ্যের কি প্রভেদ—এগুলি সব মানুষের কুসংস্কার। ফলে তাঁহাদের আচরণে তাঁহারা কোন নৈতিক সংযম পালন করেন না। ইহা নিছক বদমাশি। এই ধরনের প্রচারের দ্বারা প্রভূত অনিষ্ট হয়।

পাপ ও পুণ্য—অনিষ্টকর পাপ ও হিতকর পুণ্য—এই দুই প্রকার কর্মের দ্বারা দেহ গঠিত। শরীরে কণ্টক বিদ্ধ হইলে ঐ কণ্টকটি তুলিয়া ফেলিবার জন্য অপর একটি কণ্টকের প্রয়োজন, পরে দুইটিই ফেলিয়া দিতে হয়। সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত কেহ পুণ্যরূপ কণ্টকের দ্বারা পাপরূপ কণ্টক দূর করেন। ইহার পরও তিনি জীবনধারণ করিতে পারেন এবং শুধু পুণ্য অবশিষ্ট থাকায় তাঁহার দ্বারা পুণ্যকর্মই অনুষ্ঠিত হয়। জীবন্মুক্তের মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র পুণ্য অবশিষ্ট থাকায় তিনি জীবিত থাকেন, কিন্তু তিনি যাহা কিছু করেন, তাহাই শুদ্ধ।

যাহা কিছু উন্নতির দিকে লইয়া যায়, তাহাই পুণ্য; যাহা হইতে আমাদের অবনতি, তাহাই পাপ। মানুষের মধ্যে তিন প্রকার গুণ আছে—পশুত্ব, মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব। যাহা দেবত্বের উৎকর্ষ সাধন করে, তাহাই পুণ্য। যাহা দ্বারা পশুভাব বৃদ্ধি পায়, তাহাই পাপ। পাশব প্রকৃতি নাশ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে—অর্থাৎ প্রেমিক ও দয়ালু হইতে হইবে। এই অবস্থাও অতিক্রম করিয়া তোমাদিগকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইতে হইবে—অগ্নির তেজ অথচ দাহ নাই, অপূর্ব প্রেম অথচ জাগতিক প্রেমের দুর্বলতা নাই, দুঃখবোধ নাই।

ভক্তি দুই প্রকার—বৈধী ও রাগানুগা। শাস্ত্রের অনুশাসনে দৃঢ় বিশ্বাসকে 'বৈধী ভক্তি' বলে। রাগানুগা ভক্তি পাঁচ প্রকার—(১) শান্ত—খ্রীষ্টধর্মে ইহা রূপায়িত হইয়াছে। (২) দাস্য—রামের প্রতি হনুমানের আচরণে উহা পরিস্ফুট। (৩) সখ্য—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের ভাবের মধ্য দিয়া উহা প্রকাশিত। (৪) বাৎসল্য—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বসুদেবাদির যে-ভাব, তাহাই বাৎসল্য। (৫) মধুরভাব—শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের জীবনে মধুরভাবের (পতি-পত্নীর সম্বন্ধ) বিকাশ দেখা যায়।

কেশবচন্দ্র সেন সমাজকে একটি ডিম্বাকার (elliptic) কক্ষে পরিভ্রমণশীল গ্রহের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ঈশ্বর কেন্দ্রগত সূর্য। গ্রহকক্ষের যে-বিন্দুটি সূর্যের নিকটতম, সমাজ কখনও সেই বিন্দুটির মত ঈশ্বরের সমীপবর্তী হয়, আবার কখনও সূর্য হইতে সর্বাপেক্ষা দূরে অবস্থিত বিন্দুটির ন্যায় ঈশ্বর হইতে দূরে সরিয়া যায়। অবতার আসিয়া ইহাকে ঈশ্বরের সমীপবর্তী করেন। পরে আবার ইহা দূরে সরিয়া যায়। কেন ঐরূপ হইবে? বলিতে পারি না। অবতারের প্রয়োজন কি? সৃষ্টির কি প্রয়োজন ছিল? ঈশ্বর কেন আমাদের সকলকে পূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করেন না? ইহাই লীলা, ইহা আমাদের জ্ঞানের অগোচর।

মানুষ ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর হইতে পারে না। যদি কেহ ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার রচিত সৃষ্টি দেখাও। বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি তাঁহার নিজের কল্পনামাত্র। ঐ সৃষ্টিকে বিশ্বামিত্রের নিয়মে চলিতে হইত। যদি যে-কেহ স্রষ্টা হইতে পারেন, তবে বহু নিয়মের সংঘর্ষের ফলে এই জগতের অবসান ঘটিবে। জগতের ভারসাম্য এরূপ সুন্দর যে, যদি একটি পরমাণুরও সাম্যাবস্থা ভঙ্গ কর, তবে সমগ্র জগৎ লয়প্রাপ্ত হইবে।

এমন সব মহাপুরুষ হইয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের সহিত আমাদের বিপুল পার্থক্য কোন গাণিতিক অঙ্ক দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু ঈশ্বরের সহিত তুলনায় তাঁহারাও জ্যামিতিক বিন্দুমাত্র। অনন্তের সহিত তুলনায় সবই অকিঞ্চিৎকর। ঈশ্বরের সহিত তুলনা করিলে বিশ্বামিত্র একটি ক্ষুদ্র মনুষ্য-পতঙ্গ ব্যতীত আর কি?

আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় ক্ষেত্রে ক্রমবিকাশ-নীতির আদি প্রবর্তক হইলেন পতঞ্জলি।

জীব সাধারণতঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থা অপেক্ষা দুর্বল, নিজেকে ঐ অবস্থার উপযোগী করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। কখনও কখনও তাহার ঐ উপযুক্ততা লাভের প্রচেষ্টা প্রয়োজনকে ছাড়াইয়া যায়। উহার ফলে তাহার সমগ্র শরীরের জাত্যন্তর ঘটে। নন্দী একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পবিত্রতা এত বেশী হইয়াছিল যে, মানব-শরীরের পক্ষে উহা ধারণ করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং তাহার দেহকোষস্থিত পরমাণুগুলি দেব-দেহে পরিণত হইয়াছিল।

প্রতিযোগিতারূপ ভয়ঙ্কর যন্ত্রই সবকিছুকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। যদি বাঁচিয়া থাকিতে চাও তো নিজেকে যুগোপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা কর। আমরা যদি আদৌ বাঁচিয়া থাকিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে বিজ্ঞাননিষ্ঠ জাতিতে পরিণত হইতে হইবে। মানসিক শক্তিই প্রকৃত বল। ইওরোপীয়দিগের সংগঠন-ক্ষমতা তোমাদের শিক্ষা করা আবশ্যক। তোমাদের নিজেদের শিক্ষিত হওয়া এবং মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। বাল্যবিবাহ প্রথা রহিত করিতেই হইবে।

এই-সকল চিন্তা সমাজে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তোমরা সকলেই ইহা জান, কিন্তু তোমরা কেহই ইহা কার্যে পরিণত করিতে সাহস কর না। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবে কে? উপযুক্ত সময়ে এক অদ্‌ভুত মহাপুরুষের আগমন হইবে। তখন সকল ইঁদুরই সাহস লাভ করিবে।

যখনই কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, তখন সমুদয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁহার জন্য প্রস্তুত থাকে। তিনি যেন উটের পিঠের শেষ তৃণখণ্ডের মত। তিনি যেন কামানের গোলার স্‌ফুলিঙ্গ। তাঁহার কথায় কিছু একটা আছে—আমরা তাঁহার জন্য পথ প্রস্তুত করিতেছি।

কৃষ্ণ কি চতুর ছিলেন? না, চতুর ছিলেন না। যুদ্ধ নিবারণ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। দুর্যোধনই যুদ্ধ বাধাইয়াছিল। কিন্তু একবার কার্যে প্রবৃত্ত হইলে উহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত নয়—কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির ইহাই ধর্ম। পশ্চাৎপদ হইও না, উহা কাপুরুষতার পরিচায়ক। একবার কার্যে প্রবৃত্ত হইলে উহা অবশ্যই সম্পন্ন করিতে হইবে, এক ইঞ্চিও আর নড়া উচিত নয়—অবশ্য ইহা কোন অন্যায় কার্যের জন্য নয়। এই যুদ্ধ ছিল ধর্মযুদ্ধ।

শয়তান নানা ছদ্মবেশে আসে—ক্রোধ ন্যায়ের বেশে, কামনা কর্তব্যের রূপ লইয়া। শয়তানের প্রথম আবির্ভাব লোকে জানিতে পারিলেও পরে ভুলিয়া যায়। যেমন উকিলের বিবেকবুদ্ধি—প্রথমে তাহারা বেশ বুঝিতে পারে যে, সমস্তই দুষ্টামি (বদমাশি)—তারপর মক্কেলের প্রতি তাহাদের কর্তব্যবুদ্ধি আসে। অবশেষে তাহারা কঠোর হয়।

যোগিগণ নর্মদার তীরে বাস করেন, সেখানকার জলবায়ু সমভাবাপন্ন বলিয়া তাঁহাদের বাসের পক্ষে উত্তম। ভক্তগণ অবস্থান করেন বৃন্দাবনে।

সিপাহীরা শীঘ্র মারা যায়; প্রকৃতি ত্রুটিপূর্ণ; মল্লবীরগণের শীঘ্র শীঘ্র মৃত্যু ঘটে। ভদ্রশ্রেণী সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী, আর দরিদ্রেরা সবচেয়ে কষ্টসহিষ্ণু। কোষ্ঠবদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে ফলাহারই উপযুক্ত হইতে পারে। মস্তিষ্কের কাজ করিতে হয় বলিয়া সভ্য মানুষের বিশ্রাম প্রয়োজন এবং খাদ্যের সহিত তাহাকে মশলা ও চাটনি গ্রহণ করিতে হয়। অসভ্য লোকেরা প্রতিদিন চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল হাঁটে, সাদাসিধা খাদ্যই তাহাদের রুচিকর। আমাদের ফলগুলি সবই কৃত্রিম এবং স্বাভাবিক আম অতি সামান্য ফল। গমও কৃত্রিম।

ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া দেহে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয় কর।

গৃহস্থের আয় অনুযায়ী ব্যয় করিবার নিয়ম আছে। সে আয়ের এক চতুর্থাংশ পরিবারবর্গের ভরণপোষণ, এক চতুর্থাংশ দানকার্যে, এক চতুর্থাংশ নিজের জন্য ব্যয় করিবে এবং এক চতুর্থাংশ সঞ্চয় করিবে।

বহুত্বে একত্ব, সমষ্টিতে ব্যষ্টি—ইহাই সৃষ্টির রীতি।

শুধু কারণকে অস্বীকার করিতেছ কেন? কার্যকেও অস্বীকার কর। কার্যের মধ্যে যাহা কিছু আছে, তাহা সবই কারণের মধ্যে রহিয়াছে।

খ্রীষ্টের জীবন মাত্র আঠার মাস সাধারণের নিকট প্রকাশিত ছিল। ইহার জন্য তিনি বত্রিশ বৎসর ধরিয়া নীরবে নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সর্বসাধারণের সংস্পর্শে আসিবার পূর্বে মহম্মদের চল্লিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছিল।

ইহা সত্য যে, স্বাভাবিক অবস্থায় জাতি-প্রথা আবশ্যক হয়। যাহাদের কোন বিশেষ কার্যের প্রবণতা আছে, তাহারা একশ্রেণীভুক্ত হয়। কিন্তু কোন বিশেষ ব্যক্তির শ্রেণী নির্ণয় করিবে কে? কোন ব্রাহ্মণ যদি মনে করেন, অধ্যাত্মবিদ্যাচর্চায় তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা আছে, তাহা হইলে প্রকাশ্যভাবে শূদ্রের সহিত মিলিত হইতে তিনি ভয় পান কেন? কোন বলবান্ অশ্ব কি নিস্তেজ অশ্বের সহিত দৌড়ের প্রতিযোগিতা করিতে ভয় পায়?

‘কৃষ্ণ–কর্ণামৃতের’ রচয়িতা ভক্ত বিল্বমঙ্গলের জীবনী উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি নিজের দুইটি চোখ উৎপাটন করিয়াছিলেন। বিপথগামী ভালবাসাও যে পরিণামে প্রকৃত প্রেমে পরিণত হইতে পারে তাঁহার জীবন উহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অত্যন্ত আগে ধর্মের ক্ষেত্রে উন্নতি এবং সর্ববিষয়ে সূক্ষ্মদৃষ্টি—এই দুইটির জন্য হিন্দুগণ সর্বদা উচ্চতর তত্ত্ব লইয়া ব্যাপৃত থাকিতেন। ইহার ফলে তাঁহারা ঐহিক বিষয়ে বর্তমান অবস্থায় পতিত হইয়াছেন। হিন্দুগণকে পাশ্চাত্যের নিকট কিঞ্চিৎ বস্তুতন্ত্রবাদ শিক্ষা করিতে হইবে এবং ইহার পরিবর্তে পাশ্চাত্যকে কিছু আধ্যাত্মিকতা শিখাইতে হইবে।

তোমাদের নারীগণকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও। তারপর তাহারাই বলিবে, কোন্ জাতীয় সংস্কার তাহাদের পক্ষে আবশ্যক। তাহাদের সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে কথা বলিবার তোমরা পুরুষরা কে?

ভাঙ্গী ও পারিয়াগণের বর্তমান অধঃপতিত অবস্থার জন্য দায়ী কাহারা? আমাদের হৃদয়হীন ব্যবহার ও সেই সঙ্গে অদ্ভুত অদ্বৈতবাদ-প্রচার—ইহা কি আঘাতের উপর অপমান নয়?

এই জগতে সাকার ও নিরাকার পরস্পর সম্বদ্ধ। নিরাকারকে সাকারের মধ্য দিয়াই প্রকাশ করা যাইতে পারে, আবার নিরাকারের পটভূমিতেই সাকারকে চিন্তা করা যাইতে পারে। আমাদের চিন্তারই বাহ্যরূপ জগৎ। প্রতিমা ধর্মেরই অভিব্যক্তি।

ঈশ্বরে যাবতীয় জীবপ্রকৃতি বিদ্যমান। কিন্তু মানুষ আমরা কেবল মানব-প্রকৃতির মধ্য দিয়াই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি। যেমন পিতা বা পুত্ররূপে আমরা মানুষকে ভালবাসি, তেমনি ঈশ্বরকে ভালবাসিতে পারি। নর ও নারীর মধ্যে যে প্রেম, তাহাই প্রবলতম প্রেম, উহাও আবার যত গোপনীয় হইবে ততই দৃঢ়তর হইবে। এই প্রেম শ্রীভগবানের প্রতি কিভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মধ্য দিয়াই ব্যক্ত হইয়াছে।

মানুষ পাপী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে—এ-কথা বেদে কোথাও কোথাও নাই। মানুষকে পাপী বলা মনুষ্যত্বের ঘোরতর অমর্যাদা করা।

সত্যকে সামনাসামনি প্রত্যক্ষ করার অবস্থা লাভ করা সহজ নয়। সেদিন সমগ্র চিত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত বিড়ালটিকে কেহ খুঁজিয়া পায় নাই, যদিও চিত্রের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়াই বিড়ালটি ছিল।

কাহাকেও আঘাত করিয়া তুমি স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে পার না। সৃষ্টি এক অদ্‌ভুত যন্ত্র। ঈশ্বরের প্রতিশোধ হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় নাই।

কাম অন্ধ, মানুষকে নরকে লইয়া যায়। ভালবাসাই প্রেম, ইহা স্বর্গে লইয়া যায়।

কৃষ্ণ-রাধার প্রেমে কামের লেশ নাই। রাধা কৃষ্ণকে বলেন, ‘তুমি যদি আমার বুকে পদা স্থাপন কর, তাহা হইলে আমার সকল কাম দূরীভূত হইবে।’ ভগবানের প্রতি অনুরাগ হইলে কাম চলিয়া যায়, তখন থাকে শুধু প্রেম।

জনৈক কবি এক রজকিনীকে ভালবাসিতেন। স্ত্রীলোকটির পায়ে গরম ডাল পড়িয়াছিল, তাহার ফলে কবির চরণ পুড়িয়া যায়।

শিব ঈশ্বরের সুশান্ত প্রকাশ, কৃষ্ণে প্রকাশ ঈশ্বরের মাধুর্য। প্রেম ঘনীভূত হইয়া নীলরঙে পরিণত হয়। নীলরঙ প্রগাঢ় প্রেমের দ্যোতক। সলোমন ‘কৃষ্ণ’কে দর্শন করিয়াছিলেন। এখানে (ভারতে) অনেকেই কৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছে।

এখনও হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেম জাগিলে রাধাকে দর্শন করা যায়। রাধা হইয়া যাও এবং মুক্ত হও। নান্যঃ পন্থাঃ। খ্রীষ্টানেরা সলোমনের সঙ্গীতের মর্মগ্রহণ করিতে পারে না। তাহাদের মতে—ইহা চার্চের প্রতি খ্রীষ্টের গভীর অনুরাগের প্রতীক—ভবিষ্যদ্বাণী। তাহাদের নিকট ঐ সঙ্গীত অর্থহীন এবং সেজন্য উহার সম্পর্কে কোন কাহিনী সৃষ্টি করে।

হিন্দুগণ বুদ্ধকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। ঈশ্বরের প্রতি তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ভগবান্ আছেন কি নাই, বৌদ্ধেরা তাহা জানিবার চেষ্টা করে না। কশাঘাত করিয়া আমাদিগকে কর্মে তৎপর করিবার জন্যই বুদ্ধের আবির্ভাব। সৎ হও, রিপুগুলি দমন

কর। তখন নিজেই জানিতে পারিবে, দ্বৈত বা অদ্বৈত দর্শনের কোন্‌টি সত্য—তত্ত্ব এক বা বহু। বুদ্ধ হিন্দুধর্মের একজন সংস্কারক ছিলেন।

একই ব্যক্তির মধ্যে মাতা দেখেন সন্তানকে, আবার পত্নী দেখেন অন্যভাবে। ইহার ফলও বিভিন্ন। মন্দ ব্যক্তি ঈশ্বরের মধ্যে দেখে মন্দ, ধার্মিক তাঁহার মধ্যে দেখেন পুণ্য। ঈশ্বরকে সকল রূপেই চিন্তা করা যায়। প্রত্যেকের ভাব অনুযায়ী তিনি রূপ পরিগ্রহ করেন। বিভিন্ন পাত্রে জল বিভিন্ন আকার ধারণ করে, কিন্তু সকল পাত্রেই জল আছে। অতএব সকল ধর্মই সত্য।

ঈশ্বর নিষ্ঠুর, আবার নিষ্ঠুর নন। তিনি সর্বভূতে আছেন আবার নাই। অতএব তিনি পরস্পরবিরুদ্ধ-ভাবময়। প্রকৃতিও পরস্পর-বিরোধী ভাবরাশি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

১৭. ভাবী সভ্যতার দিঙ্‌নির্ণয়

শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞানই আমাদের দুঃখরাশির আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিতে পারে। অন্য যে-কোন জ্ঞান কিছু সময়ের জন্য মাত্র আমাদের অভাব মিটাইতে পারে। আত্মজ্ঞানের উন্মেষ হইলেই অভাববোধ চিরতরে বিদূরিত হয়।

দৈহিক শক্তির বিকাশ অবশ্যই বড় কথা; বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধী যন্ত্রসমূহের মধ্য দিয়া মনীষার যে অভিব্যক্তি দেখা যায়, তাহাও অদ্‌ভুত বটে; তবুও আত্মিক শক্তি জগতের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহার তুলনায় এই সব শক্তি নগণ্য।

যন্ত্র কখনও মানুষকে সুখী করিতে পারে নাই, কখনও পারিবে না। যাহারা যন্ত্রসভ্যতার মাহাত্ম্য প্রচার করে, তাহাদের মতে যন্ত্রের মধ্যেই সুখ নিহিত। বাস্তবিকপক্ষে সুখের উদ্ভব ও স্থিতি মনেই। মন যাহার বশে, সে-ই কেবল সুখী, অপর কেহ নয়। সমগ্র পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করিবার শক্তিও যদি পাও, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি পরমাণুকে যদি করতলগত করিতে পার, তাহাতেই বা তোমার কি লাভ? বস্তুতঃ প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্যই মানুষের জন্ম; পাশ্চাত্য জনগণ 'প্রকৃতি' বলিতে স্থূল অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতিকেই বুঝিয়া থাকে। অশেষ শক্তির আধার নদী, পর্বত, সাগর প্রভৃতি অসংখ্য বৈচিত্র্যের সমাবেশে এই বহিঃপ্রকৃতি সত্যই বিরাট! কিন্তু ইহা অপেক্ষাও এক

মহত্তর প্রকৃতি—মানুষের অন্তর্জগৎ। এই অন্তর্জগতের সমীক্ষাতেই প্রাচ্যপ্রতিভা সম্যক বিকশিত হইয়াছে, যেমন বহির্জগতের ক্ষেত্রে প্রতীচ্য প্রতিভা।

পাশ্চাত্য দেশে ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য জগৎ যেমন সত্য, প্রাচ্যে অতীন্দ্রিয় জগৎ সেইরূপ। মানব জাতির অগ্রগতির জন্য পাশ্চাত্য আদর্শের প্রয়োজন রহিয়াছে; বোধহয় সে প্রয়োজন আরও বেশী।

পার্থিব ক্ষমতায় শক্তিশালী জাতিগুলি মনে করে যে, ঐ শক্তিই একমাত্র কাম্য, উহাই প্রগতি ও সংস্কৃতি; যাহাদের বিত্ত-লালসা নাই, ঐহিক প্রতাপ নাই—তাহারা বাঁচিয়া থাকিবার অযোগ্য। পক্ষান্তরে অন্য কোন জাতি মনে করিতে পারে—নিছক জড়বাদী সভ্যতা একান্ত নিরর্থক! প্রত্যেকটিরই নিজস্ব গুরুত্ব ও মহিমা আছে। এই দুইটি আদর্শের মিলন ও সামঞ্জস্যই হইবে বর্তমানকালের মীমাংসা।

১৮. পত্রালাপে প্রশ্নোত্তর

[ভগিনী নিবেদিতার কয়েকটি প্রশ্ন ও স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত উত্তরঃ ১৯০০ খ্রীঃ ২৪ মে, সান্ ফ্রান্সিস্কো]

প্রশ্ন—পৃথ্বীরায় ও চাঁদ যখন কান্যকুব্জে স্বয়ম্বরে যেতে মনঃস্থ করেন, তখন তাঁরা কাদের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন—তা মনে করতে পারছি না।

উত্তর—উভয়েই চারণের বেশে গিয়াছিলেন।

প্র—পৃথ্বীরায় যে সংযুক্তাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, তা কি এই জন্য যে, সংযুক্তা ছিলেন অসামান্যা রূপসী এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর দুহিতা? সংযুক্তার পরিচারিকা হবার জন্য তিনি কি নিজের একজন দাসীকে শিখিয়ে পাঠিয়েছিলেন এবং এই বৃদ্ধা ধাত্রীই কি রাজকুমারীর মনে পৃথ্বীরায়ের প্রতি ভালবাসার বীজ অঙ্কুরিত করেছিল?

উ—পরস্পরের রূপগুণের বর্ণনা শুনে ও আলেখ্য দেখে তাঁরা একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আলেখ্য-দর্শনে নায়ক-নায়িকার মনে পূর্বরাগের সঞ্চার ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন রীতি।

প্র—কৃষ্ণ যে গোপবালকদের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছিলেন, তার কারণ কি?

উ—এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, কৃষ্ণ কংসকে সিংহাসনচ্যুত করবেন। পাছে জন্মের পর কৃষ্ণ কোথাও গোপনে লালিত পালিত হন, সেই ভয়ে দুরাচার কংস কৃষ্ণের পিতামাতাকে (যদিও তাঁরা ছিলেন কংসের ভগ্নী ও ভগ্নীপতি) কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল এবং এই আদেশ দিয়েছিল যে, সেই বৎসরে রাজ্যের মধ্যে যত বালক জন্মাবে, সকলকেই হত্যা করা হবে। অত্যাচারী কংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই কৃষ্ণের পিতা কৃষ্ণকে গোপনে নদী পার করেছিলেন।

প্র—তাঁর জীবনের এ অধ্যায় কিভাবে শেষ হয়?

উ—অত্যাচারী কংসের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে তিনি নিজে ভাই বলদেব ও পালক-পিতা নন্দের সঙ্গে রাজসভায় যান। অত্যাচারী তাঁকে বধ করবার ষড়যন্ত্র করেছিল। তিনি অত্যাচারীকে বধ করলেন, কিন্তু নিজে রাজ্য অধিকার না করে কংসের নিকটতম উত্তরাধিকারীকে সিংহাসনে বসালেন। কর্মের ফল তিনি নিজে কখনও ভোগ করতেন না।

প্র—এই সময়কার কোন চমকপ্রদ ঘটনার কথা বলতে পারেন কি?

উ—কৃষ্ণের এই সময়কার জীবন অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। শৈশবে তিনি বড়ই দুরন্ত ছিলেন। দুষ্টামির জন্য তাঁর গোপিনী মাতা একদিন তাঁকে মন্থনরজ্জু দিয়ে বাঁধতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সমস্ত রজ্জু একত্র জুড়েও তার দ্বারা তিনি তাঁকে বাঁধতে পারলেন না। তখন তাঁর চোখ খুলে গেল, আর তিনি দেখলেন যে, যাঁকে তিনি বাঁধতে যাচ্ছেন, তাঁর দেহে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অধিষ্ঠিত। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তিনি ভগবানের স্তুতি আরম্ভ করলেন। ভগবান্ তখন তাঁকে আবার মায়া দ্বারা আবৃত করলেন; আর তিনি শুধু বালকটিকেই দেখতে পেলেন।

পরব্রহ্ম যে গোপবালক হয়েছেন, এ-কথা দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার বিশ্বাস হল না। তাই পরীক্ষা করবার জন্য একদা তিনি ধেনুগুলি ও গোপবালকদিগকে চুরি করে এক গুহার মধ্যে ঘুমপাড়িয়ে রেখে দিলেন। কিন্তু ফিরে এসে দেখেন যে, সেই-সব ধেনু ও বালক কৃষ্ণকে ঘিরে বিরাজ করছে! তিনি আবার সেই নতুন দলকে চুরি করলেন এবং

লুকিয়ে রাখলেন। কিন্তু ফিরে এসে দেখেন, তারা যেমন ছিল, তেমনি সেখানেই রয়েছে। তখন তাঁর জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হল, তিনি দেখতে পেলেন—অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং সহস্র সহস্র ব্রহ্মা কৃষ্ণের দেহে বিরাজমান।

কালীয় নাগ যমুনায় জল বিষাক্ত করছিল বলে তিনি ফণার উপর নৃত্য করছিলেন। ইন্দ্রের পূজা তিনি বারণ করাতে ইন্দ্র কুপিত হয়ে এরূপ প্রবলবেগে বারিবর্ষণ আরম্ভ করলেন যেন সমস্ত ব্রজবাসী বন্যার জলে ডুবে মরে, তখন কৃষ্ণ গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন। কৃষ্ণ একটিমাত্র অঙ্গুলি দ্বারা গোবর্ধন পর্বতকে ছাতার মত ঊর্ধ্বে তুলে ধরলেন, আর তার নীচে ব্রজবাসিগণ আশ্রয় গ্রহণ করল।

শৈশব থেকেই তিনি নাগপূজা ও ইন্দ্রপূজার বিরোধী ছিলেন। ইন্দ্রপূজা একটি বৈদিক অনুষ্ঠান। গীতার সর্বত্র ইহা স্পষ্ট যে, তিনি বৈদিক যাগযজ্ঞের পক্ষপাতী ছিলেন না।

জীবনের এই সময়েই তিনি গোপীদের সঙ্গে লীলা করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স পনর বৎসর।

১৯. একটি অপরূপ পত্রালাপ

[এই পত্রালাপটি যথাযথভাবে উপভোগ করিতে হইলে পাঠকদের জানিতে হইবে, কোন্ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এই পত্রালাপ শুরু হয় এবং পত্র ব্যবহারকারীদের মধ্যে কী সম্বন্ধ ছিল। প্রথম পত্রের গোড়ার দিকে স্বামীজী লিখিয়াছেন, তিনি জোড় আঘাত দিয়াছেন। সেটা আর কিছু নয়, নিজ আচরণের সমর্থনে ১৮৯৫ খ্রীঃ ১ ফেব্রুয়ারী একটি অত্যন্ত কড়া চিঠি তিনি পত্রোদ্দিষ্টাকে লিখিয়াছিলেন। সেই অপূর্ব পত্রটিতে স্বামীজীর সন্ন্যাসী-সত্তা অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই কবিতাকার পত্রগুচ্ছ পড়িবার পূর্বে সেই পত্রটি পড়া প্রয়োজন। পত্রোদ্দিষ্টা মেরী হেল মিঃ ও মিসেস হেলের (স্বামীজী যাঁহাদের ফাদার পোপ ও মাদার চার্চ বলিতেন) দুই কন্যার একজন। ঐ দুই হেল-ভগিনী এবং তাঁহাদের সম্পর্কিত আরও দুই ভগিনীকে স্বামীজী নিজের ভগিনীর মত দেখিতেন, এবং তাঁহারাও স্বামীজীকে পরম শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামীজীর কয়েকটি মূল্যবান্ চিঠি এই ভগিনীদের উদ্দেশে লেখা।

বর্তমান পত্রালাপে স্বামীজীকে এক নূতন আলোকে দেখা যায়—রঙ্গপ্রিয় অথচ একান্ত গম্ভীর পরিহাসের মধ্যেও তাঁহার জীবনের মূলভিত্তি ব্রহ্মজ্ঞান ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পত্রালাপের প্রথম চিঠিটি নিউ ইয়র্ক হইতে ১৮৯৫ খ্রীঃ ১৫ ফেব্রুয়ারী লেখা। সম্পাদক]

শোন আমার বোনটি মেরী,
হয়ো না দুখী—যদিও ভারী
ঘা খেয়েছ, তবুও জান
জান বলেই বলিয়ে নাও—
আমি তোমায় ভালবাসি
সারাটা এই হৃদয় দিয়ে।

বলতে পারি বাজি রেখে—
সেই শিশুরা বন্ধু আমার
রইবে চির দুঃখে সুখে,
আমিও তাদের বন্ধু তেমন,
জান তুমি মেরী-শিশু
ভালভাবেই জান তাহা।

*সর্প যদি পদাহত ধরে তার ফণা,
অগ্নি যদি সমুদ্যত—শিখা লক্‌লক্‌,
প্রতিধ্বনি ঘুরে ফিরে রিক্ত মরুভূমে
দীর্ণবক্ষ সিংহ যবে গর্জে ঘোর রোষে।

বিদ্যুতের বাণবিদ্ধ মহামেঘরাশি
বন্যাশক্তি উন্মোচন করে বজ্রস্বরে,
সেইমত মহাপ্রাণ মুক্ত মহাদানে
আত্মা যবে আলোড়িত সত্তার গভীরে।

ম্লান হোক আঁখি-তারা, প্রাণ হোক ক্ষীণ,
বন্ধু নাই, প্রেম হোক অবিশ্বাসে লীন,

ভয়ঙ্কর ভাগ্য যদি হানে মৃত্যুভয়,
ঘনীভূত অন্ধকারে রুদ্ধ যদি পথ,

প্রকৃতি বিরূপ যদি ভ্রুকুটি-কুটিল
তব ধ্বংস চায় তবু জেন—তুমি সেই।
তুমি দিব্য, ধাও ধাও, সম্মুখেতে শুধু,
ধাও নিজ লক্ষ্য পানে নিত্যগতি ধরি।

দেব নহি, আমি নহি পশু কিম্বা নর,
দেহ নহি, মন নহি, নারী বা পুরুষ,
শাস্ত্র স্তব্ধ সবিস্ময়ে আমা পানে চাহি,
আমার প্রকৃতি ঘোষে—'আমি সেই' বাণী।

সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রের জন্মিবার আগে
ছিনু আমি, যবে নাহি ছিল পৃথ্বী ব্যোম্,
নাহি ছিল মহাকাল, 'সেও' নাহি ছিল,
ছিলাম, রয়েছি আমি, রব চিরকাল।

এ পৃথিবী অপরূপা, এ সূর্য মহান্
চন্দ্রমা মধুর এত, তারকা আকাশ—
কার্য-কারণেতে বাঁধা সৃষ্টি সকরুণ
বন্ধনে জীবন তার, বন্ধনে মরণ।

মন তার মায়াময় জাল ছুঁড়ে দেয়,
বেঁধে ফেলে একেবারে নির্মম নিষ্পেষে;
পৃথিবী, নরক, স্বর্গ—ভাল ও মন্দের
চিন্তা আর ভাবনার ছাঁচ গড়ে ওঠে।

জেন কিন্তু—এ সকলই ফেনপুঞ্জবৎ
স্থান কাল পাত্র আর কার্য ও কারণ,
আমি কিন্তু ঊর্ধ্বচারী ইন্দ্রিয় মনের
নিত্য দ্রষ্টা সাক্ষী আমি এই সৃষ্টি মাঝে।

দুই নয়, বহু নয়, এক—শুধু এক,
তাইতো আমার মাঝে আছে সব ‘আমি’,
অনিবার তাই প্রেম,—ঘৃণা অসম্ভব;
‘আমি’ হতে আমারে কি সরান সম্ভব?

স্বপ্ন হতে জেগে ওঠ, বন্ধ কর নাশ
হও অভী, বল বীরঃ নিজ দেহ-ছায়া
ভীত আর নাহি করে, ওগো মৃত্যুঞ্জয়
আমি ব্রহ্ম, এই চির সত্য জ্যোতির্ময়।*৬

আমার কবিতা এই পর্যন্ত। আশা করি তোমরা সকলে কুশলে আছ। মাদার চার্চ এবং ফাদার পোপকে ভালবাসা জানিও। আমি এত ব্যস্ত যে মরবার সময় নেই, এক ছত্র লেখবার পর্যন্ত সময় নেই। অতএব ভবিষ্যতে যদি লিখতে দেরী হয় ক্ষমা কর।

তোমাদের চিরকালের
বিবেকানন্দ

মিস্ মেরী হেল উত্তরে লিখে পাঠালেনঃ

‘কবি হব আমি’ এই সাধনায়
সন্ন্যাসী মহাবীর
সুর ভেঁজে যান প্রাণ পণ রেখে,
নিতান্ত গম্ভীর।

ভাবে ও বচনে অজেয় যে তিনি
সন্দেহ কিছু নাই,
গোল এক শুধু ছন্দ নিয়েই
কেমন যে সামলাই!

কোন ছত্রটি অতি দীর্ঘ যে
কোনটি অতীব হ্রস্ব,

রূপ মেলে নাকো ভাবের সহিত—
কবিতা হয় না অবশ্য।

মহাকাব্য না গীতিকাব্য সে
কিম্বা চৌদ্দপদী?
সেই ভাবনায় খেটে খেটে হায়
হল অজীর্ণব্যাধি।

যতদিন থাকে ঐ কবি-ব্যাধি
অরুচি খাদ্যে তাঁর,
সে খাদ্য যদি নিরামিষ হয়,
লিয়ন৭ রাঁধুনী যার।

তবুও চলে না, চলিতে পারে না;
স্বামীজী ব্যস্ত অদ্য,
সযতনে রাঁধা খানা পড়ে থাক,
লিখিছেন তিনি পদ্য।

একদিন তিনি সুখাসীন হয়ে
একান্ত ভাবমগ্ন,
সহসা আলোক আসিয়া তাঁহার
চারিপাশে হল লগ্ন।

‘শান্ত ক্ষুদ্র কণ্ঠ’ একটি
নাড়া দিল ভাব তাঁর
শব্দ জ্বলিতে লাগিল যেমন
জ্বলন্ত অঙ্গার।

সত্যই তারা অঙ্গার যেন
আমার উপরে হায়
বর্ষিত হল, অনুতাপে মরি,
বোনটি যে ক্ষমা চায়।

ভর্ৎসনা-ভরা পত্রের তরে
দুঃখের সীমা নাই,
বারবার বলি, ক্ষমা চাই আমি
চাই, চাই, ক্ষমা চাই!

যে-কটি ছত্র পাঠায়েছ তুমি,
তোমার ভগিনীগণ
নিশ্চয় জেন স্মরণে রাখিবে
বাঁচিবে যতক্ষণ।

কারণ তাদের দেখায়ে দিয়েছ
অতীব পরিষ্কার—
'যাহা কিছু আছে, সব কিছু তিনি'
ইহাই সত্য সার।

উত্তরে স্বামীজী লিখলেনঃ

সেই পুরাকালে
গঙ্গার কূলে—করে রামায়ণ গান
বৃদ্ধ কথক বুঝায়ে চলেন
দেবতারা সব—কেমনে আসেন যান
অতি চুপে চুপে
সীতারাম-রূপে
আর, নিরীহ সীতার—চোখের জলেতে বান!

কথা হল শেষ
শ্রোতারা সকলে ঘরে ফিরে চলে
পথে যেতে যেতে মনের মাঝেতে
ভাসিছে কথার রেশ।

তখন জনতা হতে

একটি ব্যাকুল উচ্চ কণ্ঠ লাগিল জিজ্ঞাসিতে—
'ঐ যে সীতারাম
কিছুই না বুঝিলাম,
কারা ওঁরা তাই বলে দিন আজ, যদি বুঝি কোন মতে।'

তাই মেরী হেল, তোমাকেও বলি—
আমার শেখান তত্ত্ব না বুঝে, সকলি করিলে মাটি!
আমি তো কখনও বলিনি কাকেও—
'সব ভগবান্'—অর্থবিহীন অদ্‌ভুত কথাটি!
এটুকু বলেছি মনে রেখে দিও
ঈশ্বরই 'সৎ', বাকী যা অসৎ—একেবারে কিছু নয়।
পৃথিবী স্বপ্ন, যদিও সত্য বলে তা মানতে হয়!

একটি মাত্র সত্য বুঝেছি জীবন্ত ভগবান্
যথার্থ 'আমি'— তিনি ছাড়া কিছু নয়!
পরিণামশীল এ জড়জগৎ আমি নয়, আমি নয়।
তোমরা সকলে জানিও আমার ভালবাসা অফুরান।

বিবেকানন্দ

মিস্ মেরী হেল লিখলেনঃ

বুঝতে পেরেছি অতি সহজেই
তফাতটা কোথা রইল—
তৈল-আধার পাত্রের সাথে
পাত্র-আধার তৈল!
সে তো সোজা অতি—সোজা প্রস্তাব
একটি প্রত্যবায়—
প্রাচ্য যুক্তি বুঝতে সাধ্য
শক্তি নাইকো হায়!
যদি 'ভগবান্ কেবল সত্য

মিথ্যা যা কিছু আর,'
যদি 'পৃথিবীটা স্বপ্ন' তা হলে
রইল কি বাকী আর

ভগবান্ ছাড়া? তাইতো শুধাই
তুমি যে বলেছ দাদা,
'বহু দেখে যারা তাদের মরণ',
এবং বলেছ সাদা—
'একের তত্ত্ব যাহারা বুঝেছে,
মুক্তি তাদের স্থির'—
তবুও আমার সামান্য কথা
বলিতেছি অতি ধীরঃ
সব কিছু তিনি, এই কথা ছাড়া
আর কিছু নাহি জানি,
আমি যদি থাকি, তাঁহার ভিতরে
আমারও ভিতরে তিনি।

স্বামীজী উত্তরে লিখলেনঃ

মেজাজটা খর, বালা অপূর্ব,
প্রকৃতির কিবা খেয়াল মরি!
সুন্দরী নারী, সন্দেহ নেই,
দুর্লভ-আত্মা কুমারী মেরী।

গভীর আবেগে ঠেলেঠুলে ওঠে
চাপা দিতে তার সাধ্য নাই,
দেখতেই পাই মুক্ত সত্তা
আগ্নেয় তার স্বভাবটাই।

গানে বাজে তার রাসভ-রাগিণী,
পিয়ানোতে বাজে মধুর রেশ!

ঠাণ্ডা হৃদয়ে সাড়া যে পায় না
মনেতে যাদের বরের বেশ!

শুনেছি ভগিনী তাদের মুখেতে
তোমার রূপের প্রভাব ঘোর!
সাবধানে থেক, নুয়োনা, প'রোনা
যত মধুর হোক—শিকল ডোর।

শীঘ্র শুনিবে আর এক সুর
চাঁদে-পাওয়া সেই তোমার সাথী;
তার সাধে বাদ তোমার কথায়,
নিবে যাবে তার জীবন-ভাতি।

এ-কটি পঙ্‌ক্তি ভগিনী মেরী,
প্রত্যুপহার গ্রহণ কর।
'যেমন কর্ম তেমনি তো ফল'—
সন্ন্যাসী জেন জবাবে দড়।

২০. ইতিহাসের প্রতিশোধ

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অগষ্ট মাসের শেষের দিকে বিবেকানন্দ অধ্যাপক জে. এইচ রাইটের এনিস্কোয়াম গ্রামের বাড়ীতে ছিলেন। নিউ ইংলণ্ডের একটি ছোট্ট শান্ত পল্লীতে স্বামীজীর আবির্ভাব এমন এক বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল যে, তিনি এখানে আসামাত্র এই অপরূপ সুন্দর বিরাট-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটি কোথা থেকে এসেছেন, তাই নিয়ে পল্লীবাসীদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে যায়। প্রথমে তাঁরা এই সিদ্ধান্ত করলেন যে, তিনি একজন ভারতীয় ব্রাহ্মণ। কিন্তু ভারতীয় ব্রাহ্মণ সম্পর্কে তাঁদের ধারণার সঙ্গে স্বামীজীর আচার-ব্যবহার কিছুই মিলল না। তখন তাঁকে সঠিক জানবার জন্য এবং তাঁর কথা শোনবার জন্য একদিন রাত্রির আহারের পর সকলে আধ্যাপক রাইটের বাড়ীতে এসে হাজির হলেন। বৈঠকখানায় কথোপকথনরত স্বামীজী তখন মধুর স্বরে বলছিলেনঃ

‘এই সেদিন—মাত্র কয়েকদিন আগেও—চার-শ বছরেরও বেশী হবে না—হঠাৎ তাঁর কণ্ঠস্বর বদলে গেল, তিনি বলতে লাগলেনঃ দুর্গত জাতির উপর তারা কি নিষ্ঠুর ব্যবহার ও অত্যাচারই না করেছে। কিন্তু ঈশ্বরের বিচার তাদের ওপর নিশ্চয়ই একদিন নেমে আসবে। ইংরেজ! মাত্র অল্পকাল আগেও এরা ছিল অসভ্য। এদের গায়ে পোকা কিলবিল করত, আর তারা তাদের গায়ের দুর্গন্ধ ঢেকে রাখত নানা সুগন্ধ দিয়ে। ... কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! সবেমাত্র বর্বরতার অবস্থা পেরিয়ে আসতে শুরু করেছে।

যাদের সমালোচনা তিনি করছিলেন, তাদের মধ্যে একজন শ্রোতা বলে উঠলেন, ‘এটা একেবারে বাজে কথা। এটা অন্ততঃ পাঁচ-শ বছর আগেকার ব্যাপার।’

আমি কি বলিনি, ‘এই কিছুদিন আগেও? মানুষের আত্মার অনন্তত্বের পরিমাপে কয়েক-শ বছর আর কতটুকু?’ তারপর গলার স্বর পরিবর্তন করে সম্পূর্ণ শান্ত ও যুক্তিপূর্ণ সুরে বললেনঃ তারা একেবারে অসভ্য। উত্তরাঞ্চলের প্রচণ্ড শীত, অভাব অনটন এদের বন্য করে তুলেছে। এরা কেবল পরকে হত্যা করার কথাই ভাবে। ... কোথায় তাদের ধর্ম? মুখে তারা পবিত্র ঈশ্বরের নাম নেয়, প্রতিবেশীকে তারা ভালবাসে বলে দাবী করে, খ্রীষ্টের নামে তারা পরকে সভ্য করার কথা বলে। কিন্তু এ-সবই মিথ্যা। ঈশ্বর নয়—ক্ষুধাই এদের সভ্য করে তুলেছে। মানুষের প্রতি ভালবাসার কথা কেবল তাদের মুখে, অন্তরে পাপ আর সর্ব প্রকার হিংসা ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা মুখে বলে, ‘ভাই, আমি তোমাকে ভালবাসি,’ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গলায় ছুরি চালায়। তাদের হাত রক্তরাঙা।

তারপর তাঁর সুমিষ্ট গলার স্বর গম্ভীর হয়ে এল, তিনি আরও ধীরে বলতে লাগলেনঃ কিন্তু ঈশ্বরের বিচার একদিন তাদের উপরেও নেমে আসবে। প্রভু বলেছেন, ‘প্রতিশোধ নেব আমি, প্রতিফল দেব।’ মহাধ্বংস আসছে। এই পৃথিবীতে তোমাদের খ্রীষ্টানেরা সংখ্যায় কত? সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশও নয়। চেয়ে দেখ লক্ষ লক্ষ চীনাদের দিকে, ঈশ্বরের হাতিয়ার হিসাবে তারাই নেবে এর প্রতিশোধ। তারাই তোমাদের উপর আক্রমণ চালাবে। আর একবার চালাবে হূন অভিযান। তারপর একটু মুচকি হেসে বললেন, ‘তারা সমগ্র ইওরোপকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, কোন কিছুরই অস্তিত্ব রাখবে না। নারী, পুরুষ, শিশু—সব ধ্বংস হয়ে যাবে। পৃথিবীতে নেমে আসবে আবার অন্ধকার-যুগ।’ এ-কথা বলার সময় তাঁর গলার স্বর এত বিষণ্ন

হয়েছিল যে, তা অবর্ণনীয়। তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আমি—আমি কিছুই গ্রাহ্য করি না। এই ধ্বংসস্তূপ থেকে পৃথিবী আরও ভালভাবে গড়ে উঠবে। কিন্তু মহাধ্বংস আসছে। ঈশ্বরের প্রতিশোধ ও অভিশাপ নেমে আসতে আর দেরী নেই।'

তারা সকলেই প্রশ্ন করলেন, 'শীগ্‌গিরই কি সেই অভিশাপ নেমে আসবে?'

'এক হাজার বছরের মধ্যে ঘটনা ঘটবে।'

বিপদ আসন্ন নয় শুনে তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

স্বামীজী বলতে লাগলেন, 'ঈশ্বর এ অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবেনই। আপনারা ধর্মের মধ্যে, রাজনীতির মধ্যে হয়তো তা দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এর সন্ধান করতে হবে। বারে বারে এমনই ঘটেছে, ভবিষ্যতেও এমনই ঘটবে। আপনারা যদি জনগণকে অত্যাচার ও পীড়ন করেন, তবে তার জন্য আপনাদের দুঃখভোগ করতেই হবে। চেয়ে দেখুন না ভারতের দিকে, কি করে ঈশ্বর আমাদের কাজের প্রতিশোধ নিচ্ছেন। ভারতের ইতিহাসে দেখা যায়, অতীতে যারা ছিল ধনী মানী, তারা ধন-দৌলত বাড়াবার জন্য দরিদ্রকে নিষ্পেষণ করেছে, তাদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করেছে। দুর্গত জনের কান্না তাদের কানে পৌঁছয়নি। তারা যখন অন্নের জন্য হাহাকার করেছে, ধনীরা তাদের সোনারূপার থালায় অন্নগ্রহণ করেছে। তারপরই ঈশ্বরের প্রতিশোধরূপে এল মুসলমানরা, এদের কেটে কুচি-কুচি করলে। তরবারির জোরে তারা তাদের উপর জয়ী হল। তারপর বহুকাল ও বহু বছর ধরে ভারত বার বার বিজিত হয়েছে এবং সর্বশেষে এসেছে ইংরেজ। যত জাতি ভারতে এসেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হল এই ইংরেজ। ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন, হিন্দুরা রেখে গেছে অপূর্ব মন্দির, মুসলমানরা সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ। আর ইংরেজরা?—স্তূপীকৃত ব্র্যাণ্ডির ভাঙা বোতল—আর কিছু নয়। তবুও ঈশ্বর আমাদের দয়া করেননি, কারণ আমরা অন্যের প্রতি কোন দয়া-মমতা দেখাইনি। আমাদের দেশবাসীরা তাদের নিষ্ঠুরতায় সমগ্র সমাজকে নীচে টেনে এনে নামিয়েছে। তারপর যখন তাদের প্রয়োজন হল জনসাধারণের, তখন জনসাধারণের কোন ক্ষমতা রইল না তাদের সাহায্য করার। ঈশ্বর প্রতিশোধ নেন—মানুষ এ-কথা বিশ্বাস না করলেও ইতিহাসের প্রতিশোধ গ্রহণের অধ্যায়টি সে অবশ্যই অস্বীকার করতে পারবে না। ইতিহাস ইংরেজের কৃতকার্যের প্রতিশোধ নেবেই। আমাদের গ্রামে গ্রামে—দেশে

দেশে যখন মানুষ দুর্ভিক্ষে মরছে, তখন ইংরেজরা আমাদের গলায় পা দিয়ে টিপে ধরেছে, আমাদের শেষ রক্তটুকু তারা নিজ-তৃপ্তির জন্য পান করে নিয়েছে, আর আমাদের দেশের কোটি কোটি টাকা তাদের নিজেদের দেশে চালান দিয়েছে। চীনারাই আজ তার প্রতিশোধ নেবে—তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আজ যদি চীনারা জেগে ওঠে ও ইংরেজকে সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দেয়, যা তাদের উচিত প্রাপ্য—তাহলে সুবিচারই হবে।

তারপর তাঁর সব কথা বলা হলে তিনি চুপ করে রইলেন। সমবেত জনগণের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে চাপা গুঞ্জরন উঠল; তিনি সব শুনলেন, বাইরে থেকে মনে হল যেন কান দিলেন না। উপরের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, 'শিব! শিব!' ক্ষুদ্র শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁর প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোবৃত্তি ও ভাববন্যার প্রবাহে চঞ্চল ও অশান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের মনে হয়েছিল এই অদ্ভুত লোকটির শান্ত মনোভাবের অন্তরালে যেন আগ্নেয়গিরির গলিত লাভাস্রোতের মত এই ভাবাবেগ ও ভাববন্যা প্রবহমান। সভা ভঙ্গ হল, শ্রোতারা বিক্ষুব্ধ মনে চলে গেলেন।

প্রকৃতপক্ষে এ ছিল সপ্তাহের শেষের একটি দিন। তিনি কয়েকদিনই এখানে ছিলেন।... এখানে যেসব আলাপ-আলোচনা হয়েছে, তিনি বরাবরই সেগুলি ছবির মত নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে সুন্দর সুন্দর গল্প উপাখ্যান দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

এই সুন্দর গল্পটিও স্বামীজী কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেনঃ এক নারী তার স্বামীকে তার দুঃখ-কষ্টের জন্য গালাগালি দিত, অন্যের সাফল্য দেখে তাকে গঞ্জনা করত এবং তার দোষত্রুটিগুলির কথা তাকে সবিস্তারে বলত। স্ত্রী বলতঃ ভগবানকে এত বছর সেবা করার পর তোমার ভগবান্ কি তোমার জন্য এই করলেন? এই তার প্রতিদান? স্ত্রীর এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামী বললেন, 'আমি কি ধর্মের ব্যবসা করি? এই পর্বতের দিকে তাকিয়ে দেখ। এ আমার জন্য কি করে, আর আমিই বা তার জন্য কি করেছি? কিন্তু তা হলেও আমি এ পর্বতকে ভালবাসি। আমি সুন্দরকে ভালবাসি বলেই একে (হিমালয়কে) ভালবাসি—আমাকে এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। এই আমার প্রকৃতি। ভগবানকে আমি এজন্যই ভালবাসি।'

তারপর স্বামীজী এক রাজার কাহিনী বললেন। এক রাজা জনৈক সাধুকে কিছু দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সাধু তাঁর প্রস্তাব প্রথমে প্রত্যাখান করেন। প্রাসাদে এসে

রাজা তাঁর দান গ্রহণের জন্য সাধুকে আবার বিশেষ পীড়াপীড়ি করতে থাকেন এবং সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। কিন্তু রাজবাড়ীতে এসে সাধু দেখলেন, রাজা ধন-সম্পদ ও শক্তিবৃদ্ধির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন, ভিক্ষা চাইছেন। সাধু কিছুক্ষণ তাঁর এই প্রার্থনা অবাক হয়ে শুনলেন, তারপর তাঁর মাদুরটি গুটিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলেন। রাজা চোখ বুঁজে প্রার্থনা করছিলেন। প্রার্থনার পর চোখ খোলা-মাত্র দেখলেন যে, সাধু চলে যাচ্ছেন। রাজা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনি তো আমার দান গ্রহণ করলেন না?' সাধু উত্তরে বললেন, 'আমি ভিক্ষুকের কাছে দান নেব?'

ধর্মই সকলকে রক্ষা করতে পারে এবং খ্রীষ্টানধর্মে সকলকে রক্ষা করার শক্তি আছে—কোন ব্যক্তি এরূপ মন্তব্য করলে স্বামীজী তাঁর বড় বড় চোখ দুটি মেলে বললেন, 'খ্রীষ্টানধর্মে যদি রক্ষা করার শক্তি থাকত, তবে এই ধর্ম কেন ইথিওপিয়া ও আবিসিনিয়ার লোকদের রক্ষা করতে পারল না?'

স্বামীজীর মুখে প্রায় এই কথাটি শোনা যেতঃ কোন সন্ন্যাসীর প্রতি ইংরেজরা এ-রকম করতে সাহস পাবে না। কোন কোন সময়ে তিনি তাঁর আকুল মনের এই ইচ্ছাও প্রকাশ করতেন ও বলতেন, 'ইংরেজ আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মেরে ফেলুক। তাহলে আমার মৃত্যুই হবে তাদের ধ্বংসের সূত্রপাত।' তারপর হাসির ঝিলিক লাগিয়ে বলতেন, 'আমার মৃত্যু-সংবাদ সমগ্র দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়বে।'

সিপাহী বিদ্রোহে ঝাঁসির রাণীই ছিলেন তাঁর কাছে সবচেয়ে বীর নারী। তিনি রণক্ষেত্রে নিজেই সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন। বিদ্রোহীদের অনেকেই পরে আত্মগোপন করার উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। সাধুদের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর রকমের জেদী মনোভাব দেখা যায়, এই হল তার অন্যতম ইতিহাস। এই বিদ্রোহীদেরই একজন তার চার-চারটি সন্তানকে হারিয়েছিল, শান্ত সুস্থির ভাবে তার সেই হারান সন্তানদের কথা বলত, কিন্তু ঝাঁসির রাণীর কথা উঠলেই তিনি আর চোখের জল রাখতে পারতেন না, দরদর ধারায় বুক ভেসে যেত। তিনি বলতেন, রাণী তো মানবী নন, দেবী। সৈন্যদল যখন পরাজিত হল, রাণী তখন তলোয়ার নিয়ে পুরুষের মত যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুবরণ করলেন। এই সিপাহী বিদ্রোহের অন্য দিকের কাহিনী অদ্‌ভুত মনে হয়।

এর যে অন্য দিক্ আছে, তা আপনারা ভাবতেই পারবেন না। কোন হিন্দু সিপাহী যে কোন নারীকে হত্যা করতে পারে না, সে-বিষয়ে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন।

২১. ধর্ম ও বিজ্ঞান

জ্ঞানের একমাত্র উৎস হল অভিজ্ঞতা। জগতে ধর্মই একমাত্র বিজ্ঞান যাহাতে নিশ্চয়তা নাই, কেননা অভিজ্ঞতামূলক সত্য হিসাবে ইহা শিখান হয় না। এইরূপ উচিত নয়। যাহা হউক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে ধর্মশিক্ষা দেন, এমন কিছু লোক সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদিগকে অতীন্দ্রিয়বাদী বা মরমী (mystic) বলা হইয়া থাকে, এবং প্রতি ধর্মেই এই মরমীগণ একই ভাষায় কথা বলিয়া থাকেন এবং একই সত্য প্রচার করেন। ইহাই প্রকৃত ধর্ম- বিজ্ঞান। জগতে স্থানভেদে যেরূপ গণিতের (গাণিতিক সত্যের) তারতম্য হয় না, এই অতীন্দ্রিয় সত্যদ্রষ্টাগণের মধ্যেও কোন পার্থক্য দেখা যায় না। তাঁহাদের প্রকৃতি একই প্রকার, অবস্থান-রীতিও একই ধরনের। তাঁহাদের উপলব্ধি এক এবং এই উপলব্ধ সত্যই নিয়মরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।

ধর্মসংস্থার তথাকথিত ধার্মিক ব্যক্তিগণ প্রথমে ধর্ম-সম্বন্ধীয় একটি মতবাদ শিক্ষা করেন, পরে সেইগুলি অনুশীলন করেন। প্রত্যক্ষানুভূতিকে তাঁহারা বিশ্বাসের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেন না। কিন্তু মরমী হইলেন সত্যসন্ধানী, তিনি আধ্যাত্মিক সত্য প্রথমে উপলব্ধি করেন, মতবাদ সৃষ্টি করেন পরে। ধর্মযাজক-প্রচারিত ধর্ম অপরের উপলব্ধি-প্রসূত, মরমী- প্রচারিত ধর্ম স্বীয় উপলব্ধি-প্রসূত। যাজকীয় ধর্ম বাহিরকে অবলম্বন করিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হয়, অতীন্দ্রিয়বাদীর যাত্রা অন্তর হইতে বাহিরে।

রসায়নশাস্ত্র ও অপরাপর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহ যেমন জড়জগতের সত্য অন্বেষণ করে, ধর্মের লক্ষ্য সেরূপ অতীন্দ্রিয় জগতের সত্য। রসায়নশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করিতে হইলে প্রকৃতি-রাজ্যের গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করিতে হয়। অপরপক্ষে ধর্ম-শিক্ষার গ্রন্থ হইল স্বীয় মন ও হৃদয়। ঋষিগণ প্রায়শঃ জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ, কেননা তাঁহারা যে গ্রন্থ পাঠ করেন অর্থাৎ অন্তর-গ্রন্থ, তাহাতে উহার খবর নাই। বৈজ্ঞানিকও সেরূপ ধর্মবিজ্ঞানে প্রায়শঃ অনভিজ্ঞ, কেননা তিনিও ধর্মবিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞানদানে সম্পূর্ণ অসমর্থ কেবল বাহিরের পুস্তকখানি অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।

প্রতি বিজ্ঞানেরই একটি বিশেষ ধারা (পদ্ধতি) আছে; ধর্মবিজ্ঞান অনুরূপ ধারা-বিশিষ্ট। বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় বলিয়া ইহার অনুশীলন-ধারাও অনেক।অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ সমজাতীয় নয়। স্বভাবের বিভিন্নতাবশতঃ ধর্মবিজ্ঞান প্রণালী বিভিন্ন হইবেই। যেমন কোন একটি ইন্দ্রিয়ের প্রখরতা হেতু কাহারও শ্রবণশক্তি প্রখর, কাহারও বা দর্শনশক্তি, সেইরূপ মানস ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্যও সম্ভব এবং এই বিশেষ দ্বারপথেই মানুষকে তাহার অন্তর্জগতে উপনীত হইতে হয়। তথাপি সকল মনের মধ্যে একটা ঐক্য আছে এবং এমন একটি বিজ্ঞানও আছে, যাহা সকল মনের পক্ষেই প্রযোজ্য হইতে পারে। এই ধর্ম- বিজ্ঞান মানবাত্মার বিশ্লেষণমূলক। ইহার কোন নির্দিষ্ট মতবাদ নাই।

কোন একটি ধর্ম সকলের জন্য নির্দিষ্ট হইতে পারে না। প্রত্যেকটি ধর্মমত একসূত্রে গ্রথিত এক একটি মুক্তার ন্যায়। সর্বোপরি আমাদের উচিত প্রত্যেক ধর্মমতের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যটি বুঝিতে চেষ্টা করা। মানুষ কোন বিশেষ ধর্মমত লইয়া জন্মগ্রহণ করে না; ধর্ম তাহার ভিতরেই রহিয়াছে। যে-কোন ধর্মমত ব্যক্তিত্ব বিনাশ করিতে চায়, তাহাই পরিণামে ভয়াবহ। প্রত্যেক জীবন এক একটি স্রোত-প্রবাহের ন্যায় এবং সেই স্রোত-প্রবাহই তাহাকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায়। ঈশ্বরোপলব্ধিই সকল ধর্মের চরম উদ্দেশ্য। ঈশ্বরোপাসনাই সর্বশিক্ষার সার। যদি প্রত্যেক মানব তাহার আদর্শ নির্বাচনপূর্বক নিষ্ঠার সহিত তাহা অনুশীলন করে, তবে ধর্মসম্বন্ধীয় সকল বিসম্বাদ ঘুচিয়া যাইবে।

২২. উপলব্ধিই ধর্ম

মানুষ এ পর্যন্ত ঈশ্বরকে যত নামে অভিহিত করিয়াছে, তন্মধ্যে ‘সত্য’ই সর্বশ্রেষ্ঠ। সত্য উপলব্ধির ফলস্বরূপ; অতএব আত্মার মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান কর। পুস্তক ও প্রতীকসকল দূর করিয়া আত্মাকে তাহার স্ব-স্বরূপ দর্শন করিতে দাও। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, ‘আমরা গ্রন্থ- রাজির চাপে অভিভূত ও উন্মত্ত হইয়া গিয়াছি।’ যাবতীয় দ্বৈতভাবের ঊর্ধ্বে যাও। যে মুহূর্তে তুমি মতবাদ, প্রতীক ও অনুষ্ঠানকে সর্বস্ব মনে করিলে সেই মুহূর্তেই তুমি বন্ধনে পড়িলে; অপরকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত ঐ-সকলের সম্পর্ক রাখিতে পার, কিন্তু সাবধান, ঐগুলি যেন তোমার বন্ধন না হইয়া

পড়ে। ধর্ম এক, কিন্তু উহার প্রয়োগ বিভিন্ন হইবেই। সুতরাং প্রত্যেকে তাহার মতবাদ প্রচার করুক, কিন্তু কেহ যেন অপর ধর্মের দোষানুসন্ধান না করে। যদি তত্ত্বালোক প্রত্যক্ষ করিতে চাও, তাহা হইলে সকল প্রকার বেষ্টনী হইতে মুক্ত হও। ভগবদ্-জ্ঞান-সুধা আকণ্ঠ পান কর। ছিন্নবস্ত্র পরিহিত হইয়া যে 'সোঽহম্' উপলব্ধি করে, সেই ব্যক্তিই সুখী। অনন্তের রাজ্যে প্রবেশ কর ও অনন্ত শক্তি লইয়া ফিরিয়া আইস। ক্রীতদাস সত্যের অনুসন্ধানে যায়, এবং মুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসে।

২৩. স্বার্থ-বিলোপই ধর্ম

বিশ্বের অধিকারসমূহ কেহ বণ্টন করিতে পারে না। 'অধিকার' শব্দটিই ক্ষমতার সীমা-নির্দেশক। 'অধিকার' নয়, পরন্তু দায়িত্ব। জগতের কোথাও কোন অনিষ্ট সাধিত হইলে আমরা প্রত্যেকে তাহার জন্য দায়ী। কেহই নিজেকে তাহার ভ্রাতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। যাহা ভূমার সহিত সংযোগ স্থাপন করে, তাহাই পুণ্য; এবং যাহা উহা হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করে, তাহাই পাপ। তুমি অনন্তের একটি অংশ, উহাই তোমার স্বরূপ। সেই অর্থে 'তুমি তোমার ভ্রাতার রক্ষক'।

জীবনের প্রথম উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য আনন্দলাভ; জ্ঞান ও আনন্দ মুক্তির পথে পরিচালিত করে। কিন্তু যে পর্যন্ত না জগতের প্রত্যেকটি প্রাণী—পিপীলিকা বা কুকুর পর্যন্ত মুক্ত না হয়, ততক্ষণ কেহই মুক্তিলাভ করিতে পারে না। সকলে সুখী না হওয়া পর্যন্ত কেহই সুখী হইতে পারে না। যেহেতু তুমি ও তোমার ভ্রাতা মূলতঃ এক, অন্যকে আঘাত করিলে নিজেকেই আঘাত করা হয়। যিনি সর্বভূতে আত্মাকে ও আত্মাতে সর্বভূত প্রত্যক্ষ করেন, তিনিই প্রকৃত যোগী। আত্মপ্রতিষ্ঠা নয়, আত্মোৎসর্গই বিশ্বের উচ্চতম বিধান।

'অন্যায়ের প্রতিরোধ করিও না'—যীশুর এই উপদেশ কার্যে পরিণত না করাতেই জগতে এত অন্যায় পরিলক্ষিত হয়। একমাত্র নিঃস্বার্থতাই এই সমস্যার সমাধানে সক্ষম। প্রচণ্ড আত্মোৎসর্গের দ্বারা ধর্ম সাধিত হয়। নিজের জন্য কোন বাসনা রাখিও না। তোমার সকল কর্ম অপরের জন্য অনুষ্ঠিত হউক। এইভাবে জীবন যাপন করিয়া ঈশ্বরে স্বীয় অস্তিত্ব উপলব্ধি কর।

২৪. আত্মার মুক্তি

দৃশ্যবস্তুর সংস্পর্শে না আসা পর্যন্ত যেমন আমরা আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারি না, সেইরূপ আত্মাকেও তাহার কার্যের ভিতর দিয়া ছাড়া আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। ইন্দ্রিয়ানুভূতির নিম্নভূমিতে আত্মাকে আনিতে পারা যায় না। আত্মা স্বয়ং কারণের বিষয়ীভূত না হইয়াও এই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের কারণ। যখন আমরা নিজেদের আত্মা বলিয়া জানিতে পারি, তখনই আমরা মুক্ত হইয়া যাই। আত্মা অপরিণামী। ইহা কদাপি কারণের বিষয় হইতে পারে না, কেননা ইহা স্বয়ং কারণ। আত্মা স্বয়ম্ভূ। আমাদের মধ্যে যদি এমন কোন বস্তুর সন্ধান পাই, যাহা কোন কারণের দ্বারা সাধিত নয়, তখনই বুঝিতে হইবে, আমরা আত্মাকে জানিয়াছি।।

অমৃতত্ব ও মুক্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট। মুক্ত হইতে হইলে প্রাকৃতিক নিয়মের ঊর্ধ্বে যাইতে হইবে। বিধিনিষেধ ততদিন, যতদিন আমরা অজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান হইলে আমরা হৃদয়ঙ্গম করি যে, আমাদের ভিতরে যে স্বাধীনতা রহিয়াছে উহারই নাম নিয়ম। ইচ্ছা কখনও স্বাধীন হইতে পারে না, কারণ ইহা কার্য-কারণ-সাপেক্ষ। কিন্তু ইচ্ছাশক্তির পশ্চাতে অবস্থিত 'অহং' স্বাধীন, এবং উহাই আত্মা। 'আমি মুক্ত' এই বুদ্ধিকে ভিত্তি করিয়া জীবন গঠন করিতে হইবে ও বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। মুক্তির অর্থ অমৃতত্ব।।

২৫. বেদান্ত-বিষয়ক বক্তৃতার অনুলিপি

হিন্দুধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি—অনুধ্যান ও গভীরচিন্তা-মূলক দর্শনশাস্ত্র এবং বেদের বিভিন্ন অংশে নিহিত নৈতিক শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলির মতে এই বিশ্ব অনন্ত ও নিত্যকাল স্থায়ী। ইহার কখনও আদি ছিল না, অন্তও হইবে না। এই জড়-জগতে আত্মার চৈতন্য- শক্তির—সীমার রাজ্যে অসীমের শক্তির অসংখ্য প্রকাশ ঘটিয়াছে; কিন্তু অনন্ত নিজে স্বয়ং বিদ্যমান—শাশ্বত ও অপরিণামী। কালের গতি অনন্তের চক্রের উপর কোন রেখাপাত করিতে পারে না।

মানব-বুদ্ধির অগোচর সেই অতীন্দ্রিয় রাজ্যে অতীত বা ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছু নাই।

মানবাত্মা অমর—ইহাই বেদের শিক্ষা। দেহ ক্ষয়-বৃদ্ধিরূপ নিয়মের অধীন, কারণ যাহার বৃদ্ধি আছে, তাহা অবশ্যই ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু দেহী আত্মা দেহমধ্যে অবস্থিত, অনন্ত ও শাশ্বত জীবনের সহিত যুক্ত। ইহার জন্ম কখনও হয় নাই, মৃত্যুও কখনও হইবে না। বৈদিকধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য হইল এই যে, খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা দেয়—এই পৃথিবীতে জন্ম-পরিগ্রহই মানবাত্মার আদি, অপরপক্ষে—বৈদিক ধর্ম দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়া থাকে, মানবাত্মা অনন্ত সত্তার অভিব্যক্ত মাত্র এবং পরমেশ্বরের মতই ইহার কোন আদি নাই। সেই শাশ্বত পূর্ণতা লাভ না করা পর্যন্ত, আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে দেহ হইতে দেহান্তরে—অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে গমনকালে সেই আত্মা বহুরূপে প্রকাশিত হইয়াছে ও হইবে। অবশেষে সেই পূর্ণত্ব-প্রাপ্তির পর তাহার আর অবস্থান্তর ঘটিবে না।

২৬. বেদ ও উপনিষদ্-প্রসঙ্গে

বৈদিক যজ্ঞের বেদী হইতেই জ্যামিতির উদ্ভব হইয়াছিল।

দেবতা বা দিব্যপুরুষের আরাধনাই ছিল পূজার ভিত্তি। ইহার ভাব এইঃ যে দেবতা আরাধিত হন, তিনি সাহায্যপ্রাপ্ত হন ও সাহায্য করেন। বেদের স্তোত্রগুলি কেবল স্তুতিবাক্য নয়, পরন্তু যথার্থ মনোভাব লইয়া উচ্চারিত হইলে উহারা শক্তিসম্পন্ন হইয়া দাঁড়ায়।।

স্বর্গলোকসমূহ অবস্থান্তর মাত্র, যেখানে ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও উচ্চতর ক্ষমতা আরও অধিক। পার্থিব দেহের ন্যায় ঊর্ধ্বস্থিত সূক্ষ্ম দেহও পরিণামে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। ইহজীবনে এবং পরজীবনে সর্বপ্রকার দেহেরই মৃত্যু ঘটিবে। দেহগণও মরণশীল এবং তাঁহারা কেবল ভোগ সুখ-প্রদানেই সমর্থ।।

দেবগণের পশ্চাতে এক অখণ্ড সত্তা—ঈশ্বর বর্তমান, যেমন এই দেহের পশ্চাতে এক উচ্চতর সত্তা অবস্থিত, যিনি অনুভব ও দর্শন করেন।

বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় বিধানের শক্তি সর্বত্রবিদ্যমানতা, সর্বজ্ঞতা এবং সর্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি গুণাবলী দেবগণেরও নিয়ন্তা একমাত্র ঈশ্বরেই বিদ্যমান।।

'অমৃতের পুত্রগণ শ্রবণ কর, ঊর্ধ্বলোক-নিবাসী সকলে শ্রবণ কর, সকল সংশয় ও অন্ধকারের পারে আমি এক জ্যোতির দর্শন পাইয়াছি। আমি সেই সনাতন পুরুষকে জানিয়াছি।' উপনিষদের মধ্যে এই পথের নির্দেশ আছে।।

পৃথিবীতে আমরা মরণশীল। স্বর্গেও মৃত্যু আছে। ঊর্ধ্বতম স্বর্গলোকেও আমরা মৃত্যুর কবলে পতিত হই। কেবল ঈশ্বরলাভ হইলেই আমরা সত্য ও প্রকৃত জীবন লাভ করিয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হই।।

উপনিষদ্ কেবল এই তত্ত্বগুলিরই অনুশীলন করে। উপনিষদ্ শুদ্ধ পথের প্রদর্শক। উপনিষদে যে পথের নির্দেশ আছে, তাহাই পবিত্র পন্থা। বেদের বহু আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও স্থানীয় প্রসঙ্গ বর্তমানে বোঝা যায় না। কিন্তু উহাদের মাধ্যমে সত্য পরিস্ফুট হয়। সত্যের আলোক-প্রাপ্তির জন্য স্বর্গ ও মর্ত্য ত্যাগ করিতে হয়।

উপনিষদ্ ঘোষণা করিতেছেনঃ।

সেই ব্রহ্ম সমগ্র জগতে ওতপ্রোত হইয়া আছেন। এই জগৎ-প্রপঞ্চ তাঁহারই। তিনি সর্বব্যাপী, অদ্বিতীয়, অশরীরী, অপাপবিদ্ধ, বিশ্বের মহান্ কবি, শুদ্ধ, সর্বদর্শী; সূর্য ও তারকাগণ যাঁহার ছন্দ—তিনি সকলকে যথানুরূপ কর্মফল প্রদান করিয়া থাকেন।।।

যাঁহারা কর্মানুষ্ঠানের দ্বারাই জ্ঞানের আলোক লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাঁহারা গভীর অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা মনে করেন, এই জগৎ-প্রপঞ্চই সর্বস্ব, তাঁহারাও অন্ধকারে রহিয়াছেন। এই-সকল ভাবনার দ্বারা যাঁহারা প্রকৃতির বাহিরে যাইতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন।

তবে কি কর্মানুষ্ঠান মন্দ? না, যাহারা প্রবর্তক মাত্র, তাহারা এই-সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা উপকৃত হইবে।

একটি উপনিষদে কিশোর নচিকেতা কর্তৃক এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছেঃ মানুষের মরণ হইলে কেহ বলেন, তিনি থাকেন না; কেহ কেহ বলেন, তিনি থাকেন। আপনি

যম, মৃত্যু স্বয়ং—আপনি নিশ্চিতই এই সত্য অবগত আছেন; আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। যম উত্তর করিলেন, 'মানুষ তো দূরের কথা, দেবতাগণের মধ্যেও অনেকে ইহা জ্ঞাত নন। হে বালক, তুমি আমাকে ইহার উত্তর জিজ্ঞাসা করিও না।' কিন্তু নচিকেতা স্বীয় প্রশ্নে অবিচলিত রহিলেন। যম পুনরায় বলিলেন, 'দেবতাগণের ভোগ্যবিষয়সকল আমি তোমাকে প্রদান করিব। ঐ-প্রশ্ন বিষয়ে আমাকে আর অনুরোধ করিও না।' কিন্তু নচিকেতা পর্বতের ন্যায় অটল রহিলেন। অতঃপর মৃত্যুদেবতা বলিলেন, 'বৎস, তুমি তৃতীয়বারেও সম্পদ্, শক্তি, দীর্ঘজীবন, যশ, পরিবার সকলই প্রত্যাখ্যান করিয়াছ। চরম সত্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার মত যথেষ্ট সাহস তোমার আছে। আমি তোমাকে এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিব। দুইটি পথ আছে—একটি শ্রেয়ের অপরটি প্রেয়ের। তুমি প্রথমটি নির্বাচন করিয়াছ।'

এখানে সত্যবস্তু প্রদানের শর্তগুলি লক্ষ্য কর। প্রথম হইল পবিত্রতা—একটি অপাপবিদ্ধ নির্মল চিত্ত বালক বিশ্বের রহস্য জানিবার জন্য প্রশ্ন করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ কোন পুরস্কার বা প্রতিদানের আশা না রাখিয়া কেবল সত্যের জন্যই সত্যকে গ্রহণ করিতে হইবে। যিনি স্বয়ং আত্ম-সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন—এইরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে সত্য সম্বন্ধে উপদেশ না আসিলে উহা ফলপ্রদ হয় না। গ্রন্থ উহা দান করিতে পারে না, তর্কবিচারে উহা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। যিনি সত্যের রহস্য অবগত, তাঁহার নিকটই সত্য উদ্ঘাটিত হয়।

এই রহস্য জানিবার পর শান্ত হইয়া যাও। বৃথা তর্কে উত্তেজিত হইও না। আত্মসাক্ষাৎকারে লাগিয়া যাও। তুমিই সত্যলাভ করিতে সমর্থ।

ইহা সুখ নয়, দুঃখ নয়; পাপ নয়, পুণ্যও নয়; জ্ঞান নয়, অজ্ঞানও নয়। ইহা তোমাকে বোধে বোধ করিতে হইবে। ভাষার মাধ্যমে আমি কেমন করিয়া তোমার নিকট ইহা বর্ণনা করিব?

যিনি অন্তর হইতে কাঁদিয়া বলেন, প্রভু, আমি একমাত্র তোমাকেই চাই—প্রভু তাঁহারই নিকট নিজেকে প্রকাশ করেন। পবিত্র হও, শান্ত হও; অশান্ত চিত্তে ঈশ্বর প্রতিফলিত হন না।

'বেদ যাঁহাকে ঘোষণা করে, যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আমরা প্রার্থনা ও যজ্ঞ করিয়া থাকি, ওম্ (ওঁ) সেই অব্যক্ত পুরুষের পবিত্র নামস্বরূপ।' এই ওঙ্কার সমুদয় শব্দের মধ্যে পবিত্রতম। যিনি এই শব্দের রহস্য অবগত, তিনি প্রার্থিত বস্তু লাভ করেন। এই শব্দের আশ্রয় গ্রহণ কর। যে কেহ এই শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহার নিকট পথ উদ্ঘাটিত হয়।

২৭. জ্ঞানযোগ

প্রথমতঃ ধ্যান নেতিমূলক হইবে। সমস্ত চিন্তা বিলয় করিয়া দাও। যাহা মনে আসে, তাহা প্রবল ইচ্ছাশক্তি সহায়ে বিশ্লেষণ করিয়া নিরস্ত কর।

অতঃপর দৃঢ়তার সহিত আমাদের যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তৎসম্বন্ধে অভিনিবিষ্ট হও—সৎ, চিৎ, আনন্দ—অস্তি-ভাব, জ্ঞান-স্বভাব এবং প্রেমস্বরূপ।

ধ্যানের মধ্য দিয়াই দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ঐক্যানুভব হইয়া থাকে। ধ্যান করঃ

ঊর্ধ্ব আমা-দ্বারা পরিপূর্ণ; অধঃ আমাতে পরিপূর্ণ; মধ্য আমাতে পরিপূর্ণ। আমি সর্বভূতে এবং সর্বভূত আমাতে বিরাজিত। ওম্ তৎ সৎ, আমিই সেই। আমি মনের ঊর্ধ্বে সৎস্বরূপ। আমি বিশ্বের একমাত্র আত্মাস্বরূপ। আমি সুখ নই, দুঃখ নই।

দেহই পান করে, আহার করে ইত্যাদি। আমি দেহ নই, মন নই। সোঽহম্।

আমি সাক্ষি-স্বরূপ, আমি দ্রষ্টা। যখন দেহ সুস্থ থাকে, আমি সাক্ষী; যখন রোগ আক্রমণ করে, তখনও আমি সাক্ষি-স্বরূপ বর্তমান।

আমি সচ্চিদানন্দ। আমিই সার পদার্থ, জ্ঞানামৃত-স্বরূপ। অনন্তকালে আমার পরিবর্তন নাই। আমি শান্ত, দীপ্যমান, পরিবর্তন-রহিত।

২৮. সত্য এবং ছায়া

দেশ, কাল ও নিমিত্ত এক বস্তু হইতে অপর বস্তুর পার্থক্য নির্ণয় করে। পার্থক্য আকারেই বিদ্যমান, বস্তুতে নয়। রূপ (আকার) বিনষ্ট হইলে উহা চিরতরে লোপ পায়; কিন্তু বস্তু একরূপই থাকে। বস্তুকে কখনও ধ্বংস করিতে পারে না। প্রকৃতির মধ্যেই ক্রম-বিবর্তন, আত্মায় নয়—প্রকৃতির ক্রমবিবর্তন, আত্মার প্রকাশ।

সাধারণতঃ যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে, মায়া সেরূপ ভ্রম নয়। মায়া সৎ, আবার সৎ নয়। মায়া সৎ, কারণ উহার পশ্চাতে প্রকৃত সত্তা বিদ্যমান, উহাই মায়াকে প্রকৃত সত্তার আভাস প্রদান করে। মায়ার মধ্যে যাহা সৎ, তাহা হইল মায়ার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান প্রকৃত সত্তা। তথাপি ঐ প্রকৃত সত্তা কখনও দৃষ্ট হয় না; সুতরাং যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা অসৎ, এবং উহার প্রকৃত স্বতন্ত্র সত্তা নাই, প্রকৃত সত্তার উপরেই উহার অস্তিত্ব নির্ভর করে।

অতএব মায়া হইল কূটাভাস—সৎ অথচ সৎ নয়, ভ্রম অথচ ভ্রম নয়। যিনি প্রকৃত সত্তাকে (সৎস্বরূপকে) জানিয়াছেন, তিনি মায়াকে ভ্রম বলিয়া দেখেন না, সত্য বলিয়াই দেখেন। যিনি সৎস্বরূপ জ্ঞাত নন, তাঁহার নিকট মায়া ভ্রম এবং উহাকেই তিনি সত্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন।

২৯. জীবন-মৃত্যুর বিধান

প্রকৃতির অন্তর্গত সমুদয় বস্তু নিয়ম অনুযায়ী কর্ম করিয়া থাকে। কিছুই ইহার ব্যতিক্রম নয়।মন ও বহিঃপ্রকৃতির সমুদয় বস্তু নিয়ম দ্বারা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

আন্তর ও বহিঃপ্রকৃতি, মন ও জড়বস্তু, কাল ও দেশের মধ্যে অবস্থিত এবং কার্য-কারণ সম্বন্ধ দ্বারা বদ্ধ।

মনের মুক্তি ভ্রমমাত্র। যে মন নিয়ম দ্বারা বদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত, তাহার মুক্তি কিরূপে সম্ভব? কর্মবাদই কার্য-কারণবাদ।

আমাদিগকে মুক্ত হইতেই হইবে। আমরা মুক্তই আছি; আমরা যে মুক্ত—উহা জানিতে পারাই প্রকৃত কাজ। সর্বপ্রকার দাসত্ব ও সর্বপ্রকার বন্ধন পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমাদিগকে যে কেবল সর্বপ্রকার পার্থিব বন্ধন এবং জগদন্তর্গত সর্বপ্রকার বস্তু ও ব্যক্তির প্রতি বন্ধন ত্যাগ করিতে হইবে—তাহা নয়, পরন্তু স্বর্গ ও সুখ সম্বন্ধে সর্বপ্রকার কল্পনা ত্যাগ করিতে হইবে।

বাসনার দ্বারা আমরা পৃথিবীতে বদ্ধ, আবার ঈশ্বর স্বর্গ দেবদূতের নিকটও বদ্ধ। ক্রীতদাস ক্রীতদাসই, মানব ঈশ্বর অথবা দেবদূত যাহারই ক্রীতদাস সে হউক না কেন। স্বর্গের কল্পনা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

সজ্জন ব্যক্তি মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়া অনন্ত সুখময় জীবন যাপন করে—এই ধারণা বৃথা স্বপ্নমাত্র। ইহার বিন্দুমাত্র অর্থ বা যৌক্তিকতা নাই। যেখানে সুখ, সেখানে কোন না কোন সময় দুঃখ আসিবেই। যেখানে আনন্দ, সেখানে বেদনা নিশ্চিত। ইহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, যেভাবে হউক প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া থাকিবেই।

স্বাধীনতার আদর্শই হইতেছে মোক্ষলাভের প্রকৃত আদর্শ। তাহা ইন্দ্রিয়ের সর্বপ্রকার দ্বন্দ্ব আনন্দ বা বেদনা, ভাল বা মন্দ যাবতীয় বিষয় হইতে মুক্তি।

ইহা হইতেও অধিক—আমাদিগকে মৃত্যুর কবল হইতেও মুক্তিলাভ করিতে হইবে; এবং মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে জীবন হইতেও মুক্ত হইতে হইবে। জীবন মৃত্যুরই ছায়া মাত্র। জীবন থাকিলেই মৃত্যু থাকিবে; সুতরাং মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে হইলে জীবন হইতেও মুক্ত হও।

আমরা চিরকালই মুক্ত, কেবল আমাদিগকে উহা বিশ্বাস করিতে হইবে, যথেষ্ট বিশ্বাস থাকা চাই। তুমি অনন্ত মুক্ত আত্মা, চিরস্বাধীন—চিরধন্য। যথেষ্ট বিশ্বাস রাখ—মুহূর্ত মধ্যে তুমি মুক্ত হইয়া যাইবে।

দেশ কাল ও নিমিত্তের সমুদয় বস্তু বদ্ধ। আত্মা সর্বপ্রকার দেশ কাল ও নিমিত্তের বাহিরে। যাহা বদ্ধ, তাহাই প্রকৃতি—আত্মা নয়!

অতএব তোমার মুক্তি ঘোষণা কর, এবং তুমি প্রকৃত যাহা, তাহাই হও—সদামুক্ত, সদানন্দময়।

দেশ কাল ও নিমিত্তকেই আমরা মায়া বলিয়া থাকি।

৩০. আত্মা ও ঈশ্বর

যাহা কিছু স্থান ব্যাপ্ত করিয়া আছে, তাহারই রূপ আছে। স্থান (দেশ) নিজেই রূপ বা আকার ধারণ করে। হয় তুমি স্থানের (দেশের) মধ্যে অবস্থিত, নতুবা স্থান তোমাতে অবস্থিত। আত্মা সর্বপ্রকার দেশের অতীত। দেশ আত্মায় অবস্থিত, আত্মা দেশে অবস্থিত নয়।

আকার বা রূপ কাল ও দেশের দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং কার্য-কারণের দ্বারা আবদ্ধ। সমুদয় কাল আমাদের মধ্যে বিদ্যমান, আমরা কালের মধ্যে অবস্থিত নই। যেহেতু আত্মা স্থান ও কালের মধ্যে অবস্থিত নন, সমুদয় কাল ও দেশ আত্মায় অবস্থিত; অতএব আত্মা সর্বব্যাপী।

ঈশ্বর-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আমাদের নিজ নিজ চিন্তার প্রতিচ্ছবি। প্রাচীন ফরাসী এবং সংস্কৃতের মধ্যে মিল আছে।

প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের সহিত ঈশ্বরের অভেদ-কল্পনা অর্থাৎ প্রকৃতি-পূজাই ছিল ঈশ্বর-সম্বন্ধে প্রাচীন যুগের ধারণা। পরবর্তী ধাপ হইল গোষ্ঠীগত দেবতা। রাজাকে ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা করা হইল পরবর্তী ক্রম।

ঈশ্বর স্বর্গে অবস্থান করেন—এই ধারণা ভারতবর্ষ ব্যতীত সকল জাতির মধ্যেই প্রবল। ঐ ধারণা অত্যন্ত অপরিণত।

অবিচ্ছিন্ন জীবনের কল্পনা হাস্যজনক। যে পর্যন্ত আমরা জীবন হইতে মুক্তিলাভ না করি, সে পর্যন্ত মৃত্যু হইতেও মুক্তি নাই।

৩১. চরম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য

দ্বৈতবাদীর মতে ঈশ্বর এবং প্রকৃতি চিরকাল পৃথক্। বিশ্ব ও প্রকৃতি অনন্তকাল ধরিয়া ঈশ্বরাধীন।

চরম অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ তারতম্য করেন না। সর্বশেষ বিচারে তাঁহারা ঘোষণা করিয়া থাকেন যে, যাহা কিছু আছে সবই ব্রহ্ম, তাঁহাতেই বিশ্বপ্রপঞ্চ লয়প্রাপ্ত হয়; ঈশ্বর এই বিশ্বের অনন্ত জীবনস্বরূপ।

তাঁহাদের মতে অসীম ও সসীম—কেবল শব্দমাত্র। ভেদবুদ্ধিবশতই বিশ্বজগৎ প্রকৃতি প্রভৃতি স্বতন্ত্রভাবে দণ্ডায়মান। প্রকৃতি স্বয়ং বিভিন্নতার স্বরূপ।

'ঈশ্বর এই বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন কেন?' 'যিনি স্বয়ং পূর্ণ, তিনি এই অপূর্ণ সৃষ্টি করিলেন কেন?' ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না, কারণ এই ধরনের প্রশ্নগুলি তর্কানুসারে অযৌক্তিক। যুক্তির স্থান প্রকৃতির এলাকার মধ্যে; প্রকৃতির ঊর্ধ্বে উহার কোন অস্তিত্ব নাই। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্, সুতরাং 'কেন তিনি এইরূপ করিলেন, কেন তিনি ঐরূপ করিলেন?'— ইত্যাদি প্রশ্ন করিলে তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করা হয়। যদি তাঁহার কোন উদ্দেশ্য থাকে, তবে তাহা নিশ্চয় কোন লক্ষ্যপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ এবং উহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ঐ উপায় ব্যতিরেকে ঈশ্বর লক্ষ্য সিদ্ধ করিতে পারেন না। 'কেন? ও কোথা হইতে?'—ইত্যাদি প্রশ্নগুলি সেই বস্তুর সম্বন্ধেই উঠিতে পারে, যাহার অস্তিত্ব অপর কোন বস্তুর উপর নির্ভর করে।

৩২. ধর্মের প্রমাণ-প্রসঙ্গে

ধর্ম সম্বন্ধে একটি বড় প্রশ্ন হইলঃ কি কারণে ধর্ম এত অবৈজ্ঞানিক? ধর্ম যদি একটি বিজ্ঞান, তবে অপরাপর বিজ্ঞানের ন্যায় উহার সত্যতা অবধারিত নয় কেন? ঈশ্বর, স্বর্গ প্রভৃতি সম্বন্ধে সমুদয় ধারণা—অনুমান ও বিশ্বাস মাত্র। ইহার সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই, মনে হয়। ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে। মন সর্বদা পরিবর্তনশীল প্রবাহস্বরূপ!

মানব কি আত্মা, এক অপরিবর্তনীয় সত্তা (পদার্থ) অথবা নিত্য পরিবর্তনশীলতার সমষ্টিমাত্র? প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম ব্যতীত সমুদয় ধর্ম বিশ্বাস করে যে, মানুষ আত্মা, এক অভিন্ন সত্তা, এক, অদ্বিতীয়—যাহার মৃত্যু নাই, অবিনশ্বর।

প্রাচীন বৌদ্ধমতাবলম্বিগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, মানুষ নিত্য পরিবর্তনশীল অবস্থাবিশেষ এবং অসংখ্য দ্রুত অবস্থান্তরের প্রায় অনন্ত পারম্পর্যের মধ্যেই তাহার চৈতন্য নিহিত। প্রত্যেকটি পরিবর্তন অপর পরিবর্তনগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একক অবস্থান করিতেছে। এইভাবে কার্যকারণবাদ ও পরিণামবাদের কোন অবসর নাই।

যদি অদ্বিতীয় 'সমগ্র' বলিয়া কিছু থাকে, তবে বস্তুও (সত্তা) আছে। অখণ্ড সর্বদাই মৌলিক। মৌলিক কোন পদার্থের সংমিশ্রণ নয়। অন্য কোন পদার্থের উপর উহার অস্তিত্ব নির্ভর করে না। উহা একাকী বিরাজমান ও অবিনশ্বর।

প্রাচীন বৌদ্ধগণ এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে, সমুদয় বস্তু পরস্পর বিচ্ছিন্ন; অখণ্ড বলিয়া কিছু নাই; এবং মানব একটি পূর্ণ বা অখণ্ড—এই মতবাদ কেবল বিশ্বাসমাত্র, উহা প্রমাণ করা যাইতে পারে না।

এখন প্রধান প্রশ্ন হইলঃ মানুষ কি এক পূর্ণ অথবা নিত্য পরিবর্তনশীলতার স্তূপমাত্র? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার—প্রমাণ করিবার একটি মাত্র উপায় আছে। মনের চাঞ্চল্য রুদ্ধ কর, দেখিবে মানুষ পূর্ণ মৌলিক বা অবিমিশ্র, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবে। সমুদয় পরিবর্তন আমার মধ্যে চিত্তে বা মনরূপ পদার্থে, আমি পরিবর্তনসমূহ নই। যদি তাহা হইতাম, তবে পরিবর্তনসমূহ রোধ করিতে পারিতাম না।

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ও অপরের মধ্যে এই বিশ্বাস উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে যে, জগতের সবই অতি সুন্দর, এবং সে সম্পূর্ণ সুখী। কিন্তু যখন সে স্থির হইয়া জীবনের উদ্দেশ্য কি তাহা অনুসন্ধান করে, তখন উপলব্ধি করে, সে যে ইহার এবং উহার পশ্চাতে ছুটিয়া চলিয়াছে—নানা বিষয়ের জন্য সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে, তাহার কারণ—উহা না করিয়া উপায় নাই। তাহাকে অগ্রসর হইতেই হইবে। সে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং সে নিজেকে বিশ্বাস করাইতে চেষ্টা করে যে, সত্য সত্যই তাহার নানা বস্তুর প্রয়োজন আছে। যে ব্যক্তি নিজেকে যথার্থভাবে বুঝাইতে সমর্থ হয়

যে, তাহার সময় খুব ভাল যাইতেছে, বুঝিতে হইবে—তাহার শারীরিক স্বাস্থ্য অতি উত্তম। ঐ ব্যক্তি কোনরূপ প্রশ্ন না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাসনা চরিতার্থ করে। তাহার ভিতরে যে শক্তি রহিয়াছে, তাহার বশেই সে কার্য করিয়া থাকে। ঐ শক্তি তাহাকে বলপূর্বক কার্যে প্রবৃত্ত করে এবং দেখায় যেন সে ঐরূপ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল বলিয়াই করিয়াছে। কিন্তু যখন সে প্রকৃতির নিকট হইতে প্রচণ্ড বাধাপ্রাপ্ত হয়, যখন বহু আঘাত সহ্য করিতে হয়, তখন তাহার মনে প্রশ্ন জাগে, এ-সকলের অর্থ কি? যত অধিক সে আঘাত লাভ করে ও চিন্তা করে, ততই সে দেখে যে, তাহার আয়ত্তের বাহিরে এক শক্তির দ্বারা সে ক্রমাগত চালিত হইতেছে এবং সে কার্য করিয়া তাকে, তাহার কারণ—তাহাকে করিতেই হইবে। অতঃপর সে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তখনই সংগ্রাম শুরু হয়।

কথা হইল এই যে, যদি এই-সকল উৎপাত হইতে পরিত্রাণের কোন উপায় থাকে, তবে তাহা আমাদের অন্তরেই অবস্থিত। আমরা সর্বদাই প্রকৃত সত্তা কি, তাহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছি। সহজাত সংস্কারবশেই উহা করিয়া থাকি। জীবাত্মার অন্তর্গত সৃষ্টিই ঈশ্বরকে আবৃত করিয়া থাকে; আর এই কারণেই ঈশ্বরের আদর্শ সম্বন্ধে এত প্রভেদ বিদ্যমান। সৃষ্টির বিরাম ঘটিলেই আমরা নির্বিশেষ সত্তাকে জানিতে পারি। নির্বিশেষ পূর্ণ বা অসীম সত্তা আত্মাতেই বিদ্যমান, সৃষ্টর মধ্যে নয়। সুতরাং সৃষ্টির অবসান ঘটিলেই আমরা পূর্ণকে জানিতে পারি। নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে আমরা শরীর সম্বন্ধেই চিন্তা করিয়া থাকি; এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে তাঁহাকে দেহধারীরূপেই চিন্তা করিয়া থাকি। যাহাতে আত্মার প্রকাশ ঘটে, সেজন্য মনের চাঞ্চল্য দমন করাই প্রকৃত কাজ। শিক্ষার আরম্ভ শরীরে। প্রাণায়াম শরীরকে শিক্ষিত করিয়া সৌষ্ঠব দান করে। প্রাণায়াম–অভ্যাসের উদ্দেশ্য ধ্যান ও একাগ্রতালাভ। যদি মুহূর্তের জন্য তুমি সম্পূর্ণ স্থির বা নিশ্চল হইতে পার, তবে লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছ—বুঝিতে হইবে। মন উহার পরেও কাজ করিয়া যাইতে পারে; কিন্তু পূর্বে মন যে অবস্থায় ছিল, তাহা আর পাইবে না। তুমি নিজেকে জানিতে পারিবে, তোমার প্রকৃত স্বরূপ সত্তা উপলব্ধি করিবে। এক মুহূর্তের জন্য মন স্থির কর, তোমার যথার্থ স্বরূপ সহসা উদ্ভাসিত হইবে এবং বুঝিবে মুক্তি আসন্ন; আর কোন বন্ধন থাকিবে না। তত্ত্বটি এইরূপ—যদি তুমি সময়ের এক মুহূর্ত অনুধাবন করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে সমগ্র সময় বা কাল জানিতে পারিবে, যেহেতু একেরই দ্রুত অবিচ্ছিন্ন

পারম্পর্য হইল 'সমগ্র'। এক-কে আয়ত্ত কর, এক মুহূর্তকে সম্পূর্ণভাবে জান—মুক্তি লাভ হইবেই।

প্রাচীন বৌদ্ধগণ ব্যতীত সকল ধর্ম ঈশ্বর ও আত্মায় বিশ্বাসী। আধুনিক বৌদ্ধগণ ঈশ্বর ও আত্মায় বিশ্বাস করেন। ব্রহ্ম, শ্যাম, চীন প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণ প্রাচীন বৌদ্ধগণের পর্যায়ে পড়েন।

আর্নল্ডের 'লাইট অব্ এশিয়া' পুস্তকে বৌদ্ধবাদ অপেক্ষা বেদান্তবাদই অধিক প্রদর্শিত।

৩৩. উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টিবাদ

প্রকৃতির সুশৃঙ্খল বিধি-ব্যবস্থা বিশ্বস্রষ্টার এক অভিপ্রায় প্রদর্শন করিতেছে, এই ধারণা বা 'কিণ্ডারগার্টেন' শিক্ষাপদ্ধতি হিসাবে উত্তম। যেহেতু ঐ ধারণা ধর্মজগতে যাহারা শিশু তাহাদিগকে ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় দার্শনিক তত্ত্বে পরিচালিত করিবার জন্য ঈশ্বরের সৌন্দর্য, শক্তি ও মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এই ধারণা বা মতবাদের কোন উপকারিতা নাই, এবং উহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান্ বলিয়া স্বীকার করিলে দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে উহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

বিশ্ব-সৃষ্টির মধ্য দিয়া প্রকৃতি যদি ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে, তবে সৃষ্টির মূলে কোন অভিপ্রায় বা পরিকল্পনা আছে, এই তত্ত্ব তাহার ত্রুটিও প্রদর্শন করে। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্ হইলে কোন কার্যের জন্য তাঁহার পরিকল্পনা বা মতলবের প্রয়োজন হয় না। তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই উহা সম্পন্ন হয়। সুতরাং প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের কোন বিতর্ক, কোন উদ্দেশ্য বা কোন পরিকল্পনা নাই।

মানুষের সীমাবদ্ধ চৈতন্যের পরিণাম হইতেছে জড়জগৎ। মানুষ যখন তাহার দেবত্ব জানিতে পারে, তখন আমরা এখন জড়বস্তু এবং প্রকৃতি বলিয়া যাহা জানিতেছি তৎসমুদয়ই লোপ পায়।

কোন উদ্দেশ্য-সাধনের প্রয়োজনরূপে এই জড়জগতের স্থান সেই সর্বব্যাপী ঈশ্বরে নাই। যদি তাহা থাকিত, তবে ঈশ্বর বিশ্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতেন। ঈশ্বরের

অনুজ্ঞাক্রমে এই জগৎ বিদ্যমান, এ-কথা বলার অর্থ ইহা নয় যে, মানুষকে পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন কারণবশতঃ বা ঈশ্বরের প্রয়োজনের নিমিত্ত এই জগৎ বিদ্যমান।

মানুষের প্রয়োজনেই জগতের সৃষ্টি, ঈশ্বরের প্রয়োজনে নয়। বিশ্ব-পরিকল্পনায় ঈশ্বরের কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। তিনি সর্বশক্তিমান্ হইলে ঐরূপ কোন উদ্দেশ্য কিরূপে থাকিতে পারে? কোন কার্য-সাধনের জন্য তাঁহার কোন পরিকল্পনা, মতলব বা উদ্দেশ্যের প্রয়োজন হইবে কেন? তাঁহার কোন প্রয়োজন আছে, ইহা বলার অর্‌থ তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করা ও তাঁহার সর্বশক্তিমত্তারূপ বৈশিষ্ট্য তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া।

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কোন প্রশস্ত নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া তুমি দেখিলে—নদীটি এত চওড়া যে, সেতু-নির্মাণ ব্যতীত ঐ নদী উত্তীর্ণ হওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। নদী উত্তীর্ণ হইবার জন্য সেতু-নির্মাণের প্রয়োজন, এই ঘটনার দ্বারা সেতু নির্মাণ করিবার সামর্থ্য তোমার শক্তির পরিচয় প্রদান করিলেও উহা দ্বারাই তোমার সীমাবদ্ধ শক্তি ও অকিঞ্চিৎকরতাও প্রকাশ পাইবে। তোমার ক্ষমতা যদি সীমাবদ্ধ না হইত, যদি তুমি উড়িয়া অথবা নদীতে ঝাঁপ দিয়া নদী অতিক্রম করিতে পারিতে, তবে তোমাকে সেতু নির্মাণ- রূপ প্রয়োজনীয়তার বশবর্তী হইতে হইত না। সেতু-নির্মাণ দ্বারা তোমার মধ্যে সেতু-নির্মাণের শক্তি প্রমাণিত হইলেও উহা দ্বারা আবার তোমার অপূর্ণতাও প্রদর্শিত হইল। অন্য কিছু অপেক্ষা তোমার ক্ষুদ্রতাই অধিক প্রকাশ পাইল।

অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ মুখ্যতঃ এক। ভেদ শুধু প্রকাশে। দ্বৈতবাদিগণ যেমন পিতা ও পুত্র 'দুই' বলিয়া গ্রহণ করেন, অদ্বৈতবাদিগণ তেমন উভয়কে প্রকৃতপক্ষে 'এক' বলিয়া মনে করেন। দ্বৈতবাদের অবস্থান প্রকৃতির মধ্যে, বিকাশের মধ্যে এবং অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা বিশুদ্ধ আত্মার স্বরূপে।

প্রত্যেক ধর্মেই ত্যাগ ও সেবার আদর্শ ঈশ্বরের নিকট উপনীত হইবার উপায়স্বরূপ।

৩৪. চৈতন্য ও প্রকৃতি

চৈতন্যকে চৈতন্যরূপে প্রত্যক্ষ করাই ধর্ম, জড়রূপে দেখা নয়।

ধর্ম হইতেছে বিকাশ। প্রত্যেককে নিজে উহা উপলব্ধি করিতে হইবে। খ্রীষ্টানগণের বিশ্বাস, মানবের পরিত্রাণের নিমিত্ত যীশুখ্রীষ্ট প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তোমাদের নিকট উহা একটি বিশিষ্ট মতবাদের উপর বিশ্বাস, এবং এই বিশ্বাসেই নিহিত তোমাদের মুক্তি। আমাদের নিকট মুক্তির সহিত বিশিষ্ট মতবাদের কোন প্রকার সম্পর্ক নাই। প্রত্যেকেরই স্বীয় মনোমত কোন মতবাদে বিশ্বাস থাকিতে পারে; অথবা সে কোন মতবাদে বিশ্বাস না করিতেও পারে। যীশুখ্রীষ্ট কোন এক সময়ে ছিলেন, অথবা তিনি কোনদিন ছিলেন না, তোমার নিকট এই উভয়ের পার্থক্য কি? জ্বলন্ত ঝোপের (burning bush) মধ্যে মুশার ঈশ্বর-দর্শনের সহিত তোমার কি সম্পর্ক? মুশা জ্বলন্ত ঝোপে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছিলেন, এই তত্ত্বের দ্বারা তোমার ঈশ্বর-দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই যদি হয়, তবে মুশা যে আহার করিয়াছিলেন, ইহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট; তোমার আহার-গ্রহণে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। একটি অপরটির মতই সমভাবে যুক্তিযুক্ত। আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগণের বিবরণসমূহ আমাদিগকে তাঁহাদের পথে অগ্রসর হইতে ও স্বয়ং ধর্ম উপলব্ধি করিতে প্রণোদিত করে, ইহা ব্যতীত অপর কোন কল্যাণ সাধন করে না। যীশুখ্রীষ্ট, মুশা বা অপর কেহ যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করা ব্যতীত আর কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারে না।

প্রত্যেক ব্যক্তির একটি বিশেষ স্বভাব আছে, উহা তাহার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। ঐ বৈশিষ্ট্য তাহাকে অনুসরণ করিতেই হইবে। উহার মধ্য দিয়াই তাহাকে মুক্তির পথ খুঁজিতে হইবে। তোমার গুরুই তোমাকে বলিয়া দিবেন, তোমার নির্দিষ্ট পথ কোন্‌টি এবং সেই পথে তোমাকে পরিচালিত করিবেন। তোমার মুখ দেখিয়া তিনি বলিয়া দিবেন, তুমি কোন্ অবস্থায় ও কিরূপ সাধনার অধিকারী এবং ঐ বিষয়ে তোমাকে নির্দেশ দিবার ক্ষমতাও তাঁহার থাকিবে। অপরের পথ অনুসরণ করিবার চেষ্টা করা উচিত নয়, কেননা উহা তাঁহার জন্যই নির্দিষ্ট, তোমার জন্য নয়। নির্দিষ্ট পথ পাইলে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা ব্যতীত আর কিছুই করিবার নাই, স্রোতই তোমাকে মুক্তির দিকে

টানিয়া লইয়া যাইবে। অতএব যখন সেই নির্ধারিত পথ পাইবে, তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইও না। তোমার পন্থা তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, কিন্তু উহা যে অপরের পক্ষেও শ্রেয়ঃ হইবে, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

প্রকৃত আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি চৈতন্যকে চৈতন্যরূপেই প্রত্যক্ষ করেন, জড়রূপে নয়। চৈতন্যই প্রকৃতিকে গতিশীল করে, চৈতন্যই সত্য বস্তু। ক্রিয়ার অস্তিত্ব প্রকৃতির মধ্যেই বিদ্যমান, চৈতন্যে নয়। চৈতন্য সর্বদা এক, অপরিণামী ও শাশ্বত। চৈতন্য ও জড় প্রকৃতপক্ষে এক, কিন্তু চৈতন্য স্ব-স্বরূপে কখনই জড় নয়। জড় কখনও জড়সত্তা-রূপে চৈতন্য হইতে পারে না। আত্মা কখনও ক্রিয়া করেন না। কেনই বা করিবেন? আত্মা বিদ্যমান—ইহাই যথেষ্ট। আত্মা শুদ্ধ, সৎ ও নিরবচ্ছিন্ন। আত্মায় ক্রিয়ার কোন আবশ্যকতা নাই।

নিয়ম দ্বারা তুমি বদ্ধ নও। উহা তোমার মায়িক প্রকৃতির অন্তর্গত। মন প্রকৃতিরই এলাকায় ও নিয়মাধীন। সমগ্র প্রকৃতি স্বীয় কর্মজনিত নিয়মের অধীন এবং এই নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। প্রকৃতির একটি নিয়মও যদি লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হও, তবে মুহূর্তমধ্যে প্রকৃতি ধ্বংস হইবে, প্রকৃতি বলিয়া কিছু থাকিবে না। যিনি মুক্তিলাভ করেন, তিনিই প্রকৃতির নিয়ম ভাঙিয়া ফেলিতে সমর্থ, তাঁহার নিকট প্রকৃতি লয়প্রাপ্ত হয়; প্রকৃতির কোন প্রভাব আর তাঁহার উপর থাকে না। প্রত্যেকেই একদিন চিরকালের জন্য এই নিয়ম ভাঙিয়া ফেলিবে, আর তখনই প্রকৃতির সহিত তাহার দ্বন্দ্ব শেষ হইয়া যাইবে।

গভর্ণমেণ্ট, সমিতি প্রভৃতি অল্পবিস্তর ক্ষতিকর। সকল সমিতিই কতকগুলি দোষযুক্ত সাধারণ নিয়মের উপর স্থাপিত। যে মুহূর্তে তোমরা নিজেদের একটি সঙ্ঘে পরিণত করিলে, সেই মুহূর্ত হইতে ঐ সঙ্ঘের বহির্ভূত সকলের প্রতি বিদ্বেষ আরম্ভ হইল। যে কোন প্রতিষ্ঠানে যোগদানের অর্থ নিজের উপর গণ্ডী টানা ও স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করা। প্রকৃত কল্যাণ হইতেছে সর্বোত্তম স্বাধীনতা। প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সাধুতা যত বাড়ে কৃত্রিম নিয়মও তত হ্রাস পায়। ঐগুলি বাস্তবিক পক্ষে নিয়মই নয়। কারণ—উহা যদি সত্যই নিয়ম হইত, তবে কখনই উহা লঙ্ঘন করা যাইত না। এই তথাকথিত নিয়মগুলি যে ভাঙিয়া ফেলা যায়, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ঐগুলি প্রকৃত নিয়ম নয়। যথার্থ নিয়ম অলঙ্ঘনীয়।

যখন কোন চিন্তা দমন করিয়া ফেল, তখন উহা স্প্রিং-এর ন্যায় কুণ্ডলী পাকাইয়া অদৃশ্যভাবে চাপা পড়িয়া থাকে মাত্র। সুযোগ পাইলেই মুহূর্তমধ্যে—দমনের ফলে সংহত সমস্ত রুদ্ধশক্তি লইয়া সবেগে বাহির হইয়া আসে, এবং তারপর যাহা ঘটিতে বহু সময় লাগিত, কয়েক মুহূর্তে তাহা ঘটিয়া যায়।

প্রতিটি ক্ষুদ্র সুখ বৃহৎ দুঃখ বহন করে। শক্তি এক—এক সময়ে যাহা আনন্দরূপে ব্যক্ত হয়, অন্য সময়ে তাহারই অভিব্যক্তি দুঃখ। কতকগুলি অনুভূতির অবসান হইলেই অপর কতকগুলি আরম্ভ হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নততর ব্যক্তিগণের কাহারও মধ্যে দুইটি, এমন কি একশত বিভিন্ন চিন্তা একই সময়ে কার্য করিতে থাকে।

হইতেছে স্বীয় স্বভাবের পরিণতি—মানসী ক্রিয়া অর্থে সৃষ্ট। শব্দ চিন্তার ও রূপ (আকার) শব্দের অনুসরণ করে। মনে আত্মা প্রতিফলিত হইবার পূর্বে মানসিক ও শারীরিক সর্বপ্রকার কার্য করিবার সঙ্কল্প রুদ্ধ করা প্রয়োজন।

৩৫. ধর্মের অনুশীলন

[১৮ মার্চ, ১৯০০ খ্রীঃ ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত আলামেডায় প্রদত্ত।]

আমরা বহু পুস্তক পড়িয়া থাকি, কিন্তু উহা দ্বারা আমাদের জ্ঞানলাভ হয় না। জগতের সমুদয় ‘বাইবেল’ আমরা পড়িয়া শেষ করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে আমাদের ধর্মলাভ হইবে না। যে-ধর্ম কেবল কথায় পর্যবসিত, তাহা লাভ করা অতি সহজ, যে-কেহ উহা লাভ করিতে পারে। আমরা চাই কর্মে পরিণত ধর্ম। কর্মে পরিণত ধর্ম সম্বন্ধে খ্রীষ্টানদিগের ধারণা হইতেছে সৎকর্মের অনুষ্ঠান—জগতের হিতসাধন।

হিতসাধনের বা পরপোকারের ফল কি? হিতবাদিগণের দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা বিচার করিলে দেখা যায়, ধর্ম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। বহুসংখ্যক লোক হাসপাতালে আসুক—ইহাই প্রত্যেকটি হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের আকাঙ্ক্ষা। পরহিতৈষণার অর্থ কি? উহা অত্যাবশ্যক নয়। প্রকৃতপক্ষে পরহিতৈষণার অর্থ জগতের দুঃখে কিঞ্চিৎ সাহায্য করা—দুঃখের উচ্ছেদ সাধন নয়। সাধারণ লোক নাম-যশের প্রার্থী, এবং নাম-যশোলাভের উদ্দেশ্যেই সে তাহার সমুদয় প্রচেষ্টা পরোপকার ও সৎকর্মের

চাকচিক্যময় আবরণে ঢাকিয়া রাখে। অপরের জন্য কাজ করিতেছি, এই ভান করিয়া বস্তুতঃ সে নিজের কাজই গুছাইয়া লয়। প্রত্যেকটি তথাকথিত পরোপকারের উদ্দেশ্য হইতেছে—যে অশুভটি নিবারণ করিতে চাহিতেছ, উহাকেই উৎসাহ দান।

হাসপাতাল বা যে-কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রতি দাক্ষিণ্য দেখাইবার জন্য স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে মিলিয়া বলনৃত্যে যোগদান করে এবং সারারাত্রি নৃত্যগীতে অতিবাহিত করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর পশুর ন্যায় আচরণ শুরু করে; ফলে পৃথিবীতে দলে দলে পাষণ্ড ব্যক্তির উৎপত্তি হয় এবং কারাগার, পাগলাগারদ ও হাসপাতাল ঐ-প্রকার ব্যক্তির দ্বারা পূর্ণ হইয়া যায়। এইরূপই চলিতে থাকে, আর হাসপাতাল-স্থাপন প্রভৃতি সৎ কর্ম বলিয়া অভিহিত হয়। সৎ কর্মের আদর্শ হইতেছে জগতের সমুদয় দুঃখের হ্রাস অথবা উচ্ছেদ-সাধন। যোগী বলেন, মনঃসংযমে ব্যর্থতা হইতেই দুঃখের উৎপত্তি। যোগীর আদর্শ জড়-জগৎ হইতে মুক্তিলাভ। প্রকৃতিকে জয় করাই তাঁহার কর্মের মানদণ্ড। যোগী বলেন, সমুদয় শক্তি আত্মায় বিদ্যমান, এবং শরীর ও মন সংযত করিয়া আত্মশক্তিবলে যে-কেহ প্রকৃতিকে জয় করিতে সমর্থ।

দৈহিক কর্মের জন্য যতটা প্রয়োজন, তদতিরিক্ত মাংসপেশী যে পরিমাণ বেশী জমিবে, সেই পরিমাণে হ্রাস পাইবে। অত্যধিক কঠোর পরিশ্রম করা উচিত নয়, উহা ক্ষতিকর। কঠোর পরিশ্রম না করিলে দীর্ঘজীবী হইবে। অল্প আহার গ্রহণ কর ও অল্প পরিশ্রম কর। মস্তিষ্কের খাদ্য সংগ্রহ কর।

নারীর পক্ষে গৃহকর্মই যথেষ্ট। প্রদীপ তাড়াতাড়ি পুড়াইয়া শেষ করিও না, ধীরে ধীরে পুড়িতে দাও।

যুক্তাহারের অর্থ সাদাসিধা খাদ্য, অত্যধিক মশলাযুক্ত খাদ্য নয়।

৩৬. বেলুড় মঠ—আবেদন

হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বগুলি প্রচার করিয়া পাশ্চাত্য দেশে বহুনিন্দিত আমাদের ধর্মমতের প্রতি কথঞ্চিৎ শ্রদ্ধা অর্জন করিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্যগণ যেটুকু সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের ভিতরে ও বাহিরে প্রচারকার্যের

জন্য একদল যুবক সন্ন্যাসীকে শিক্ষা দিবার আশা আমাদের মনে জাগ্রত হইয়াছে। একদল যুবককে বৈদিক গুরুগৃহবাস প্রথায় শিক্ষা দিবার চেষ্টাও করা হইতেছে।

কয়েকজন ইওরোপীয় এবং আমেরিকান বন্ধুর সাহায্যে কলিকাতার নিকটবর্তী গঙ্গার তীরে একটি মঠ স্থাপিত হইয়াছে।

অল্প দিনে এই কাজের কোন প্রত্যক্ষ ফললাভ করিতে হইলে চাই অর্থ; অতএব যাঁহারা আমাদের এই চেষ্টার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন তাঁহাদের নিকট আমাদের এই আবেদন।

আমাদের ইচ্ছা—মঠের কাজের এইরূপ প্রসার করিতে হইবে, যাহাতে এই অর্থানুকূল্যে যতজন সম্ভব যুবককে মঠে রাখিয়া তাহাদিগকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ভারতীয় আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায়। উহাতে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত তাহাদের গুরুর নিকট বাস করিয়া পুরুষোচিত নিয়মানুবর্তিতা অর্জন করিবে।

লোকবল ও অর্থবল হইলে কলিকাতার নিকটস্থ প্রধান কেন্দ্র কর্তৃক দেশের অন্যান্য স্থানেও ক্রমশঃ শাখা-কেন্দ্র স্থাপিত হইবে।

এই কাজের স্থায়ী ফললাভ করিতে সময় লাগিবে। আমাদের যুবকদের পক্ষে এবং যাঁহাদের এই কার্যে সাহায্য করিবার সামর্থ্য আছে, তাঁহাদের পক্ষে এজন্য প্রচুর স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন।

আমরা বিশ্বাস করি, এজন্য জনবল প্রস্তুত। অতএব যাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম ও দেশকে সত্যিই ভালবাসেন এবং কার্যতঃ সহানুভূতি দেখাইতে পারেন, তাঁহাদের কাছে আমরা এই আবেদন জানাইতেছি।

৩৭. অদ্বৈত আশ্রম, হিমালয়

[১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে স্বামীজী এই লেখাটি মায়াবতী (আলমোড়া, হিমালয়) অদ্বৈত আশ্রমের পরিচয়-পুস্তিকায় (Prospectus) প্রকাশ করার জন্য পত্রযোগে প্রেরণ করেন।]

যাঁহার মধ্যে এই ব্রহ্মাণ্ড, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত, আবার যিনিই এই ব্রহ্মাণ্ড; যাঁহার মধ্যে আত্মা, যিনি এই আত্মার মধ্যে অবস্থিত, এবং যিনিই এই মানবাত্মা; তাঁহাকে, অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডকে, আত্মস্বরূপ বলিয়া জানিলে আমাদের সমস্ত ভয় ও দুঃখের অবসান হয় এবং পরম মুক্তিলাভ হয়। যেখানেই প্রেমের প্রসারণ কিম্বা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতি দেখা যায়, সেখানেই উহা—'সর্বপ্রাণীর একত্ব'রূপ শাশ্বত সত্যের উপলব্ধি, প্রত্যক্ষানুভূতি ও কার্যকারিত্বের মধ্য দিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে। পরাধীনতাই দুঃখ; স্বাধীনতাই সুখ।

অদ্বৈতই একমাত্র সাধনপ্রণালী, যাহা মানুষকে তাহার পূর্ণ স্বাবলম্বন প্রদান করে, এবং তাহার সমস্ত পরাধীনতা ও তৎসংশ্লিষ্ট সকল কুসংস্কার দূর করিয়া আমাদিগকে সর্বপ্রকার দুঃখ সহ্য করিবার ক্ষমতা ও কার্য করিবার সাহস প্রদান করে; পরিশেষে উহাই আমাদিগকে পরম মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম করে।

দ্বৈতভাবের দুর্বলতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া এতদিন এই মহান্ সত্য প্রচার করা সম্ভবপর হয় নাই। এই কারণে আমাদের ধারণা—এই ভাব মানবসমাজের কল্যাণে সম্যক প্রচারিত হয় নাই।

এই মহান্ সত্যকে ব্যক্তিগত জীবনে স্বাধীন ও পূর্ণতর প্রকাশের সুযোগ দিয়া মানব-সমাজকে উন্নত করিতে আমরা হিমালয়ের ঊর্ধ্ব প্রদেশে—যেখানে ইহা প্রথম উদ্গীত হইয়া- ছিল—এই অদ্বৈত আশ্রম স্থাপন করিতেছি।

এখানে সমস্ত কুসংস্কার এবং বলহানিকারক মলিনতা হইতে অদ্বৈত ভাব মুক্ত থাকিবে, আশা করা যায়। এখানে শুধু 'একত্বের শিক্ষা' ছাড়া অন্য কিছুই শিক্ষা দেওয়া বা সাধন করা হইবে না। যদিও আশ্রমটি সমস্ত ধর্মমতের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন, তবুও ইহা অদ্বৈত—কেবলমাত্র অদ্বৈত—ভাবের জন্যই উৎসর্গীকৃত হইল।

৩৮. বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমঃ আবেদন

[১৯০২ খ্রীঃ ফেব্রুআরী মাসে কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের প্রথম কার্যবিবরণীসহ প্রেরিত একটি পত্র।]

প্রিয় …

ইহার সহিত বারাণসী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের গত বৎসরের একটি কার্যবিবরণী আপনার জন্য পাঠাইতেছি।

এই শহরে যে-সকল ব্যক্তি, সাধারণতঃ বৃদ্ধ নরনারী দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়েন, তাঁহাদের দুঃখ মোচনের জন্য আমরা যে সামান্য চেষ্টা করিতে পারিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহা হইতে পাইবেন।

বর্তমান শিক্ষাজাগরণ ও জনমতের ক্রমবর্ধমানের দিনে হিন্দুর তীর্থসমূহ, তাহাদের বর্তমান অবস্থা ও কর্মপদ্ধতি সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। এই তীর্থ হিন্দুদিগের নিকট পবিত্রতম, সেজন্য ইহার সমালোচনাও কঠোরতম।

অন্যান্য তীর্থস্থানগুলিতে লোকে পাপমোচনের উদ্দেশ্যে যায়। সেজন্য তাহাদের সহিত তাহাদের সম্পর্কও সাময়িক—মাত্র কয়েকদিনের জন্য। কিন্তু আর্য-সভ্যতার এই প্রাচীনতম ও সজীব ধর্মীয় কেন্দ্রে—এই নগরে—বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত নর-নারীগণ বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের ছায়াতলে বসিয়া ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করিয়া যাহাতে চরম মোক্ষ লাভ করিতে পারেন, সেজন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করিতে থাকেন।

ইহা ছাড়াও আর যাঁহারা জগদ্ধিতায় সর্বত্যাগী হইয়াছেন ও তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন ও শৈশবের সকল সম্পর্ক হইতে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, তাঁহারাও এ শহরে বাস করেন। মানুষের সাধারণ নিয়তি—দৈহিক রোগাদির দ্বারা তাঁহারাও আক্রান্ত হন।

শহরের ব্যবস্থাপনায় হয়তো কিছু কিছু ত্রুটি আছে, পুরোহিতবর্গের উপর সাধারণতঃ যে-সকল কঠোর সমালোচনা বর্ষিত হয়, হয়তো তাহাও সত্য। তথাপি ভুলিলে চলিবে না—জনসাধারণ যেমন, পুরোহিতও তেমনি। যদি লোকে জোড়হাতে কেবল একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে ও দুঃখের এই দ্রুত প্রবাহ—যাহা তাহাদের গৃহের পাশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, সন্ন্যাসী ও গৃহীদিগকে অসহায় দুর্ভোগের সাধারণ আবর্তে টানিয়া ফেলিতেছে—কেবল দেখিতে থাকে এবং ঐ প্রবাহ হইতে কাহাকেও বাঁচাইবার চেষ্টামাত্র না করিয়া তীর্থের পুরোহিতকুলের অন্যায় কার্যের শুধু বাগাড়ম্বরপূর্ণ সমালোচনা করে, তাহা হইলে এই দুর্ভোগের এককণাও কমিবে না, এক ব্যক্তিও সাহায্য পাইবে

প্রশ্ন এই—শিবের এই চিরন্তন স্থান মোক্ষলাভের অনুকূল বলিয়া আমাদের পূর্বপুরুষগণ যেরূপ বিশ্বাস করিতেন, আমরাও কি সেই বিশ্বাস পোষণ করিতে চাই? যদি তাই হয়, তবে মরণার্থী ব্যক্তিগণের বৎসরের পর বৎসর এখানে আসিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে দেখিয়া আমাদের আনন্দলাভ করাই উচিত। দুঃখিগণের মোক্ষলাভের এই চিরন্তন ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া আমাদের শ্রীভগবানের নামের জয়গান করাই কর্তব্য।

যে-সব দুঃখার্ত ব্যক্তি এই স্থানে মৃত্যুবরণ করিতে আসে, তাহারা স্বকীয় জন্মস্থানের প্রাপ্য সমস্ত সাহায্য হইতে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; তাহারা যখন রোগাক্রান্ত হয়, তখন তাহাদের যে কী অবস্থা হয়, তাহা অনুভব করিবার ভার ও হিন্দু হিসাবে আপনারা উহার কি প্রতিকার করিতে পারেন, তাহা ভাবিয়া দেখিবার ভার আপনাদের বিবেকের উপর ন্যস্ত করিতেছি।

ভ্রাতৃগণ! অন্তিম বিশ্রামের প্রস্তুতির এই অদ্‌ভুত স্থানের আশ্চর্যকর আকর্ষণের বিষয় স্থিরচিত্তে আপনারা কি চিন্তা করিতে পারেন না? মৃত্যুর মাধ্যমে মোক্ষের দিকে অগ্রসর তীর্থযাত্রীদের বহু প্রাচীন বিরামহীন এই স্রোত আপনাদিগকে কি অনির্বচনীয় শ্রদ্ধার ভাবে আবিষ্ট করে না? যদি করে, তবে আসুন আমাদিগের এই কাজের জন্য আপনাদের সদয় হস্ত প্রসারিত করুন।

আপনাদের দান হয়তো অতি সামান্য, আপনাদের সাহায্য হয়তো নগণ্য, তবুও কুণ্ঠাবোধ করিবেন না। প্রাচীন প্রবাদ আছে—তৃণগুচ্ছগুলি একত্র করিয়া রজ্জু প্রস্তুত করিলে সর্বাপেক্ষা মদমত্ত হস্তীকেও উহা দ্বারা বাঁধিয়া রাখা যায়।

বিশ্বনাথাশ্রিত সর্বদা আপনাদের
বিবেকানন্দ

৩৯. বৌদ্ধভারত

[শেক্‌স্‌পীয়র ক্লাব, পাসাডেনা, ক্যালিফোর্নিয়া-২ ফেব্‌রুআরী, ১৯০০, সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় প্রদত্ত বক্‌তৃতা।]

আজ সন্ধ্যায় বৌদ্ধভারত আমাদের আলোচ্য বিষয়। আপনারা অনেকেই হয়তো এডুইন আর্নল্ডের পদ্যে লিখিত বুদ্ধের জীবনী পাঠ করেছেন। কেউ কেউ হয়তো এ-বিষয়ে আরও বিশদ আলোচনাও করে থাকবেন। কারণ ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি নানা ভাষায় বৌদ্ধ-সাহিত্যের উপর প্রচুর পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মই জগতের সার্বভৌম ধর্মের প্রথম অভিব্যক্তি। সুতরাং এর অনুশীলন স্বতই বিশেষ আকর্ষণীয়।

বৌদ্ধধর্মের পূর্বেও ভারতে এবং অন্যত্র নানা ধর্মের আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু সেগুলি অল্পবিস্তর নিজ নিজ জাতির পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। হিন্দু, য়াহুদী, পারসীক প্রভৃতি প্রাচীন জাতির প্রত্যেকেরই মহান্ ধর্ম ছিল। কিন্তু সে-সবই মোটের উপর জাতি-বিশেষের নিজস্ব ধর্ম—সার্বভৌম ধর্ম নয়। বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মের বিশ্ববিজয়রূপ বিচিত্র একটি অভিযানের সূত্রপাত। যে মতবাদ ও বাণী বৌদ্ধধর্মে প্রচারিত হয়েছিল, যে সত্যসমূহ তার শিক্ষার অঙ্গীভূত—সে-সবের কথা বাদ দিলেও ধর্মজগতে সেই প্রথম এক বিপুল বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। সে ধর্মের জন্মলগ্নের কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধশ্রমণগণ নগ্নপদে ও মুণ্ডিতমস্তকে তৎকালীন সভ্যজগতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, এমন কি ল্যাপল্যাণ্ডের এক প্রান্ত থেকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অপর প্রান্ত অবধি তারা প্রচার করেছিল। এইভাবে বুদ্ধদেবের জন্মের অল্প কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই তারা নানাদেশে

ছড়িয়ে পড়েছিল এবং মূল ভারতভূখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম এক সময়ে দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নরনারীকে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত করেছিল।

তবে ভারতবর্ষ কখনও সমগ্রভাবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেনি। সে ধর্মের পরিধির বহির্ভাগেই ভারতবর্ষ চিরদিন দণ্ডায়মান ছিল। ফলে খ্রীষ্টধর্ম য়াহুদীদের মধ্যে যে পরিণতি লাভ করেছিল, অর্থাৎ অধিকাংশ য়াহুদী খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেনি—বৌদ্ধধর্মও ভারতবর্ষে অনুরূপ পরিণতিই লাভ করেছিল এবং এভাবেই প্রাচীন ভারতীয় ধর্মের ধারা অব্যাহত ছিল।

কিন্তু তুলনাটির পরিসমাপ্তি এখানেই। কারণ খ্রীষ্টধর্ম য়াহুদী জাতিকে নিজ পরিধির মধ্যে গ্রহণ করতে সমর্থ না হলেও সমগ্র দেশকে নিজ প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত করেছিল। যে-সব স্থানে প্রাচীন য়াহুদীধর্ম প্রচলিত ছিল—অতি অল্পকাল মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম সে-সব স্থানেও প্রবেশ করে তাকে যেন বাতিল করে দিয়েছিল।

সেজন্য প্রাচীন য়াহুদীধর্ম শুধু বিক্ষিপ্তভাবেই পৃথিবীর এখানে সেখানে টিকে থাকল। কিন্তু ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মরূপী শিশুটিকে তার প্রসূতি নিজেই যেন গ্রাস করে ফেলেছিল এবং আজ বুদ্ধের নামও যেন ভারতবর্ষে প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে আজ সে-দেশের অধিকাংশ নরনারী অপেক্ষা আপনারাই হয়তো বৌদ্ধধর্মের কথা বেশী অবগত আছেন। তারা বড়জোর সেই মহাপুরুষের নামটি মাত্র শ্রবণ করেছে। তিনি একজন বিশিষ্ট মহাপুরুষ ছিলেন, ভগবানের অবতার ছিলেন—এই পর্যন্ত সংবাদ তারা হয়তো রাখে, এর অতিরিক্ত আর কিছু নয়।

সিংহল অবশ্য আজও বুদ্ধদেবের সাম্রাজ্য, এবং হিমালয়ের কোন কোন অংশেও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা এখনও কিছু আছে। এ-ছাড়া ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। তবে ভারতের বাইরে, এশিয়ার বিভিন্ন অংশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃতি লাভ করেছিল। বৌদ্ধধর্মের অনুগামীদের সংখ্যাই পৃথিবীতে সর্বাধিক এবং এ-ধর্ম পরোক্ষভাবে অন্যান্য ধর্মের শিক্ষা ও অনুশাসনকে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিতও করেছে।

একদা বৌদ্ধধর্মের অনেক কিছু এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করেছিল। খ্রীষ্টধর্মে ও বৌদ্ধধর্মে প্রাধান্য এবং প্রভুত্ব নিয়ে অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামও একসময়ে বড় কম ছিল না।

খ্রীষ্টধর্মের আদিযুগে নষ্টিক (Gnostics) প্রমুখ যে-সব সম্প্রদায় উদ্ভূত হয়েছিল, তাদের আচার-আচরণ, মতি-গতি বৌদ্ধদেরই অনুরূপ ছিল। আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর বিচিত্র আবহাওয়ার মধ্যে রোমক আইনের অধীন যে ধর্মগত সংমিশ্রণ সাধিত হয়েছিল—তারই দানে খ্রীষ্টধর্মের উৎপত্তি হয়।

বৌদ্ধধর্মের রাজনৈতিক এবং সামাজিক দিক্—তার ধর্ম এবং আচার-আচরণাদি অপেক্ষা অধিকতর আকর্ষণীয়। এবং বিপুলশক্তিসম্পন্ন একটি বিশ্ববিজয়ী ধর্মরূপে তার যে প্রথম আত্মপ্রকাশ—তার মাধুর্যও কম নয়।

আজকের ভাষণে আমি মূলতঃ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্বন্ধেই আলোচনা করতে চাই। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব এবং তার প্রসার কতকাংশে অনুধাবন করতে হলেও—সে মহান্ ধর্মগুরুর আবির্ভাবকালে ভারতবর্ষের অবস্থা কেমন ছিল—সে-বিষয়ে কিছুটা ধারণা থাকা প্রয়োজন।

সেদিনের ভারতবর্ষে এক বহুবিস্তৃত বিরাট ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সে ধর্মের সুসম্বদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ—বেদ। বেদসমূহ বাইবেলের মত একটি গ্রন্থমাত্র ছিল না। পরন্তু নানা গ্রন্থের সমবায়ে বেদ ছিল একটি সাহিত্য-বিশেষ। অবশ্য বাইবেলও বিভিন্ন যুগের রচনার সমষ্টি, বিভিন্ন লেখকের হাতের সৃষ্ট সম্পদ। কিন্তু বেদ-সংগ্রহ অতি বিশাল। আর তার সব গ্রন্থ পাওয়াই যায় না, এমন কি তাদের সবগুলির নাম পর্যন্ত ভারতবর্ষেও কেউ অবগত নয়। কিন্তু যদি কোন প্রকারে সে-গ্রন্থের সবগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব হত, তবে এই প্রশস্ত কক্ষটিতেও তাদের স্থান সঙ্কুলান হত না।

সে এক বিরাট—এক বিপুল সাহিত্য-সংগ্রহ। সেই মহান্ শাস্ত্রকার শ্রীভগবানের কাছ থেকেই এই সাহিত্য বংশ-পরম্পরায় আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। সেজন্য ভারতবর্ষে শাস্ত্রবিষয়ক ধারণা অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী ছিল, গোঁড়ামিতে পূর্ণ ছিল।

আপনারা গ্রন্থপূজার গোঁড়ামি সম্পর্কে অভিযোগ করে থাকেন। কিন্তু এ সম্পর্কে হিন্দুর মনোভাব জানতে পারলে আপনারা কি ভাববেন—কে জানে? হিন্দু বিশ্বাস করে যে, বেদ প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত জ্ঞান। বেদসহায়েই এই বিশ্ব-চরাচর সৃষ্ট হয়েছে এবং বেদে নিহিত বলেই তাদের অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে। একটি গাভী এই স্থূল জগতে বিরাজ করছে, কারণ 'গাভী' শব্দটি বেদে রয়েছে। একটি মানুষ এই

পার্থিব জগতে বিদ্যমান, কারণ 'মানুষ' শব্দটি বেদমধ্যে উল্লিখিত আছে। এরই মধ্যে সেই মতবাদের জন্মসূত্র দেখা যায়—যেটি উত্তরকালে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিগণ বর্ধিত করেছিলেন এবং এইভাবে প্রকাশ করেছিলেন—'সৃষ্টির প্রারম্ভে ছিল শুধু শব্দ এবং শব্দ ঈশ্বর বা ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন ছিল।'—এ তত্ত্ব ভারতবর্ষের প্রাচীন তত্ত্ব; এ তত্ত্বের ভিত্তির উপরই শাস্ত্রের শক্তির ভাবরাশি দণ্ডায়মান। অবশ্য এ-কথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, শব্দ-মাত্রই ঐশী শক্তির আধার। বহির্বিশ্ব ভাবের মূর্তপ্রকাশ-স্বরূপ। সুতরাং প্রকাশমাত্রেই জাগতিক ক্ষেত্রে স্থূল প্রকাশ এবং শব্দমাত্রেই বেদ, আর সংস্কৃতই দেবভাষা। একদা দেবমুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল ভাষা। সে-ভাষা সংস্কৃত ভাষা অথবা দেবভাষা। সেজন্য ভারতীয়দের মতে সংস্কৃত ভিন্ন অন্য সকল ভাষাই নিম্নপর্যায়ের পশুকণ্ঠ-নিঃসৃত ভাষার মত। আর সে-সব ভাষাভাষীরাই 'ম্লেচ্ছ' শব্দে অভিহিত। গ্রীকদের পরিভাষায় 'বর্বর' শব্দটি যেমন, এ 'ম্লেচ্ছ' শব্দটিও (সংস্কৃত) সেইরূপ।

বেদসমূহ কোন ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয়, দেবতামণ্ডলীর সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় তারা বিদ্যমান। ভগবান্ অনন্ত, জ্ঞানও অনন্ত এবং সেই অনন্ত জ্ঞানসহায়েই জগতের সৃষ্টি হয়েছে। ঐ গ্রন্থেই জগতের সবকিছু বিধৃত, তার বাইরে কিছু নেই। মানুষের যত কিছু নীতিজ্ঞান, ভালমন্দ বিচার—সবই ঐ গ্রন্থের অনুশাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ ঐশ্বরিক জ্ঞানের ঊর্ধ্বে মানুষ উঠতে পারে না।—ভারতীয় গোঁড়ামির এই হল মূলকথা।

বেদের শেষাংশ উচ্চতম আধ্যাত্মিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ। আর প্রথমাংশ অপেক্ষাকৃত স্থূল।

বেদগ্রন্থ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেই 'এটি ভাল নয়, ওটি ভাল নয়'—এরূপ মন্তব্য আপনারা করে থাকেন। কিন্তু কেন? 'বহু অনভিপ্রেত এবং মন্দ অনুশাসন এর মধ্যে নিহিত আছে'। এইজন্য? তা হয়তো আছে। কিন্তু ওল্ড টেষ্টামেণ্টেও তো এ-জাতীয় ব্যাপার আছে। প্রাচীন গ্রন্থমাত্রেই এমন বহু বিচিত্র মত, বহু উদ্ভট চিন্তার উল্লেখ আছে, যা আজকের দিনে আমরা পছন্দ করব না।

'এ মতবাদটি ভাল নয়', 'আমার নীতিবোধে এটি বাধে'।

এ-জাতীয় উক্তির 'কারণ' সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করলে. অথবা কেন আপনার নীতিতে বাধে—এ কথা জিজ্ঞাসা করলে, উত্তর আসে—'না, এর মধ্যে কোন প্রশ্ন বা যুক্তির অবকাশ নেই।' ... এই যদি অবস্থা হয় তবে স্তব্ধ হও, দূরে সরে থাক।

বেদের যে নির্দেশ, সেটি পালন করাই বিধি। বেদ-নির্দিষ্ট ভাল-মন্দই শেষ কথা। সে-বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা মানুষের অধিকার-বহির্ভূত।

এখন বিপদ তো এইখানেই। বেদ-বিরোধী কোন উক্তির সমর্থনে কোন হিন্দুকে যদি কেউ বলে যে—'আমাদের বাইবেলে তো এ-কথা নেই।' তবে তন্মুহূর্তে উত্তর হবে—'ওঃ, তোমাদের বাইবেল? ও তো সেদিনের একটি অতি-আধুনিক ইতিহাস। বেদ ভিন্ন আবার শাস্ত্র কোথায়? গ্রন্থ কোথায়?' ভগবানই সর্বজ্ঞানের আকর। কাজেই পুনঃপুনঃ একাধিক বাইবেলের মাধ্যমে তিনি শিক্ষা দেবেন, এটা সম্ভব নয়। বেদগ্রন্থের মধ্য দিয়েই তাঁর শিক্ষার প্রথম প্রকাশ। সে কি তবে ভুল? মিথ্যা? উত্তরকালে উচ্চতর কোন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন বেদ বা বাইবেল তিনি সৃষ্টি করেছিলেন—এমন ঘটনা কি সম্ভব?

'বেদগ্রন্থের মত প্রাচীন গ্রন্থ আর নেই। অন্য সকল গ্রন্থই বেদের অনুগামী, বেদের অনুকরণে রচিত।' আপনাদের কথা তাঁরা গ্রহণ করবেন না। আবার খ্রীষ্টানগণও বাইবেল গ্রন্থটি দেখিয়ে বলবেন, ও-সকল উক্তি প্রতারণামাত্র। ভগবানের উক্তি অভ্রান্ত এবং তা একবার মাত্রই উচ্চারিত হয়ে থাকে।

এখন এ-সবই বিশেষভাবে চিন্তা করবার বিষয়। গোঁড়ামি অবশ্যই অতি বিষম বস্তু।

যদি কোন হিন্দুকে কোন সামাজিক সংস্কার-বিষয়ে আপনারা অনুরোধ করেন, যদি বলেন, 'এরূপ করা সঙ্গত' অথবা 'এরূপ করা সঙ্গত নয়', তবে উত্তরে সে বলবে, 'এ-সব কি আমাদের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে নির্দিষ্ট হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে, তবে ও-সবের জন্য আমাদের মাথাব্যথা নেই। কোন পরিবর্তন করবার পক্ষপাতী আমরা নই।' কয়েক শতাব্দী অপেক্ষা করলেই দেখতে পাবে যে, আমাদের ব্যবস্থাই কল্যাণপ্রদ।

যদি বলা হয়, ... 'তোমাদের সমাজপ্রতিষ্ঠানগুলি উৎকৃষ্ট নয়।' তবে সঙ্গে সঙ্গে তারও উত্তর আসবে—'বটে! তুমি সে-কথা জানলে কি ভাবে? তোমার অভিমতের ভিত্তিটি কি?আমাদের বিশ্বাস, আমাদের সমাজ-সংস্থাসমূহ তোমাদের সমাজব্যবস্থার তুলনায়

উন্নততর। অপেক্ষা করলে চার-পাঁচ শত বৎসরের মধ্যেই দেখতে পাবে যে, কালকে অতিক্রম করে আমরা দাঁড়িয়ে আছি আর তোমাদের মৃত্যু ঘটেছে।' ... এ-ধরনের কথাই তারা বলবে।

এই হচ্ছে উৎকট গোঁড়ামি আর ভগবানের আশীর্বাদে সে মহাসঙ্কট-সমুদ্র আমি অতিক্রম করেছি।

এই গোঁড়ামি ভারতবর্ষে ছিল। কিন্তু গোঁড়ামি ভিন্ন আর কি ছিল? ছিল— বিচ্ছিন্নভাব ও বিভাগ। সমগ্র সমাজটিই—আজকের মত বহু জাতি ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। আর সে-সব বিভাগ আজকের তুলনায় কঠোরতর ছিল।

আরও একটি ব্যাপার আছে লক্ষ্য করবার মত। অধুনা নূতন নূতন জাতিগোষ্ঠী সৃষ্টি করবার দিকে একটি প্রবণতা পাশ্চাত্ত্যেও এসেছে।

আমি নিজে অবশ্য জাতির বাইরে। জাতিগত বন্ধন ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি না। সে বন্ধন আমি ছিন্ন করেছি। জাতির ভাল দিকও অবশ্য কিছু আছে, কিন্তু ভগবান্ করুন—আমি যেন জাতিবন্ধনে আবদ্ধ না হই। 'জাতিগোষ্ঠী' শব্দে আমি কোন্ বস্তুটি বোঝাতে চাই—তা হয়তো আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন। কারণ মনুষ্যসমাজ অতি দ্রুত একে গ্রহণ করে থাকে। হিন্দুদের মধ্যে বৃত্তির উপরই জাতি নির্ভরশীল। প্রাচীনযুগে হিন্দুদের জীবনলক্ষ্য ছিল সুখ-শান্তিপূর্ণ সাবলীল এক জীবনধারা। কি উপায়ে জীবনের সব কিছু প্রাণময় হয়ে উঠতে পারে—এই প্রশ্ন। আর তার উত্তর—প্রতিযোগিতা। কিন্তু বংশগত বৃত্তি প্রতিযোগিতা নষ্ট করে দেয়। তুমি কাষ্ঠশিল্পী? সূত্রধর? উত্তম। তোমার পুত্র সূত্রধর হবে।

তুমি? তুমি কর্মকার? কর্মকার-বৃত্তি তো একটি জাতিগত বৃত্তি—অতএব তোমার পুত্রও কর্মকার হবে। ভারতবর্ষে এক বৃত্তির মধ্যে অন্য বৃত্তির কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। কাজেই নিরুপদ্রবে একটি বৃত্তি নিয়েই মানুষ জীবন-ধারণ করে।

তুমি যুদ্ধব্যবসায়ী, যোদ্ধা? অথবা তুমি পুরোহিত? উত্তম। তোমার বৃত্তির ভিত্তিতে একটি জাতি গড়ে তোল। পৌরোহিত্য বংশানুক্রমিক। অন্যান্য বৃত্তিও তাই। আবার নিরঙ্কুশ উচ্চক্ষমতা বা উচ্চাধিকারের কথা যদি চিন্তা করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, তারও একটি বিশেষ দিক্ আছে। সে দিকটি হচ্ছে এই যে, কোন প্রতিযোগিতা সে

বরদাস্ত করে না। তবে এরই ফলে এই জাতি-বিভাগের পরিণতিতেই—ভারতবর্ষ মহাকালের প্রভাব অতিক্রম করে বেঁচে রইল, আর অন্যান্য বহু জাতি বিলুপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু অন্যভাবে এর একটি মন্দ দিকও আছে। এতে ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ব্যাহত।

সূত্রধরের পুত্রকে কাঠের কাজই করতে হবে—তা সে পছন্দ করুক, আর নাই করুক।বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই এ ব্যবস্থা ভারতীয় শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ ছিল এবং সেই প্রাক-বৌদ্ধযুগের কথাই আমি এখন বলছি।

আধুনিক যুগের সমাজতন্ত্রবাদ এরই অনুকৃতি। এরও ফল হয়তো পরিণামে ভালই হবে, কিন্তু ক্ষতচিহ্ন একটা থেকে যাবে বৈকি। আমার মতে স্বাধীনতাই মূলকথা। ... মুক্ত হও। দেহে মনে ও আত্মায় পূর্ণ মুক্তি, পূর্ণ বন্ধনহীনতা—এই আমার আজীবন কামনা। ব্যক্তিগতভাবে আমি স্বাধীনতার সঙ্গে কোন মন্দ কাজ করতেও রাজী আছি, কিন্তু পরাধীনভাবে কোন সৎকাজ করতেও রাজী নই।

যাই হোক, বর্তমানে যে-সব বস্তুর জন্য পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা চীৎকার করছে—ভারতের অসংখ্য নরনারী বহু যুগ পূর্বেই তার অনুশীলন করেছে। ভূমি জাতীয় সম্পদে রূপান্তরিত হয়েছে। দৃঢ়বদ্ধ জাতিবিভাগও ভারতবর্ষে ধিক্কৃত ছিল। ভারতের মানুষ মনে-প্রাণে সমাজতন্ত্রবাদী। কিন্তু এরও ঊর্ধ্বে আর একটি সম্পদ ছিল ভারতবর্ষে; সে সম্পদ ব্যক্তিত্বের। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিধিনিষেধ আরোপের পরও তারা প্রচণ্ডভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিল। সব কিছুর জন্যই অবশ্য তারা নীতি-নিয়ম প্রণয়ন করেছে। পান, আহার, নিদ্রা, মৃত্যু—সবই সেখানে নিয়মে বিধৃত। অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করবার মুহূর্ত থেকে রাত্রিতে নিদ্রিত হবার কাল পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি কর্ম শাস্ত্রীয় বিধানে নিয়মিত। নিয়ম, নিয়ম, নিয়ম! এ-কথা কি চিন্তা করা যায় যে, একটা জাতি এমনি নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে? আইন তো প্রাণহীন। যে দেশে আইন যত বেশী সে দেশের অবস্থা তত মন্দ! সেজন্য ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ-কামনায় আমরা পাহাড়ে যাই, পর্বতে আত্মগোপন করি—যেখানে কোন আইন নেই, কোন সরকার নেই। যেখানে যত আইন, সেখানে তত পুলিস—তত দুর্জনের প্রাধান্য। আর দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে এই বিধিনিয়মের কড়াকড়ি প্রচণ্ড। যে মুহূর্তে একটি শিশুর জন্ম হল, সেই মুহূর্তে সে প্রথমে বর্ণের দাস হল, তারপর হল জাতির।দাসত্বশৃঙ্খলে সে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ হয়ে গেল। তার প্রত্যেকটি কাজ, তার আহার-বিহার, ওঠাবসা—সবই নিয়ন্ত্রিত হবে আইনে, নিয়মে।

আহারকালে গ্রাসে গ্রাসে তাকে প্রার্থনা করতে হবে, জল পান করতেও তাই। দিনের পর দিন—জীবনের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সর্বক্ষণ ও সর্বমুহূর্তে এমনি নিয়মাধীন হয়েই তাকে থাকতে হবে। ভাবতেও আশ্চর্য বোধ হয়। অব্যাহত এই প্রণালী অনন্ত কাল ধরে চলে আসছে।

কিন্তু তাঁরা চিন্তাশীল লোক ছিলেন—সন্দেহ নাই। তাঁরা জানতেন যে, এমন নিয়মাধীনতায় প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ হয় না, সেজন্য যথার্থ মুক্তিলাভের একটি ঋজুপথও তাঁরা উন্মুক্ত রেখেছিলেন। মোটের উপর বিধান এই ছিল যে, শুধু জাগতিক ক্ষেত্রে এবং সাংসারিক জীবনেই নিয়মাদি প্রযুক্ত হবে; কিন্তু যে-মুহূর্তে কেউ কাঞ্চনাসক্তি ত্যাগ করবে, জাগতিক সুখ বিসর্জন দেবে, তন্মুহূর্তে সে পূর্ণভাবে স্বাধীন হয়ে যাবে। কোন বিধিনিষেধ আর তার উপর প্রযুক্ত হবে না। এদের নাম সন্ন্যাসী, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তাঁরা অতীতে কিম্বা বর্তমানে—কোন কালেই কোন সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হননি। তাঁরা এক অনাসক্ত ও মুক্ত মানবগোষ্ঠী—পুরুষ ও নারী উভয়েই তাঁদের মধ্যে আছেন। তাঁরা কখনও বিবাহ করেন না, বিত্ত আহরণ করেন না। তাঁরা কোন নিয়মের অধীন নন, এমন কি বেদবিধি মেনে চলতেও তাঁরা বাধ্য নন। বেদশীর্ষে তাঁদের স্থান। আমাদের সমাজ-সংস্থার ঠিক বিপরীত বিন্দুতে যেন তাঁরা দণ্ডায়মান। জাতিগত বিধি-নিষেধে তাঁরা আবদ্ধ থাকেন না। তাঁদের নিয়মিত করবার মত কোন শক্তিই বিধি-নিষেধের নেই। তাদের সীমিত গণ্ডীকে অতিক্রম করেই সন্ন্যাসীর জীবন। শুধু দুইটি নিয়ম তাঁদের পক্ষে অবশ্য পালনীয়। তাঁরা চিরনিঃসম্বল থাকবেন, চিরকুমার থাকবেন। অর্থ তাঁদের থাকবে না, বিবাহ তাঁরা করবেন না। এই অবস্থায় সমাজের কোন নিয়ম বা অনুশাসন তাঁদের উপর প্রযুক্ত হবে না। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁরা বিবাহ করবেন অথবা অর্থোপার্জন করবেন—সেই মুহূর্তে সমাজের প্রত্যেকটি নিয়ম তাঁদের পক্ষে বাধ্যতামূলক হবে, অবশ্য পালনীয় হবে। এই সন্ন্যাসীরাই ছিলেন জাতির জীবন্ত দেবতা এবং এঁদের মধ্য থেকেই শতকরা নিরানব্বই জন মহাপুরুষ উদ্‌ভূত হয়েছিলেন।

যে-কোন দেশেই হোক, আত্মার পূর্ণ মহিমার উপলব্ধি ব্যক্তিত্বের চরমোৎকর্ষের উপর নির্ভর করে এবং সে উৎকর্ষ সমাজ-বন্ধনের মধ্যে উপলব্ধি করা যায় না। বিকাশোন্মুখ ব্যক্তির সমাজ-বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সেই বন্ধনকে সে ছিন্ন

করে ফেলতে চায়। যদি কোন সমাজ বাধাস্বরূপ হয়, তবে তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সে নিজেকে বিকশিত করতে চেষ্টা করে।

এই দুই বিপরীত শক্তির মাঝখানেই একটি সহজ পন্থা শেষ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে, যদি তুমি সমাজের বাইরে গিয়ে দাঁড়াও, যদি সংসার ত্যাগ কর, তবে তুমি যদৃচ্ছা প্রচার করতে পার, শিক্ষা দিতে পার। দূর থেকে আমরা শুধু তোমাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করব।

ফলে অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নর ও নারীর উদ্ভব তখন সম্ভব হয়েছিল এবং তাঁরাই সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। এমন কি সেই মুণ্ডিতমস্তক গৈরিক-বসনধারী সন্ন্যাসী উপস্থিত হলে রাজাও নিজ আসনে উপবিষ্ট থাকতে সাহসী হতেন না। তাঁকে আসন ত্যাগ করে দাঁড়াতে হত। এ যেমন একদিকে, অন্যদিকে, হয়তো আধ-ঘণ্টার মধ্যেই সেই সন্ন্যাসী এক অতি দরিদ্রের জীর্ণ কুটীরের সম্মুখে গিয়ে ভিক্ষার্থী হয়ে দণ্ডায়মান হতেন এবং এক টুকরা রুটি ভিক্ষা-স্বরূপ গ্রহণ করে প্রস্থান করতেন।

সমাজের সর্বস্তরের লোকের সঙ্গেই তাঁদের মেলামেশা ছিল। আজ হয়তো এক দরিদ্রের পর্ণকুটীরে সন্ন্যাসীর রাত্রিযাপন, আবার পরদিন রাজপ্রাসাদের মনোরম শয্যায় তাঁর সুখনিদ্রা। একদিন রাজগৃহে স্বর্ণপাত্রে তাঁর ভোজন, অন্যদিন সম্পূর্ণ অনাহারে এবং বৃক্ষতলে দিনযাপন। এই ছিল সন্ন্যাসীর জীবন। সমাজ এঁদের অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখত। কখনও কখনও নিজের ব্যক্তিত্ব প্রচার করতে গিয়ে কোন সন্ন্যাসী হয়তো উৎকট ধরনের কিছু করেও বসত। কিন্তু বৃহত্তর সমাজ তাতে ক্ষুব্ধ হত না, কিছু মনেই করত না। সে শুধু দেখতে চাইত—সন্ন্যাসীর মূল দুটি ধর্ম—পবিত্রতা ও ত্যাগব্রত অব্যাহত রয়েছে কিনা।

তাঁদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত প্রবল ছিল বলে তাঁরা নূতন চিন্তা এবং তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। নূতন দেশে তাঁরা যেতেন। পুরাতনের গণ্ডী অতিক্রম করে নূতনের সন্ধান তাঁদের করতে হত। নিয়মাবদ্ধ সমাজে সকলে চাইত পুরাতন গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকতে—একই ধরনে চিন্তা করতে। কিন্তু মানুষের নিগূঢ় প্রকৃতি এ ধরনের সংস্কারবদ্ধতা বরদাস্ত করে না। নির্বুদ্ধিতার চেয়ে মানুষের সদ্‌বুদ্ধি অধিক শক্তিশালী। দুর্বলতার চেয়ে সবলতাই অধিক ক্রিয়াশীল; অসদ্বস্তু থেকে সদ্বস্তু

সবলতর। সেইহেতু গণ্ডীবদ্ধ মানুষের একঘেয়েমী বজায় রাখবার চেষ্টা সফল হয়নি। যদি হত, যদি তারা সকল মানুষকে একই ধরনের চিন্তাধারায় গ্রথিত করতে সমর্থ হত, তবে আমরা জড়ত্বপ্রাপ্ত হতাম। চিন্তাজগতে আমাদের মৃত্যু হত।

বস্তুতঃ এখানে এমন একটি সমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, যার কোন জীবনীশক্তি ছিল না, যার সদস্যগণ নিয়মের লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। পরস্পরকে সাহায্য করতে তারা বাধ্য ছিল। নিয়ম-বন্ধন এত কঠোর এবং নির্মম ছিল যে, কোন কাজই নিয়ম-বহির্ভূত হবার উপায় ছিল না। কিভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে হবে, কিভাবে হাতমুখ প্রক্ষালিত হবে, এক কথায়, জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি—সবই নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল।

আর, এ-সব গণ্ডীবদ্ধতার বাইরে ছিল সন্ন্যাসীর অদ্‌ভুত ব্যক্তিস্বাধীনতা। আর সেই শক্তিশালী সন্ন্যাসীদের মধ্য থেকেই নিত্যনূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হচ্ছিল। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এঁদের স্বাতন্ত্র্যের কথা উল্লিখিত হয়েছে। একটি নারীর এরূপ কাহিনী আছে, তিনি বয়স্কা ছিলেন। তাঁর ধরন-ধারণ একটু অস্বাভাবিক রকমের ছিল। কিন্তু নিত্যনূতন চিন্তার অবতারণা তিনি করতে পারতেন। তাঁকে অবশ্য অনেকে অনেক সময় সমালোচনা করত। আবার তাঁকে সমীহও করত, নীরবে তাঁর নির্দেশ পালনও করত। এ-ধরনের নরনারী প্রাচীনযুগে একাধিক ছিলেন।

আবার সেই নিয়মবদ্ধ সমাজে ক্ষমতা ছিল পুরোহিত-শ্রেণীর হস্তে। সমাজের স্তরবিন্যাসে—বর্ণশ্রেষ্ঠ যাঁরা, তাঁদের মধ্য থেকেই পুরোহিত হতেন এবং তাঁদের যে কাজ ছিল—তাতে 'পুরোহিত' শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দে তাঁদের অভিহিত করা যায় বলেও আমার মনে হয় না। অবশ্য এদেশে যে-অর্থে 'পুরোহিত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, আমাদের দেশে সে অর্থে ব্যবহৃত হত না। পুরোহিতগণ ধর্ম বা দর্শন শিক্ষা দিতেন না। সমাজে নির্দিষ্ট বিধিবিধানসমূহ যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা, সেটি দেখা এবং সে-বিষয়ে সাহায্য করাই তাঁদের কাজ ছিল। বিবাহ দেওয়া, শ্রাদ্ধ-শান্তিতে উপাসনা করাও তাঁদের কাজ ছিল। ফলকথা, সমাজের ক্রিয়াকর্মে, উৎসবানুষ্ঠানে পুরোহিতের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। সমাজব্যবস্থায় গার্হস্থ্য ছিল শ্রেষ্ঠ আশ্রম। প্রত্যেককেই বিবাহ করতে হবে—এই ছিল অনুশাসন। বিবাহ ভিন্ন কোন ধর্মানুষ্ঠানে অধিকার জন্মাত না। অবিবাহিত পুরুষ বা নারী পূর্ণ মানুষ বলে বিবেচিতই হত না! অবিবাহিত পুরোহিতেরও ক্রিয়াকর্মে অধিকার থাকত না। অবিবাহিত ব্যক্তি সমাজে বেমানান বলেই বিবেচিত হত।

এ-কালে পুরোহিতের ক্ষমতা খুব বেড়েছিল। যাঁরা সমাজপতি, আইন-প্রণয়ন যাঁদের কাজ, তাঁদের নীতিই এমন ছিল, যাতে পুরোহিতগণ সমাজে যথেষ্ট সম্মান লাভ করেন। এদেশেরই মত একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাঁদের মধ্যেও ছিল, যার প্রভাব পুরোহিতবর্গের হাতে অধিক অর্থ যেতে পারত না। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, পুরোহিতদের, সামাজিক মর্যাদাই বড় হোক, আর্থিক মর্যাদা নয়।

এ-কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, পুরোহিতগণ সব দেশেই মর্যাদা ও সম্মান পেয়ে থাকেন। ভারতবর্ষে আবার সে মর্যাদা এত বেশী ছিল যে, অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণও আজন্ম সামাজিক মর্যাদায় রাজা অপেক্ষা উন্নত। সমাজব্যবস্থা তাঁকে চিরদারিদ্র্যে নিষ্পেষিত করবে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁকে সম্মান দেবে প্রচুর। তাঁদের জন্য বাধানিষেধ ছিল সহস্র ধরনের। আবার যার বর্ণ যত উচ্চ, তার ভোগ-সুখের পথে বিধিনিষেধ ছিল তত কঠিন। তাছাড়া, উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের আহারাদির উপরও প্রচুর নিয়মবিধি আরোপিত ছিল। বর্ণ যত উন্নত হবে, আহারাদির ব্যবস্থা তত কঠোর হবে এবং আহার্য-বস্তুনিচয়ের সংখ্যা তত সীমাবদ্ধ হবে। জীবনধারণের জন্য যে-সকল বৃত্তি তাঁরা অবলম্বন করতে পারবেন, সেগুলিও অতি অল্প কয়েকটি বৃত্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এই ছিল ব্যবস্থা। আপনাদের কাছে তাঁদের জীবন একটি অন্তহীন কঠোরতার নিদর্শন বলে মনে হবে। আহারে, বিহারে, পানে, গ্রহণে—সর্বক্ষেত্রেই অফুরন্ত বিধিনিষেধ।

আবার সে-সব বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করলে যে-সকল শাস্তির ব্যবস্থা ছিল, তাও নিম্নতর বর্ণের থেকে ব্রাহ্মণের পক্ষে বহুগুণ নির্মম ছিল। একজন নিম্নবর্ণের লোকের জন্য মিথ্যাভাষণের দণ্ড যতি হত এক টাকা, তবে ব্রাহ্মণের পক্ষে—তাঁর উচ্চতর জ্ঞানের জন্য দণ্ড হত শতগুণ।

প্রারম্ভিক অবস্থায় অবশ্য ব্যবস্থাটি অতি সুন্দর ছিল। কিন্তু উত্তরকালে এমন একটি সময় উপস্থিত হল, যখন এই পুরোহিত-সম্প্রদায় প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হলেন এবং তখনই তাঁরা এই মূল কথাটি বিস্মৃত হলেন যে, তাঁদের ক্ষমতার রহস্য দারিদ্র্যের মধ্য নিহিত; বিস্মৃত হলেন যে, তাঁরা এমন একটি মানবগোষ্ঠী, যাঁরা গভীরভাবে অধ্যয়ন করবেন, চিন্তা করবেন—এবং সে সুযোগ দানের জন্যই সমাজ তাঁদের আহার, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতির যাবতীয় দায়িত্ব বহন করবে। কিন্তু কালক্রমে তাঁদের ভোগ-পিপাসা

জাগ্রত হল এবং অর্থলাভের জন্যও তাঁরা হাত বাড়াতে লাগলেন। আপনাদের পরিভাষায় যাদের 'অর্থগৃধ্নু' 'money-grabbers' বলে—তাঁরা তাই হয়ে উঠলেন এবং অন্য সব কিছু বিস্মৃত হলেন।

ব্রাহ্মণের পর দ্বিতীয় জাতি হল ক্ষত্রিয়। যুদ্ধ এবং রাজ্যশাসন—এই ছিল তাঁদের কাজ। প্রকৃত ক্ষমতা এঁদেরই হস্তে ন্যস্ত ছিল। আর তাঁদের মধ্য থেকেই আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের উদ্ভব হয়েছে, ব্রাহ্মণদের মধ্যে থেকে নয়। সেও এক বিচিত্র ব্যাপার। অবতারপুরুষ বলে আমাদের সমাজে যাঁরা পূজিত, তাঁদের সকলেই ক্ষাত্রকুলোদ্ভব, একটিও ব্যতিক্রম নেই। মহামনীষী শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ঐ ক্ষত্রিয়কুল থেকে। রামচন্দ্রও ক্ষাত্রকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমাদের দেশের খ্যাতনামা দার্শনিকগণ প্রথমে রাজসিংহাসনে উপবেশন করেছেন এবং রাজসিংহাসন থেকেই ত্যাগব্রতী দার্শনিকদের উদ্ভব হয়েছে। আবার ঐ রাজসিংহাসন থেকেই নিয়ত এ-আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে—'ত্যাগ কর, ত্যাগ কর'।

যুদ্ধব্যবসায়ীরা দেশের শাসনকর্তা, তাঁরাই দার্শনিক, তাঁরাই উপনিষদের প্রবক্তা।চিন্তায়, ধীশক্তিতে পুরোহিতবর্গ অপেক্ষা এঁরা উন্নত ছিলেন। ক্ষমতাও এঁদেরই অধিক ছিল, কারণ এঁরাই ছিলেন রাজা। অথচ আধিপত্য করতেন পুরোহিতগণ এবং ভীতিপ্রদর্শনের চেষ্টাও তাঁরা করতেন। ফলে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়—এই দুই বর্ণের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছিল।

আরও একটি ব্যাপার আছে। আপনাদের মধ্যে যাঁরা আমার প্রথম ভাষণটিতে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা অবগত আছেন যে, ভারতবর্ষে দুইটি বৃহৎ মানবগোষ্ঠী বিদ্যমান—একটি আর্য, অপরটি অনার্য। আর্যদের মধ্যে আবার তিনটি বর্ণ আছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। এই তিন বর্ণের বাহিরে যে জনসমষ্টি, সেটি সমগ্রভাবে 'শূদ্র' নামে অভিহিত, আর্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তই তারা নয়। বহু বিদেশী পর্যটক বাহির থেকে এসে এই শূদ্রদেরই দেখেছে। তারাই ছিল দেশের আদিবাসী। যাই হোক, কালক্রমে অনার্যগোষ্ঠীর বিপুল জনসমষ্টি এবং আরও যারা নানাজাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত হয়ে অনার্য জাতির দেহে মিশে গেল, তারা সবাই ক্রমশঃ সভ্য হয়ে উঠতে লাগল এবং আর্যদের অনুরূপ অধিকার-লাভের জন্য প্রয়াসী হল।

তারা শিক্ষালাভের জন্য আর্যদের মত বিদ্যায়তনে প্রবেশ করতে চাইল; উপবীত ধারণ করতে চাইল; ক্রিয়া, কর্ম ও উৎসবের অধিকার চাইল। ধর্ম এবং রাজনীতিতেও সমান অধিকার দাবী করল।

অবশ্য পুরোহিতগণ স্বভাবতই এ দাবীর বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করলেন। পৃথিবীর সর্বদেশেই পুরোহিতবর্গের এই রীতি। তাঁরা স্বতই অত্যন্ত গোঁড়া হয়ে থাকেন। আর যতদিন পৌরোহিত্য একটি বৃত্তি থাকবে, ততদিন এ গোঁড়ামি থাকবেই। কারণ তাঁদের নিজ স্বার্থের খাতিরেই এ গোঁড়ামির প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং অনার্যগোষ্ঠীর সে দাবী এবং বিক্ষোভ দমন করবার জন্য পুরোহিতগণ সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। আবার আর্যগোষ্ঠীর মধ্যেও প্রবল ধর্মবিক্ষোভ দেখা দিল এবং সে বিক্ষোভ পরিচালনা করলেন ঐ ক্ষত্রিয়গণ।

আরও এক সনাতনপন্থী সম্প্রদায় ছিল ভারতবর্ষে—সে জৈন সম্প্রদায়। সে সম্প্রদায় অত্যন্ত গোঁড়াও বটে, প্রাচীনও বটে। হিন্দুশাস্ত্র বেদের প্রামাণিকতাই এরা অস্বীকার করেছিল। তারা নিজেরা কিছু কিছু ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেছিল এবং এ-কথাও ঘোষণা করেছিল যে, তাদের প্রণীত গ্রন্থাদিই যথার্থ বেদ। আর যেগুলি বেদ-নামে প্রচলিত—সেগুলি সর্বসাধারণকে প্রতারিত করবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণরা রচনা করেছিল। অবশ্য তাদের কর্মপন্থাও ঐ একই ধরনের ছিল।

এ-কথা মনে রাখতে হবে যে—নিজ ধর্মগ্রন্থ বিষয়ে হিন্দুদের যে যুক্তি, সে যুক্তি নিরসন করা সহজসাধ্য নয় এবং সেজন্য জৈনদের দাবীও হিন্দুদেরই অনুরূপ ছিল। অর্থাৎ তাদের ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমেই সৃষ্টির প্রকাশ হয়েছে। আর সর্বসাধারণে প্রচলিত যে ভাষা, শাস্ত্রগ্রন্থগুলিও সেই ভাষাতেই রচিত।

তখনই সংস্কৃত আর কথ্যভাষা ছিল না। তার সঙ্গে তৎকালীন কথ্যভাষার সম্পর্ক অনেকটা সেই রকম হয়ে উঠেছিল, যেমন সম্পর্ক দেখা যায়—বর্তমান ইতালীয় ভাষার সঙ্গে প্রাচীন লাতিন ভাষার। জৈনধর্মাবলম্বিগণ পালিভাষায় নিজ শাস্ত্রগ্রন্থাদি রচনা করেছিল, সংস্কৃত ভাষায় নয়। কারণ তারা বলত সংস্কৃত আর সজীব ভাষা নয়, ওটি মৃতভাষার পর্যায়ভুক্ত।

তাদের আচার-প্রণালীতেও তারা ছিল স্বতন্ত্র। তাদের আচার-পদ্ধতিতেও তারা স্বতন্ত্র ছিল। বস্তুতঃ হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র এই বেদ এক বিশাল শাস্ত্র-সংগ্রহ। এর কতকাংশ একেবারে স্থূল ও অসার, অপরাংশ আধ্যাত্মিক তত্ত্বে পূর্ণ—এ-অংশ থেকেই ধর্মজ্ঞান লাভ হতে পারে। আর এ-সব সম্প্রদায়ের সকলেই বেদের ঐ অংশটুকই প্রচার করে বলে দাবী করে থাকে।

প্রাচীন-বেদে আবার তিনটি স্তরবিভাগ দেখা যায়। প্রথমে কর্ম, দ্বিতীয়তঃ উপাসনা এবং তৃতীয়তঃ জ্ঞান। কর্ম এবং জ্ঞান দ্বারা নিজেকে পরিশুদ্ধ করলেই ভগবান্ মানুষের অন্তরে প্রতিভাত হবেন। তিনি যে নিরন্তর অন্তরেই অধিষ্ঠিত—এ-উপলব্ধিও তখন তার হবে। অন্তরের বিশুদ্ধতার ফলেই এ-উপলব্ধি সম্ভব হয়। শুধু কর্ম এবং উপাসনার দ্বারাই মন পবিত্র হতে পারে। সেই একমাত্র পন্থা। মুক্তি তখন করায়ত্ত হয়। অতএব কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান—এই তিনটি সোপান-বিশেষ। যে সম্প্রদায়ের কথা বলছি, তাঁদের বিচারে কর্মের অর্থই অপরের উপকার-সাধন। এ-কথার তাৎপর্য অবশ্যই একটি আছে। কারণ ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে কর্মের অর্থই ছিল বিস্তৃত উৎসবানুষ্ঠান—গো, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি পশুবলি অথবা অন্যবিধ প্রাণীদের যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি-প্রদান।

এখন জৈনধর্মাবলম্বিগণ এ-সব কর্মের বিরুদ্ধে কঠিন মত প্রকাশ করত। তারা বলত যে, এ-সব কর্ম কর্মই নয়। অন্যকে আঘাত দেওয়া কখনও সৎকার্য হতে পারে না। পরন্তু এ-সব কর্মে এ-কথাই প্রমাণ করে যে, ব্রাহ্মণদের বেদ মিথ্যা; সেটি পুরোহিতদের তৈরী একটি পুস্তকমাত্র। কারণ কোন মহৎ গ্রন্থ মানুষকে প্রাণিহত্যা করতে নির্দেশ দেবে—এটা অসম্ভব, এটা অবিশ্বাস্য। অতএব প্রাণিহত্যা, পশুবলি প্রভৃতির যে-সব নির্দেশ বেদে লিপিবদ্ধ রয়েছে, সেগুলি ব্রাহ্মণদেরই রচনা। কারণ সেগুলি তাদেরই স্বার্থের অনুকূল, তাদেরই অর্থাগমের সহায়ক। কাজেই সে-সবই পুরোহিতদের কৌশলমাত্র।

জৈনদের আর একটি মত হচ্ছে এই যে, ভগবানের কোন অস্তিত্ব নেই। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য, আর সেই সূত্রে ধনসম্পদ সংগ্রহ করার জন্য পুরোহিতদেরই সৃষ্টি—এই ভগবান্। সবটাই এক বিরাট ধাপ্পা। অস্তিত্ব আছে প্রকৃতির, অস্তিত্ব আছে আত্মার। ব্যস্, আর কিছু নেই, ভগবান্ অবাস্তব—অস্তিত্বহীন।

এ-জীবনটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে আত্মা জড়িয়ে পড়েছে। দেহ যেন একটি বহির্বাসরূপে তাকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। সুতরাং সৎকর্মের অনুষ্ঠান করে যাও। সেটিই পথ।

এদের মতবাদ থেকেই জড়বস্তুর হেয়ত্ব প্রতিপাদিত হয়েছিল। এরাই জগতে কৃচ্ছ্রসাধনার প্রথম শিক্ষক। অপরিশুদ্ধতা থেকেই যদি দেহের জন্ম হয়, তবে দেহটি কোন উৎকৃষ্ট বস্তু নয়। যদি কেউ কিছুকাল এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে—উত্তম, সেটি তার শাস্তিস্বরূপ হয়ে গেল। যদি অকস্মাৎ দেয়ালে মাথাটি ঠুকে যায়, তবে সেটিও একটি আকাঙ্ক্ষিত শাস্তিমাত্র।

একদা ফ্রান্সিস্কান সম্প্রদায়ের কতিপয় নেতৃস্থানীয় পুরুষ—সেণ্ট ফ্রান্সিস তাঁদের অন্যতম—কোন ব্যক্তি-বিশেষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাত্রা করেছিলেন। সেণ্ট ফ্রান্সিসের সঙ্গে একজন সহযাত্রী পথ চলছিলেন। কথা হচ্ছিল এই নিয়ে যে, যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তাঁরা যাচ্ছেন, তিনি তাঁদের অভ্যর্থনা করবেন কিনা, তাঁদের সঙ্গে বাক্যালাপ করবেন কিনা। সহযাত্রীটি বললেন, খুব সম্ভব তিনি আমাদের অভ্যর্থনা করবেন না—প্রত্যাখ্যান করবেন। তদুত্তরে সেণ্ট ফ্রান্সিস বলেছিলেন, ‘তাঁর প্রত্যাখ্যানই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়, বন্ধু! যদি দ্বারে আমাদের করাঘাত শুনে তিনি বেরিয়ে আসেন এবং আমাদের দূর করে তাড়িয়ে দেন, তবে সেটাও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে না; অথবা তিনি যদি আমাদের হাত-পা বেঁধে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করেন, তাহলে সেটিও পর্যাপ্ত হল বলে আমি মনে করব না; তবে যদি আমাদের হাত-পা সব দৃঢ়ভাবে বেঁধে, বেত্রাঘাতে প্রতি লোমকূপ থেকে রক্তমোক্ষণ করিয়ে তিনি আমাদের ঘরের বাইরে বরফের মধ্যে ফেলে রাখেন, তবে সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য- লাভের পক্ষে পর্যাপ্ত হতে পারে।’

এমনি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার একটি মনোভাব সে-যুগে বিদ্যমান ছিল।

বস্তুতঃ জৈনরাই ছিল কৃচ্ছ্রসাধনার পথিকৃৎ। তবে সেই সঙ্গে তারা কিছু কিছু মহৎকার্যও সম্পন্ন করেছিল। তাদের কথা ছিল—কাউকে আঘাত কর না, দুঃখ দিও না, যথাশক্তি অপরের উপকার সাধন কর। এই কর্ম, এই নীতি ও সদাচার—এ-ছাড়া আর যা কিছু সবই ব্রাহ্মণদের হাতে গড়া বাজে জিনিষ; সেগুলি বর্জন কর।

এই মতবাদের ভিত্তিতেই তারা কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিল এবং এটিকেই নানাভাবে পূর্বাপর তারা বিস্তৃত করেছিল। সে এক বিচিত্র আদর্শ। শুধু অ-বৈরী ও পরোপকারের ভিত্তিতে সকল নৈতিক আদর্শকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া—একটি অভিনব আদর্শ বৈকি!

বুদ্ধদেবের অন্ততঃ পাঁচশত বৎসর পূর্বেকার এই সম্প্রদায়। আবার বুদ্ধদেবও খ্রীষ্টের জন্মের সাড়ে-পাঁচশত বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। এরা সমগ্র প্রাণিজগৎকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছিল। তাদের মধ্যে সর্ব নিম্নস্তরের যে জীব, তার মাত্র একটি ইন্দ্রিয় বর্তমান, সেটি স্পর্শেন্দ্রিয়। তার উপরের স্তরে রয়েছে স্পর্শ ও আস্বাদন-ইন্দ্রিয়। তারও উপরে—স্পর্শ-স্বাদ এবং শ্রবণেন্দ্রিয়। চতুর্থ স্তরে আবার—পূর্বের তিনটির সঙ্গে দর্শনেন্দ্রিয় যুক্ত হয়।আর সর্বশেষ স্তরে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সবই বর্তমান থাকে।

এক বা দুই ইন্দ্রয়বিশিষ্ট যে-সব প্রাণী—তারা চর্মচক্ষে দৃশ্যমান নয়। তারা জলমধ্যে অবস্থান করে। এদের—এই অতি-নিম্নপর্যায়ের প্রাণীদের হত্যা করা অতি ভয়াবহ কার্য।

এ-যুগে প্রাণিজগতের এ-সকল তত্ত্ব অতি অল্পদিন আগে মাত্র জানা গেছে। তৎপূর্বে এ-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা ছিল না। জৈনদের মত এই ছিল যে, সর্ব নিম্নস্তরে প্রাণীদের এক স্পর্শানুভূতি ভিন্ন আর কিছু নেই। তার উপরের স্তরের প্রাণীরাও অদৃশ্য। জৈনরা জানত যে, এ-সব প্রাণী শুধু জলেই বাস করে এবং জল ফুটালে এরা মারা যায়। কজেই জৈনসন্ন্যাসীরা তৃষ্ণায় মরে গেলেও নিজেরা জল ফুটিয়ে পান করতেন না। কিন্তু ভিক্ষার্থী হয়ে কোন গৃহে গেলে গৃহস্থ যদি জল পান করতে দিত, তবে সে জল তাঁরা গ্রহণ করতেন। কারণ সেক্ষেত্রে প্রাণিহত্যার দায় ছিল গৃহস্থের, আর জল পানের সুবিধাটুকু মাত্র ছিল তাঁদের নিজেদের।

অহিংসার ধারণাটিকে এরা ক্রমশ এক হাস্যকর পর্যায়ে নিয়ে দাঁড় করিয়েছিল। যেমন—স্নানের সময় শরীর মার্জনা করলে অসংখ্য অদৃশ্য জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায় মনে করে এরা স্নানই করত না। এরা নিজেরা মরতে প্রস্তুত ছিল। কারণ মৃত্যু এদের কাছে এক অতি তুচ্ছ পরিণতি ছিল। আর অপর কোন প্রাণীকে হত্যা করে বেঁচে থাকতেও এরা প্রস্তুত ছিল না।

এদেরই সমসাময়িক কালে আরও নানা কৃচ্ছসাধন-পরায়ণ সম্প্রদায় ছিল এবং এই কৃচ্ছসাধনার কালেই পুরোহিত এবং রাজন্যবর্গের মধ্যে রেষারেষি ও রাজনৈতিক বিদ্বেষ দানা বেঁধে উঠেছিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে নানা বিক্ষুদ্ধ সম্প্রদায়েরও উদ্ভব হয়েছিল।

আরও কঠিন সমস্যা ছিল জনসাধারণকে নিয়ে। কারণ এ-কালেই জনসাধারণ সর্ববিষয়ে আর্যদের সম-অধিকার দাবী করছিল। প্রকৃতির নিত্য-প্রবহমান স্রোতস্বিনীর তীরে দাঁড়িয়ে জল পানের অধিকার থেকে চিরবঞ্চিত হওয়া তাদের পক্ষে যেন ক্রমশঃ অসহনীয় হয়ে উঠেছিল।

এই মহাসন্ধিক্ষণেই সেই বিরাট পুরুষ বুদ্ধদেবের জন্ম হয়েছিল। তাঁর জীবন এবং চরিতকথা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। নানা অলৌকিক ঘটনা বা কাহিনীতে মণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও—যা মহাপুরুষ মাত্রেরই জীবনে হয়ে থাকে—বুদ্ধদেব জগতের ইতিহাস-স্বীকৃত মহাপুরুষগণের অন্যতম। বস্তুতঃ এদিক থেকে মাত্র দুজন মহাপুরুষের নামই উল্লেখ করা যেতে পারে, যাঁদের সম্বন্ধে শত্রু-মিত্র উভয়েই একমত, একজন সুপ্রাচীন বুদ্ধদেব, অপরজন হজরত মহম্মদ। সুতরাং এঁদের উভয়ের সম্বন্ধেই আমরা সম্পূর্ণ নিঃসংশয়। অন্যান্য মহাপুরুষ সম্বন্ধে তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের উক্তি ভিন্ন আর বিশেষ কিছু আমাদের হাতে নেই।

আমাদের শ্রীকৃষ্ণের বিষয় আপনারা জানেন। হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে অবতার-পুরুষরূপে তিনি পূজিত। তাঁর কাহিনী বহুলাংশে আখ্যান-চরিত মাত্র।

শুধু তাঁর অনুগামী শিষ্যগণই তাঁর জীবনের অধিকাংশ কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এর ফলে, অনেক সময় একই ব্যক্তির মধ্যে যেন একাধিক ব্যক্তি মিশ্রিত হয়ে পড়েছে।বস্তুতঃ বহু অবতারপুরুষ সম্বন্ধেই আমরা খুব বেশী কিছু জানি না। কিন্তু বুদ্ধদেবের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। কারণ শত্রু ও মিত্র—উভয়পক্ষই তাঁর কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আরও একটি কথাঃ মহাপুরুষদের জীবনের সঙ্গে যত কাহিনী, যত অলৌকিক গল্প ও উপাখ্যান জড়িত হয়, সেগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাহ্য কাহিনীসমূহের অন্তরালে প্রত্যেকেরই একটি নিজস্ব সত্তা, একটি আভ্যন্তরীণ স্বকীয়তা থাকে। কিন্তু এ মহাপুরুষটির জীবনে কোন স্তরে কোন সময়ে স্বকীয় প্রয়োজনে কোন প্রয়াস দেখা যায় না। এর দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে

এই যে, যখনই কোন মহাপুরুষকে অবলম্বন করে কোন আখ্যায়িকা রচিত হয়, তখনই সেই মহাপুরুষের মাহাত্ম্য ও মহিমায় সেটি অনুরঞ্জিত হয়ে থাকে। বুদ্ধদেবের বেলায়ও তাই হয়েছিল সত্য; কিন্তু তাঁর জীবন বা চরিত্র নিয়ে যত উপাখ্যান রচিত হয়েছে, তার কোনটিতে কোথাও কোন অসদাচরণ বা নীচকার্যের ইঙ্গিত নেই। এমন কি তাঁর বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁর প্রশংসাই করেছে।

জন্মলগ্ন থেকেই বুদ্ধ এত পবিত্র ছিলেন, এত নির্মল ছিলেন যে, যে-ই তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করেছিল, সে-ই আনুষ্ঠানিক ধর্ম পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং পরিত্রাণ লাভ করেছিল। ফলে দেবতাগণ এক সভা আহ্বান করে নিজেদের অসহায় অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন। কারণ যাগযজ্ঞের উপরই ছিল দেবতাদের নির্ভর, যজ্ঞভাগই ছিল দেবতাদের প্রাপ্য। আর বুদ্ধের প্রভাবে সেই যাগযজ্ঞই বিলুপ্ত হয়েছিল। ফলে একদিকে দেবতাদের আহার যেমন বন্ধ হয়েছিল, অন্যদিকে তাঁদের প্রভাবও তেমনি বিলুপ্ত হয়েছিল। সুতরাং দেবতাগণ তখন এ-কথাই ঘোষণা করেছিলেন, ‘যেমন করেই হোক, বুদ্ধকে পতিত করতে হবে। তাছাড়া আমাদের আর কোন গতি নেই। তার পবিত্রতা আমাদের পক্ষে দুঃসহ।’

এ-সিদ্ধান্তের পরই দেবতামণ্ডলী বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, ‘হে সৌম্য, তোমার কাছে আমাদের একটি নিবেদন আছে। আমরা একটি মহাযজ্ঞের সঙ্কল্প করেছি। সেজন্য একটি বিরাট অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করতে হবে। কিন্তু সমস্ত পৃথিবী অনুসন্ধান করেও এমন একটি পবিত্র স্থান আমরা বের করতে পারলাম না, যেখানে সে অগ্নি প্রজ্বলিত করা যায়। তবে এখন সে স্থানের সন্ধান আমরা পেয়েছি। তুমি যদি নিজ বক্ষদেশ উন্মুক্ত করে শয়ন কর, তবে তোমারই বুকের উপর আমরা অগ্নিকুণ্ড স্থাপন করতে পারি।’

বুদ্ধ বললেন, ‘তাই হবে। আপনারা যজ্ঞ আরম্ভ করুন।’ দেবগণ বুদ্ধের বুকের উপর বিশাল অগ্নি প্রজ্বলিত করলেন এবং ভাবলেন যে, অগ্নির উত্তাপে বুদ্ধের মৃত্যু হবে। কিন্তু তা হল না। বুদ্ধ মরলেন না। তখন দেবতাগণ একান্ত হতাশ হলেন এবং তাঁদের হাতাশার ভাব সর্বত্র প্রকাশ করতে লাগলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে পুনঃপুনঃ বুদ্ধদেবকে কঠিন আঘাত করতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। বুদ্ধকে হত্যা করা গেল না।

তখন সে অগ্নিকুণ্ডের নীচ থেকে এই প্রশ্ন শব্দিত হলঃ ‘আপনারা এ বৃথা শ্রম করছেন কেন? আপনাদের উদ্দেশ্য কী?’ উত্তর হল, ‘তোমার পবিত্র মুখমণ্ডলের দিকে যে-ই দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সে-ই শুদ্ধ হয়ে যায়, আর কেউ আমাদের উপাসনা করে না, সেজন্য তোমার ধ্বংস আমরা কামনা করছি।’

তদুত্তরে বুদ্ধ বললেন, ‘তাহলে আপনাদের পরিশ্রম বৃথা। পবিত্রতা কখনও ধ্বংস হয় না।’

এই কাহিনী বুদ্ধের বিরুদ্ধবাদীদের রচনা। অথচ এর মধ্যেও বুদ্ধচরিতের প্রতিকূলে শুধু এই দোষটুকুই আরোপিত হয়েছে যে, তিনি এক অদ্‌ভুত ধরনের পবিত্রতা প্রচার করেছিলেন। আর কিছু নয়। বুদ্ধের মতবাদ সম্বন্ধে আপনাদের অনেকে কিছু কিছু অবগত আছেন।

বর্তমান কালের যে-সব চিন্তাশীল মনীষী অজ্ঞেয়বাদী বলে পরিচিত, তাঁদের কাছে বুদ্ধের মতবাদের বিশেষ একটি আবেদন আছে। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের মহান্ প্রবক্তা ছিলেন বুদ্ধদেব। তাঁর কথা এই ছিলঃ ‘আর্য-অনার্য-নির্বিশেষে জাতি-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে—প্রত্যেক মানুষের অধিকার রয়েছে ধর্মের উপর, অধিকার রয়েছে ঈশ্বরের উপর, স্বাধীনতার উপর।অতএব সে-অধিকারের ক্ষেত্রে সকলকেই আমি আহ্বান করি।’

কিন্তু এ-ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন কঠোর অজ্ঞেয়বাদী। বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন হতেই তিনি সর্বদা উপদেশ দিতেন। একদা পাঁচজন তরুণ—সকলেই ব্রাহ্মণ—একটি প্রশ্নের উপর তর্ক-বিতর্ক করতে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিল। ‘সত্য-লাভের পথ কি?’—এই ছিল তাদের প্রশ্ন। তাদের একজন বলল, ‘আমাদের মতে—এইটি সত্যের পথ। আমার পূর্ব- পুরুষগণ এ-কথাই প্রচার করেছেন।’

আর একজন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, ‘আমি কিন্তু অন্যরূপ শিক্ষা লাভ করেছি, এবং আমার বিশ্বাস আমাদের নির্দিষ্ট পথটিই সত্যলাভের একমাত্র পথ।’

‘হে আচার্য—এখন এর মধ্যে কোন্‌টি ঠিক, তাই আমাদের জিজ্ঞাস্য।’

বুদ্ধদেব তখন তাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে এই কথা বলেছিলেন, ‘তোমাদের আত্মগোষ্ঠী সবাই সত্যলাভের জন্য এক একটি পথ নির্দেশ করেছেন। উত্তম! কিন্তু

তুমি নিজে কি ঈশ্বর দর্শন করেছ? অথবা তোমাদের পিতা কিম্বা পিতামহ কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন?'

'না, তাঁরা কেউ ঈশ্বর দর্শন করেননি. তাঁদের পিতা-পিতামহও ঈশ্বর দর্শন করেননি।'

'আচ্ছা, তোমাদের আচার্যদের মধ্যে কেউ কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন?'

'না, তাঁরাও ঈশ্বর দর্শন করেননি।'

সকলের মুখেই এক উত্তর। সকলেরই এক কথা। কেউ তারা ঈশ্বর দর্শন করেননি।

তখন বুদ্ধদেব সেই পঞ্চ-তরুণকে একটি উপাখ্যান শুনিয়েছিলেন; বলেছিলেনঃ দেখ, একবার এক গ্রামে হঠাৎ কোথা থেকে একটি যুবক উপস্থিত হয়েছিল। সে কখনও কাঁদছে, কখনও বিলাপ করছে, কখনও চীৎকার করছে। বলছে, 'আহা আমি তাকে অত্যন্ত ভালবাসি, নিবিড়ভাবে ভালবাসি।' তার চীৎকারে গ্রামবাসীরা বেরিয়ে এল। তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে তুমি ভালবাস? কে সে?' 'তা আমি জানি না।' 'কোথায় থাকে সে কন্যা? তার চেহারাই বা কেমন?' 'হায়, আমি সে-সব কিছুই জানি না। কোন সংবাদ রাখি না। শুধু এইটুকু জানি যে, আমি তাকে অত্যন্ত ভালবাসি।'

এখন এই যুবকটি সম্বন্ধে তোমাদের অভিমত কি—তা আমি জানতে চাই।

তরুণগণ তখন সবাই একযোগে বলে উঠল, 'কেন মশাই, ও তো একটি আস্ত নির্বোধ! যাকে সে জানে না চেনে না, যাকে কখনও দেখেনি—এমন একটি অবাস্তব মেয়ের জন্য যে চীৎকার করে বেড়াচ্ছে, তাকে একান্ত বেকুব ভিন্ন আর কি বলা যাবে?'

তখন বুদ্ধ বললেন, 'তাহলে তোমরাও কি অনেকাংশে তাই নও! তোমরা নিজেরাই স্বীকার করছ যে, তোমরা কিম্বা তোমাদের পিতা, পিতামহ কেউ কখনও ঈশ্বর দর্শন করেনি। ঈশ্বর-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বংশ পরম্পরায় তোমাদের কারও নেই। অথচ সেই ঈশ্বর নিয়েই তোমরা তর্ক করছ, পরস্পরের টুঁটি ছিঁড়ে ফেলতে চাইছ। একি পাগলামি নয়?'

তখন তরুণগণ বিব্রত হয়ে বুদ্ধকে প্রশ্ন করল, 'তাহলে এখন আমাদের কি করা উচিত—তাই বলুন।' বুদ্ধদেব বললেন, 'বেশ, তবে শ্রবণ কর। আচ্ছা, তোমাদের

পূর্বপুরুষগণ কখনও কি এমন কথা বলছেন যে, ভগবান্ কোপনস্বভাব, ভগবান্ অসৎ?' 'আজ্ঞে না, তেমন কথা তাঁরা কখনও বলেননি। তিনি চির-সৎ, চির-পবিত্র—এই তাঁরা বলেছেন।'

'তাহলে হে তরুণগণ—তোমরা যদি কায়মনোবাক্যে সৎ হও, সর্বভাবে পবিত্র হও, তবেই ভগবানের সান্নিধ্যে পৌঁছতে পারবে। তর্ক-বিতর্ক করে বা পরস্পরকে আক্রমণ করে ভগবান্ লাভ হয় না। অতএব আমার নির্দেশ এই যে—পবিত্র হও, সৎ হও। সর্বান্তঃকরণে অপরকে ভালবাস। ভগবানলাভের এই চিরন্তন পথ, অন্য পথ কিছু নাই।'

বুদ্ধের জন্মকালেই প্রাণিহত্যা না করবার এবং জীবে দয়া প্রদর্শন করবার নীতি আদর্শ রূপে গৃহীত ছিল—এ-কথা আমরা আলোচনা করেছি, সেক্ষেত্রে বুদ্ধদেব নূতন কিছু করেননি; কিন্তু তিনি নূতন যেটি করেছিলেন, সেটি হচ্ছে—জাতিভেদ প্রথা উচ্ছেদের জন্য একটি প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত। তাছাড়া আরও একটি অভিনব কাজ বুদ্ধদেব সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি তাঁর চল্লিশ জন শিষ্যকে পৃথিবীর নানা স্থানে প্রেরণ করেছিলেন এই নির্দেশ দিয়েঃ 'বৎসগণ, তোমরা সকল দেশের সকল মানুষের সঙ্গেই উদার ভাব নিয়ে মিলিত হবে, জাতিধর্মনির্বিশেষে মিলিত হবে, এবং সকলের কল্যাণ-সাধনকল্পে মহাবাণী প্রচার করবে।'

অবশ্য এজন্য হিন্দুরা সৌভাগ্যক্রমে তাঁকে নির্যাতিত করেনি। তিনি পূর্ণবয়সে দেহত্যাগ করেছিলেন। বরাবর তিনি অতি কঠোর জীবনযাপন করেছেন। কোন দুর্বলতা কখনও তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর বহু মতবাদে আমি বিশ্বাস করি না। না, সত্যি বিশ্বাস করি না। আমি বরং বিশ্বাস করি যে, প্রাচীন হিন্দুদের বেদান্তবাদ অনেক বেশী চিন্তাপূর্ণ; বেদান্তের জীবনদর্শন অপূর্ব। বুদ্ধের কর্মপদ্ধতি যে আমি অপচ্ছন্দ করি, তা অবশ্য নয়। তবে তাঁর যে বৈশিষ্ট্য আমাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে, সেটি হচ্ছে তাঁর দৃঢ়তা তাঁর মহত্ত্ব এবং তাঁর স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি। তাঁর মস্তিষ্কে কোন জটিলতা ছিল না। যখন বিশ্বের সকল ঐশ্বর্য তাঁর পাদমূলে এসেছিল, তখনও তাঁর মধ্যে তিলমাত্র পরিবর্তন হয়নি; তখনও তাঁর মধ্যে এই মনোভাব সম্পূর্ণ অব্যাহত ছিল—'আমি আর দশজনেরই মত একজন সাধারণ মানুষ।'

আপনারা জানেন, হিন্দুরা মানুষ-পূজা করতে ভালবাসে, সেদিকে তাদের আগ্রহ ঐকান্তিক। যদি আপনারা কিছু দীর্ঘকাল বেঁচে থাকেন, তবে দেখতে পাবেন, আমাকেও বহু লোক পূজা করবে। যদি হিন্দুদের মধ্যে কেউ কোন ধর্মপ্রচার করে, তবে জীবিতকালেই তাঁকে তারা পূজা করতে শুরু করে। ফল-কথা, কাউকে পূজা করবার আগ্রহ এবং প্রবণতা তাদের চিরন্তন। অথচ তাদেরই মধ্যে বাস করেও বিশ্ব-বিখ্যাত বুদ্ধদেব আজীবন এ ঘোষণাই করে গেছেন যে, তিনি একজন সাধারণ মানুষ-মাত্র। এ ছাড়া অন্য কোন উক্তি তাঁর কণ্ঠ থেকে তাঁর কোন ভক্ত কখনও বের করতে পারেনি।

তাঁর অন্তিম বাক্যগুলি চিরদিন আমার অন্তরে একটি অব্যক্ত স্পন্দন জাগ্রত করেছে। তিনি তখন বৃদ্ধ, রুগ্ন, মৃত্যুপথযাত্রী; ঠিক সে-সময়ে একজন অস্পৃশ্য অন্ত্যজ ব্যক্তি তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিল; সে গলিত মাংসভোজী। হিন্দুরা সেই জাতের কাউকে লোকালয়েই প্রবেশ করতে দেয় না। সেই শ্রেণীর একটি লোক সশিষ্য বুদ্ধদেবকে তার গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করেছিল। সে দীন দরিদ্র ব্যক্তিটির নাম চুন্দ। সে তার সাধ্যমত, যুক্তি বিবেচনামত সেই মহান্ আচার্যকে আপ্যায়িত করতে চেয়েছিল। তাই প্রচুর শূকর-মাংস এবং অন্ন প্রস্তুত করে বুদ্ধদেব ও তাঁর শিষ্যগণকে সে পরিবেশন করল। বুদ্ধদেব একবার সেই আহার্যগুলি তাকিয়ে দেখলেন। শিষ্যেরা সবাই ইতস্ততঃ করছিল—তারা সেই ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ করবে কিনা। বুদ্ধদেব তখন তাদের বললেন, 'এ আহার্য তোমরা কেউ গ্রহণ কর না, তাতে তোমাদের ক্ষতি হবে।' কিন্তু তিনি নিজে শান্তভাবে আসনে বসে সেই আহার্য গ্রহণ করলেন। তিনি সমদর্শী, তিনি আচার্য; অতএব তিনি চুন্দ-প্রদত্ত খাদ্যও গ্রহণ করবেন— এমন কি শূকরের মাংসও খাবেন! তাই তিনি খেলেন, স্থিরভাবে সেই আহার্য গ্রহণ করলেন।

তিনি তখন মরণাপন্নই ছিলেন। এখন মৃত্যু একেবারে আসন্ন উপলব্ধি করে বললেন, 'ঐ বৃক্ষের নীচে আমার জন্য শয্যা করে দেওয়া হোক। আমার মনে হচ্ছে—আমার প্রয়াণের সময় উপস্থিত হয়েছে।'

তারপর সেই বৃক্ষমূলেই তিনি শয্যাগ্রহণ করলেন এবং সেখানেই দেহত্যাগ করেন, আর সেই শয্যা ছেড়ে উঠতে পারেননি। ঐ বৃক্ষতলে শুয়ে তিনি প্রথমেই জনৈক শিষ্যকে বলেছিলেন, 'চুন্দের কাছে গিয়ে তাকে জানিয়ে এস, তার মত উপকারী বন্ধু

আমার আর কেউ নেই, কারণ তার দেওয়া খাদ্য গ্রহণ করেই আমি নির্বাণ লাভ করতে চলেছি।'

এর পরও কতক লোক তাঁর কাছে উপদেশ লাভের জন্য এসেছিল। একজন শিষ্য তাদের উদ্দেশ্য করে বলছিল, 'প্রভুর খুব কাছে তোমরা যেও না। তিনি এখন মহাসমাধিতে নিমগ্ন হতে চলেছেন।' কিন্তু সে-কথা শোনামাত্র বুদ্ধদেব বলে উঠলেন, 'না, না, ওদের আসতে দাও।' আবার কয়েকজন লোক এল, আবার শিষ্যেরা তাদের বাধা দিতে গেল; কিন্তু আবার বুদ্ধদেব তাদের নিকটে আহ্বান করলেন। তারপর তাঁর অন্যতম প্রধান শিষ্য আনন্দকে ডেকে বুদ্ধদেব বললেন, 'বৎস আনন্দ! আমি চলে যাচ্ছি, সেজন্য শোক কর না। আমার জন্য চিন্তা কর না। মনুষ্যজীবনে মৃত্যু অবধারিত। তোমরা নিজেদের মুক্তির জন্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে চেষ্টা কর। তোমরা প্রত্যেকেই সর্বাংশে আমারই মত। আমি তোমাদেরই একজন ছাড়া আর কিছু নই। অশেষ তপস্যায় আমি আমার জীবন গঠিত করেছি, সুতরাং তোমরাও অক্লান্ত চেষ্টা দ্বারা বুদ্ধত্ব লাভ করতে পার।'

বুদ্ধের শেষ অক্ষয় বাণী ছিল এইরূপঃ 'কোন শাস্ত্রগ্রন্থের প্রামাণ্য, তা সে যত প্রাচীন গ্রন্থই হোক, মেনে নিও না। শুধু পূর্বপুরুষগণের উক্তি বলে কোন কথায় বিশ্বাস কর না, অথবা আর দশজন লোক বিশ্বাস করে বলেও কোন মতবাদ গ্রহণ কর না। প্রতিটি জিনিষ পরীক্ষা কর, যাচাই কর তারপর বিশ্বাস কর। আর যদি কোন কিছু বহুজনের হিতকর হবে বলে মনে কর, তবে সকলের মধ্যে সেটি বিতরণ কর।'—এই শেষ বাণী উচ্চারণ করেই বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেছিলেন।

এই মহতী প্রজ্ঞাবাণী অনুধাবনযোগ্য। তিনি দেবতা নন, দানব নন, দেবদূতও নন। না, সে-সব কিছুই তিনি নন। তিনি শুধু একজন দৃঢ়চিত্ত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি—যাঁর মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষ নিখুঁত, পরিপুষ্ট এবং জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত সতেজ ও ক্রিয়াশীল। মোহ নেই, ভ্রান্তি নেই—এই বুদ্ধের স্বরূপ। তাঁর অনেক মতবাদের সঙ্গেই আমি একমত নই, আপনাদের অনেকেও হয়তো একমত হবেন না। কিন্তু আমি ভাবি—আহা, তার মহাশক্তির এক কণাও যদি আমার থাকত! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাবান দার্শনিক তিনি। প্রবল ব্রাহ্মণ্যশক্তির অত্যাচারের কাছে কখনও তিনি মাথা নত করেননি। না, কখনও না। সর্বত্র সহজ ও ঋজু—এই তাঁর প্রকৃতি ছিল। দুঃখীর দুঃখে তিনি দুঃখী, তাদের সাহায্যে তিনি মুক্তহস্ত। আবার সঙ্গীতসভায় তিনি মহাসঙ্গীতজ্ঞ।

শক্তিমানের মধ্যে তিনি মহাশক্তিমান্। কিন্তু সর্বত্রই সেই এক প্রাজ্ঞ মনীষী, সেই সমর্থ শক্তিমান্ পুরুষ।

কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও তাঁর মতবাদের সবকিছু আমার বোধগম্য নয়। আপনারা জানেন—হিন্দুমতে মানুষের মধ্যে যে আত্মা বিরাজ করেন, সেই আত্মাকে তিনি স্বীকার করেননি। আর আমরা—হিন্দুরা এ-কথা বিশ্বাস করি যে, মানুষের মধ্যে শাশ্বত একটি পদার্থ আছে—যেটি অপরিবর্তনীয়, যেটি অনন্তকাল স্থায়ী। সেই পদার্থ আত্মা; তার আদি নেই, অন্ত নেই—সে-ই ব্রহ্ম। কিন্তু বুদ্ধদেব এই আত্মা, ব্রহ্ম—দুই-ই অস্বীকার করেছেন। তিনি বলতেন, কোন বস্তুর চিরস্থায়িত্বের কোন প্রমাণ নেই। ... সবই নিত্যপরিবর্তনের সমষ্টি মাত্র। নিত্যপরিবর্তনশীল যে চিন্তাস্রোত—তারই সমষ্টিকে 'মন' বলে। একটি ঘূর্ণায়মান মশাল যেন এক শোভাযাত্রা পরিচালনা করছে, কিন্তু ঐ 'অলাতচক্র'টি মায়া। অথবা একটি নদীর উপমা গ্রহণ করা যেতে পারে—একটি নদী যেমন অবিরাম প্রবাহে গতিশীল, প্রতি মুহূর্তে তার মধ্যে নূতন জলরাশি আসছে এবং চলে যাচ্ছে—জীবনও ঠিক তেমনি; দেহ, মনও তেমনি।

কিন্তু আমি তাঁর মতবাদ ঠিক বুঝতে পারি না। হিন্দুরা কখনও বুঝতে পারেনি। তবে তাঁর মতবাদের নিগূঢ় উদ্দেশ্যটি আমি বুঝতে পারি। আহা, সেটি একটি মহান্ উদ্দেশ্য—বিরাট উদ্দেশ্য! বুদ্ধদেব বলতেন, জগতে স্বার্থপরতাই প্রচণ্ড অভিশাপ। আমরা স্বার্থপর, তাই আমরা অভিশপ্ত বটে। স্বার্থপরতার কু-মতলব পরিহার করা কর্তব্য। একটি ঘটনা প্রবাহেরই মত জীবন বয়ে চলেছে। নদীপ্রবাহের সঙ্গেই তুলনা হতে পারে। ঈশ্বর নয়, আত্মা নয়, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস নিয়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াও। সৎকাজের জন্যই সৎকাজের অনুষ্ঠান কর—শাস্তির ভয়ে নয়, কোন আকাঙ্ক্ষিত লোকে যাবার উদ্দেশ্য নিয়েও নয়।

সুবুদ্ধি নিয়ে দাঁড়াও, মতলব ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াও। সৎকাজ সৎ বলেই আমি তার অনুষ্ঠান করব, অন্য কোন কারণে নয়—এই হবে উদ্দেশ্য। কি অদ্ভুত, কি বিচিত্র এই মতবাদ! আমি তাঁর দার্শনিক তত্ত্বগুলির সঙ্গে কোন সময়েই একমত নই, এ-কথা পূর্বেই বলেছি; কিন্তু তাঁর নৈতিক প্রভাব আমাকে যেন উৎসাহিত করে তোলে। আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে প্রশ্ন করুন, দেখুন তাঁর মত নির্ভীকতা নিয়ে, শক্তি নিয়ে-এক ঘণ্টাও নিজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়াতে পারেন কিনা! আমি তো পাঁচ মিনিটেই যেন ভয় পেয়ে যাই, একটি অবলম্বন যেন

আমার কাছে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তখন আমি বুঝতে পারি—আমি কত ভীরু, কত দুর্বল! আর সঙ্গে সঙ্গে এই বিরাট মহামানবের কথা চিন্তা করে আমি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠি। তাঁর যে প্রচণ্ড মহাশক্তি, তার কাছাকাছি যাওয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তেমন শক্তি-প্রকাশ জগৎ ইতঃপূর্বে আর কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। আমি নিজে তো এরূপ শক্তি এ-পর্যন্ত কোথাও দেখিনি।

বস্তুতঃ আমরা তো ধর্মভীরু। নিজেকে বাঁচাতে আমরা সর্বদা সচেষ্ট, আর সেটি হলেই আমরা তৃপ্ত হয়ে থাকি। প্রচণ্ড ভীতি, নিগূঢ় স্বার্থপরতা সর্বদা আমাদের মধ্যে কাজ করছে; তারই ফলে আমাদের ভীরুতার শেষ নেই, ভয়ের অবধি নেই। অথচ এর মধ্যে দাঁড়িয়েই তাঁর এই ঘোষণা—'সৎ বলেই সৎকার্য অনুষ্ঠান কর। কোন প্রশ্ন উত্থাপন কর না, সে-সবই নিরর্থক। গল্পে উপাখ্যানে, সংস্কার-সহায়ে মানুষকে সৎকার্যে প্রণোদিত করা হয়ে থাকে। তথাপি সুযোগ পেলেই সে অসৎকার্যে লিপ্ত হয়। শুধু সৎকর্মের জন্যই যে ব্যক্তি সৎ কর্মের অনুষ্ঠান করে থাকে, সে-ই যথার্থ মহৎ। কার্য-মাধ্যমে তার চরিত্রেরই যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়।'

একদা বুদ্ধকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'মৃত্যুর পর মানুষের কী অবশিষ্ট থাকে?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'সবই থাকে, সবই থাকে।' কিন্তু মানুষের মধ্যে অক্ষয় পদার্থ কোন্‌টি, সেটি তার চরিত্র—তার দেহ নয়, আত্মা নয়, অন্য কিছুই নয়। আর সেই চরিত্রই কালজয়ী হয়ে জীবিত থাকে। যাঁরা চলে গেছেন, তাঁরা তাঁদের চরিত্ররূপ মহাসম্পদই শুধু রেখে গেছেন, রেখে গেছেন আমাদের জন্য, সমগ্র মানবজাতির জন্য। আর কালে কালে সেই চরিত্র-প্রভাব কাজ করে চলেছে।

বুদ্ধের কথাই বলুন আর যীশুখ্রীষ্টের কথাই বলুন … এ-জগৎ তাঁদের চরিত্র-মহিমায় উদ্ভাসিত! মহাশক্তি-সমন্বিত এই মতবাদ। যা হোক, আসুন আমরা আবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাই, কারণ সে-প্রসঙ্গে এখনও আমরা পৌঁছাইনি। (সকলের হাস্য।) কাজেই আজ সন্ধ্যায় আরও দু-চারটি কথা আমায় বলতে হবে। … বুদ্ধদেব সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে—তাঁর কর্মপন্থা, তাঁর সংগঠন। আজ গীর্জা সম্বন্ধে, ধর্মসংস্থা সম্বন্ধে আপনাদের যে মত ও ধারণা গড়ে উঠেছে—সে-ও তারই চরিত্র থেকে। তিনি মামুলি ধরনের ধর্মসংস্থা পরিত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু নিজ সন্ন্যাসী শিষ্যবর্গকে একত্র করে নূতন একটি সঙ্ঘ গঠন করেছিলেন। সেই সঙ্ঘে—যীশুখ্রীষ্টের জন্মের সাড়ে পাঁচ-শ বছরেরও পূর্বে ভোটপত্র-সহায়ে মতামত দেবার প্রথা পর্যন্ত গৃহীত হয়েছিল

এবং তাঁর সংগঠনও সর্বাংশে নিখুঁত ছিল।পূর্বতন ধর্মসংস্থার বাইরে—এই নূতন ধর্মসঙ্ঘ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েছিল এবং ভারতবর্ষে ও ভারতের বাইরে প্রভূত সেবামূলক কাজ করেছিল।

এর তিন-শ বছর পরে এবং যীশুখ্রীষ্টের জন্মের দু-শ বছর পূর্বে মহান্ সম্রাট্ অশোকের আবির্ভাব হয়। পাশ্চাত্য দেশের ঐতিহাসিকগণ তাঁকে 'দেবোপম সম্রাট্' বলে আখ্যাত করেছিলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধের মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন। তৎকালে সমগ্র পৃথিবীতে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্। তাঁর পিতামহ ছিলেন আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক এবং সে-সময় থেকেই ভারতবর্ষের সঙ্গে গ্রীসের একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল।

অধুনা প্রায় প্রত্যহই মধ্য এশিয়ায় কোন শিলালিপি বা ঐ-জাতীয় কিছু আবিষ্কৃত হচ্ছে। ভারতবর্ষ তো বুদ্ধ বা অশোকের কথা ভুলেই গিয়েছিল। অথচ এখানে স্তম্ভগাত্রে বা শিলাখণ্ডে প্রাচীন হরফে বহু বাণী উৎকলিত ছিল। কিন্তু সেগুলির পাঠোদ্ধার করতে কেউ সক্ষম ছিল না। ... প্রাচীন মোগল সম্রাটের কেউ কেউ লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক ঘোষণা করেও সেগুলির পাঠোদ্ধারে সক্ষম হননি।

কিন্তু বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সে-সব লিপির পাঠোদ্ধার করা হয়েছে। পালি-ভাষায় সে-সব বাণী লিখিত। প্রথম শিলালিপিটি এইরূপঃ " ...

অতঃপর যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং করুণ দুঃখকাহিনী বিস্তারিতভাবে উৎকলিত হয়েছে। এর পরই অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। শিলালিপিতে লিখেছিলেনঃ 'অতঃপর, আমার বংশধরগণের মধ্যে কেউ যেন অন্য কোন জাতিকে যুদ্ধে জয় করে যশোলাভের প্রয়াসী না হয়। যদি তারা যশস্বী হতে চায়, তবে অন্য জাতিকে সাহায্য করেই যেন তারা যশ অর্জন করে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাঁরা শিক্ষক ও আচার্য—বিভিন্ন দেশে যেন তাঁদের প্রেরণ করা হয়। তরবারির সহায়তায় যে যশ অর্জিত হয়, সেটা যশই নয়।'

এর পরেই দেখা যায়—কিভাবে অশোক বিভিন্ন দেশে, এমন কি সুন্দর আলেক-জান্দ্রিয়ায় পর্যন্ত ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেছেন। আর বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে ঐ-সব

অঞ্চলের সর্বত্র নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল—থেরাপুত্ত, এসিনি প্রভৃতি নামে যাদের খ্যাতি। এ-সব সম্প্রদায় কঠোর নিরামিষাশী।

মহামতি সম্রাট্ অশোক চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন মানুষের জন্য তো বটেই, পশুর জন্যও। নানা শিলালিপিতে এই সব চিকিৎসালয় স্থাপনের নির্দেশ রয়েছে—দেখা যায়।যখন কোন গৃহপালিত পশু বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য হয়ে যাবে এবং তার মনিব দারিদ্র্যবশতঃ আর সেটিকে প্রতিপালন করতে সক্ষম হবে না, তখন তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে হবে, দয়া করে হত্যা করা হবে না। সে-সব চিকিৎসালয় জনসাধারণের অর্থেই পরিচালিত হত। বহির্বাণিজ্যের ব্যবসায়ীরা বিক্রীত বস্তুর ওজনের উপর হন্দর-হিসাবে যে শুল্ক দিত, সে-সবই ঐ-সকল চিকিৎসালয়ের জন্য ব্যয়িত হত। কাজেই কারও উপর কোন চাপ দেওয়া হত না, অথচ সুব্যবস্থা ছিল সকলের জন্য। তোমার পালিত গাভীটি বৃদ্ধ হয়েছে, তুমি আর রাখতে চাও না, তাকে পশুচিকিৎসালয়ে পাঠিয়ে দাও, তারা রাখবে সেটিকে। এমন কি বিড়াল ইঁদুর প্রভৃতি নিম্নতর প্রাণীদেরও স্থান ছিল সেখানে। মেয়েরা শুধু এগুলিকে মেরে ফেলতে চাইতেন, তাঁরা কখনও কখনও দলবদ্ধ হয়ে নানা বিষাক্ত খাদ্য নিয়ে যেতেন এবং তাই খাইয়ে বহু প্রাণী মেরে ফেলতেন।

কিন্তু অশোকের অভিমত ছিল এই যে, মানুষের জীবন রক্ষা যেমন সরকারের কর্তব্য, প্রাণীদের জীবনরক্ষাও তেমনি সরকারের কর্তব্য হওয়া উচিত। প্রাণিহত্যা করা হবে কেন? কোন্ যুক্তিতে? কোন সঙ্গত যুক্তি নেই তার পশ্চাতে। তবে মানুষের আহারের প্রয়োজনে পশুবধ নিষিদ্ধ করবার পূর্বে সর্বপ্রকার সব্জির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সেইজন্যে নানাদেশ থেকে তরকারির বীজ সংগ্রহ করে দেশে বপন করেছিলেন তিনি এবং সেগুলি আহারোপযোগী হবার সঙ্গে সঙ্গেই আদেশ-পত্র জারি করেছিলেন যে—প্রাণিহত্যামাত্রই দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। যে-কোন যোগ্য সরকারের পক্ষে প্রাণীদের রক্ষা করাও অবশ্য করণীয় কার্যরূপে গণ্য হওয়া উচিত। নিজের আহারের জন্য গো ছাগ প্রভৃতি প্রাণী হত্যা করবার কি অধিকার মানুষে আছে?

এই ভাবে বৌদ্ধধর্ম রাজনীতি-ক্ষেত্রেও অসাধারণ প্রভাব ও ক্ষমতা বিস্তার করেছিল। কালক্রমে অবশ্য ধর্মপ্রচারকদের নানা অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে সে ধর্ম বিপর্যস্ত হয়েছিল। তবে তাদের কৃতিত্বের পরিচায়ক হিসাবে এ-কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তারা কখনও তরবারির সাহায্য গ্রহণ করেনি। আর সেই

সঙ্গে এ-কথাও স্বীকার করতে হবে যে, এক বৌদ্ধধর্ম ভিন্ন জগতের আর কোন ধর্মই রক্তপাত না করে এক পা অগ্রসর হতে সক্ষম হয়নি। মাত্র মস্তিষ্কের শক্তি দিয়ে হাজার হাজার নরনারীকে ধর্মান্তর গ্রহণ করান—অপর কোন ধর্মের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। না, কোথাও হয়নি, কোন যুগে হয়নি।

আর আপনারা ঠিক এই জিনিষই করতে চলেছেন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে। তরবারি দিয়ে ধর্ম শেখান—এই তো আপনাদের প্রণালী! এই তো ধর্মযাজকগণ প্রচার করে থাকেন! বলপ্রয়োগে জয় করে, হত্যা করে ধর্মশিক্ষা দেওয়া! ধর্মশিক্ষার এক বিচিত্র প্রণালীই বটে!

আপনারা জানেন—কিভাবে মহামতি সম্রাট্ অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। যৌবনে তিনি খুব সৎ লোক ছিলেন না। তাঁর এক ভাই ছিল। দুই ভাইয়ের মধ্যে একবার প্রচণ্ড কলহ হয়। অশোক পরাজিত হয়েছিলেন সেই কলহে। সেই প্রতিহিংসায় নিজ ভ্রাতাকে হত্য করবার সঙ্কল্প করেছিলেন অশোক। তাঁর ভ্রাতা তখন আত্মরক্ষার জন্য এক বৌদ্ধ বিহারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সংবাদ পেয়ে অশোক সেই বিহারে নিজে গিয়ে দাবী করলেন— ভ্রাতাকে তাঁর হাতে সমর্পণ করবার জন্য। তখন মঠাধ্যক্ষ সন্ন্যাসী তাঁর নিকটে এই বাণী প্রচার করেছিলেনঃ 'প্রতিহিংসা ভাল নয়। প্রেম দ্বারা ক্রোধ জয় কর। ক্রোধ কখনও ক্রোধ দ্বারা শান্ত হয় না, ঘৃণাও ঘৃণা দ্বারা দূরীভূত হয় না। প্রেম দ্বারা ক্রোধ জয় কর—হিংসা জয় কর। হে বন্ধু, একটি অন্যায়ের পরিবর্তে তুমি যদি আর একটি অন্যায় কার্য কর, তবে তার দ্বারা প্রথম অন্যায়টির প্রতিকার হয় না, বরং সংসারে আরও একটি নূতন অন্যায় সাধিত হয়ে থাকে।' উত্তরে সম্রাট্ বলেছিলেন, 'ঠিক কথা, ঠিক কথা! কিন্তু তুমি একটি মূর্খ! ঐ ব্যক্তির জীবনরক্ষার জন্য তোমার নিজ জীবনটি বিসর্জন দিতে তুমি প্রস্তুত আছ কি?'

'হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত আছি সম্রাট্।' এ-কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে সন্ন্যাসী সম্রাটের সম্মুখে এসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং সম্রাটও তরবারি কোষমুক্ত করে বলেছিলেন— 'তবে প্রস্তুত হও,' কিন্তু তরবারির আঘাত আনতে গিয়ে সহসা তিনি সেই সন্ন্যাসীর মুখের দিকে তাকালেন। প্রশান্ত সে মুখমণ্ডল, চোখের পলকটি পর্যন্ত যেন পড়ছে না! সম্রাট্ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এ সাহস, এ অকম্পিত ভাব কোথা থেকে আয়ত্ত করলে—ভিক্ষুক সন্ন্যাসী?'

তখন সে সন্ন্যাসী আবার বুদ্ধের বাণী উচ্চারণ করতে লাগলেন এবং সম্রাটও বিস্মিত, মুগ্ধ হয়ে সেই অমৃত বাণী আরও শোনাবার জন্য অনুরোধ জানাতে লাগলেন। এইভাবে বুদ্ধের জীবন ও বাণীর কাছে অশোক আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

বৌদ্ধধর্মে তিনটি জিনিষ আছে। স্বয়ং বুদ্ধ, তাঁর ধর্ম ও তাঁর সঙ্ঘ। প্রথমে সেই ধর্ম অত্যন্ত সরল ছিল, অনাড়ম্বর ছিল। তাঁর মৃত্যকালে তদীয় শিষ্যগণ প্রশ্ন করেছিলেন—'প্রভু, আপনার সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য কি?' আপনার স্মৃতিরক্ষার জন্য কিরূপ স্মৃতিস্তম্ভ আমরা নির্মাণ করব?'

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে নিয়ে তোমাদের কিছুই করণীয় নেই। যদি ইচ্ছা হয়, আমার চিতাভস্মের উপর একটি মাটির স্তূপ নির্মাণ কর। অথবা তাও করবার আবশ্যকতা নেই।' কিন্তু কালক্রমে অবস্থার পরিবর্তন হল। বিশাল মন্দির ও স্তূপাদি বুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন-রূপে নির্মিত হল। বৌদ্ধরাই মূর্তিপূজা প্রচলিত করল, অথচ তার পূর্বে মূর্তিপূজার বিষয় মানুষের জানাই ছিল না, বুদ্ধের নানা অবস্থার মূর্তি, ভোগ-নিবেদন, উপাসনা—সবই এসে গেল। এবং সঙ্ঘের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এ-সবের জটিলতাও বর্ধিত হতে লাগল। ক্রমে বৌদ্ধমঠগুলি প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হল; আর পতনের বীজও উপ্ত হল সেই সঙ্গে।

সন্ন্যাস যদি অল্পসংখ্যক যোগ্য অধিকারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে সেটি ভাল, কিন্তু যখন সেই সন্ন্যাস এমনভাবে প্রচারিত হতে থাকে যে, যে-কোন পুরুষ বা নারী সামান্য আগ্রহ বা অনুপ্রেরণাবশেই সমাজ ও সংসার ত্যাগ করে সেটি গ্রহণ করতে শুরু করে, তখনই বিপদ; যখন দেখা গেল সারা ভারতবর্ষ জুড়ে অনেক মঠ বা আশ্রম গড়ে উঠেছে এবং এক-একটিতে শত সহস্র সন্ন্যাসী বাস করছে, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ হাজার পর্যন্ত ভিক্ষু একই মঠ-বাড়ীতে বাস করছে—বিরাট বিশাল সব পাকা মঠ বা আশ্রমের বাড়ী, অবশ্য জ্ঞানচর্চার কেন্দ্ররূপেই সেগুলি পরিচালিত, তখনই যথার্থ বিপদের কাল—কারণ জাতীয় জীবনস্রোত তখনই ব্যাহত হয়। সৎ গৃহীর অভাবে সৎ পুত্রকন্যা আর সমাজে তখন যথেষ্ট সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করত না। সবল ও শক্তিমানগণ চলে গেল সমাজের বাইরে, আর দুর্বলের সংখ্যাধিক্য ঘটল সমাজে। ফলে শক্তি ও বীর্যের অভাবেই জাতি ক্ষয়িষ্ণু হয়ে গেল।

এবার বিচিত্র বৌদ্ধসঙেঁঘর কথা কিছু বলব। বিরাট ছিল সে সঙঘ; তবে চিন্তা এবং মতবাদ এক কথা, আর বাস্তবভূমিতে তার প্রয়োগ সম্পূর্ণ অন্য কথা।

অহিংসা, মৈত্রী—এ সব তত্ত্ব-হিসাবে উত্তম, কিন্তু আমরা সবাই যদি সত্যি সত্যি অহিংস নীতি অবলম্বন করে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে দণ্ডায়মান হই, তাহলে এ নগরের আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। অর্থাৎ তত্ত্ব-হিসাবে ঠিক হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তার সার্থক প্রয়োগের পথ কেউ নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়নি। আরও একটি কথা। সেটি বর্ণ বিচার-সম্পর্কে। রক্তের বিশুদ্ধতার দিক্ থেকে বর্ণবিচারের কিছুটা অর্থ আছে। বংশ-ক্রমিকতা অনস্বীকার্য। এদিক থেকে নিগ্রো কিম্বা রেড-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে আপনারা নিজেরা কেন রক্ত-সম্পর্ক স্থাপন করতে চান না, সেটা হয়তো উপলব্ধি করতে পারবেন। প্রকৃতিই এর প্রতিকূল হয়ে থাকে। প্রকৃতির প্রতিবন্ধকতা-হেতুই এরূপ রক্তের সংমিশ্রণ ঘটতে পারে না। কোন অদৃশ্য শক্তিই যেন এইভাবে বিভিন্ন জাতিকে রক্ষা করে থাকে। বস্তুতঃ এইটিই আর্যদের বর্ণবিভাগ। তার অর্থ এ নয় যে, নিম্নবর্ণের লোকেরা উচ্চবর্ণদের সমপর্যায়ের নয়, কিম্বা বিশেষ সুযোগ সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত থাকবে। তবে এটা আমরা জানি যে, রক্তের অবাধ মিশ্রণে জাতির অবনতি হয়। আর্য এবং অনার্যদের মধ্যে কঠোর জাতিবিচার সত্ত্বেও বর্ণবিভেদের প্রাচীর কতকাংশে তারা অপসারিত করেছিল এবং তারই ফলে একাধিক বহিরাগত জাতি তাদের অদ্ভুত আচার-ব্যবহার এবং পোষাক-পরিচ্ছদ নিয়ে এদের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। পরিচ্ছদে এদের শালীনতা ছিল না, মৃতদেহের গলিত মাংস এরা আহার করত। তথাপি প্রথমাবস্থায় খানিকটা বাহ্য ভব্যতা বজায় ছিল, কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই এদের গোঁড়ামি, কুসংস্কার, নরবলিপ্রথা, গোষ্ঠীগত কদাচার—সবই ধীরে ধীরে এসে মূল সমাজে প্রবেশ করল। প্রথম দিকে খানিকটা প্রচ্ছন্ন থাকলেও পরে ঐ-সব দোষই অত্যন্ত প্রবল হল, প্রকট হয়ে উঠল।তাতে সমগ্র জাতি নীচু হয়ে গেল, অসবর্ণ-বিবাহের মধ্য দিয়ে উচ্চ এবং নিম্নবর্ণের মধ্যে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটল এবং জাতি হীনবীর্য হয়ে গেল।

অবশ্য দূর ভবিষ্যতে এটিও শুভ ফলপ্রসূই হয়ে থাকে। ধরুন, আপনারা যদি নিগ্রোদের সঙ্গে কিম্বা রেড-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে রক্ত-সম্পর্কে মিশ্রিত হন, তবে নিঃসন্দেহ—বর্তমান সভ্যতা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু বহু শতাব্দী পরে এই মিশ্রণের

ফলেই এক দুর্ধর্ষ জাতির উদ্ভব হবে—যার বলবীর্য হবে অতুলনীয়। কাজেই সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও পরে সুফল লাভ হয়ে থাকে।

হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, জগতে মাত্র একটিই সুসভ্য জাতি আছে—সেই জাতি আর্যজাতি। এ একটি বিচিত্র বিশ্বাস সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু এ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আমি কিছু বলতে পারি না, কারণ এর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ আমি পাইনি। এই আর্যজাতির শোণিত-মিশ্রণ লাভ করতে না পারলে নূতন সভ্যজাতির উদ্ভব সম্ভব নয়। কোন প্রকার শিক্ষার দ্বারা সেটি হতে পারে না। আর্যজাতির রক্ত হচ্ছে প্রাথমিক প্রয়োজন, তারপর তার সঙ্গে শিক্ষা—এতেই নূতন সভ্যতা জন্মলাভ করে, কেবলমাত্র শিক্ষায় নয়।

আপনাদের দেশের কথা ধরুন—আপনারা যদি নিগ্রোদের সঙ্গে রক্ত-মিশ্রণে সম্মত হন, তবে নিগ্রোদের মধ্যে উচ্চতর সংস্কৃতি-প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু সেরূপ রক্ত-মিশ্রণে কি সম্মত হবেন আপনারা?

হিন্দুরা বর্ণবিভাগ পছন্দ করে। ঠিক বলতে পারি না, তবে হয়তো আমার মধ্যেও সে বর্ণবিভাগের ছোঁয়া লেগে থাকতে পারে। পূবর্গ আচার্যগণের আদর্শে আমি বিশ্বাস করি। সে আদর্শ মহান্ আদর্শ। কিন্তু তার বাস্তব রূপায়ণ খুব সার্থক হয়নি এবং উত্তরকালে ভারতীয় জাতির অধঃপতনের সেটি অন্যতম কারণও হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে এর ফলে আবার এক প্রচণ্ড সংমিশ্রণও সঙঘটিত হয়েছিল। যেখানে নানাজাতির রক্ত-সংমিশ্রণ ঘটেছে—কেউ শ্বেত, কেউ পীত, কেউ আমারই মত কৃষ্ণকায়—অর্থাৎ নানা বিপরীত বর্ণের সংমিশ্রণ, অথচ কোন জাতিই নিজ নিজ আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করছে না—সেখানে ধীরে ধীরে এক অভাবিত রক্ত-সংমিশ্রণ ঘটছে এবং তার ফলে যথাকালে এক মহাবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আপাততঃ সে মহাদৈত্য ঘুমিয়ে থাকবে, তার জাগরণের দেরী আছে। বিভিন্ন জাতির রক্ত-মিশ্রণের এই পরিণাম।

বৌদ্ধধর্মের ক্রম-অবনতির কালে অনিবার্য প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। সমগ্র জগৎ একটি ঐক্যসূত্রে বিধৃত। এক জ্ঞানই সত্য—বহুজ্ঞান অজ্ঞান; সেটি ভ্রম, সেই একত্বের ধারণা থেকেই দ্বৈতবর্জিত অদ্বৈতবাদের উদ্ভব। ভারতীয় চিন্তায় সেই বিশিষ্টতা। যুগ যুগ ধরেই সেই অদ্বৈত মতবাদ ভারতবর্ষে বর্তমান। জড়বাদের উদ্ভব

হলে কিম্বা নাস্তিকতা দেখা দিলেই সেই অদ্বৈততত্ত্ব ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। বৌদ্ধধর্ম্মের ক্ষেত্রেও তাই হল। বৌদ্ধধর্ম্মের মুক্তদ্বারপথে নানা জাতীয় বর্বর তাদের বিচিত্র রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার নিয়ে ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ করেছিল, আর তারই ফলে এক ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল ভারতীয় সমাজে। সেই প্রতিক্রিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন একজন তরুণ সন্ন্যাসী—তিনি আচার্য শঙ্কর। কোন নূতন মতবাদের প্রচার না করে বা কোন নূতন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা না করে তিনি বৈদিক ধর্মকেই পুনর্বার বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করেছিলেন। কাজেই আধুনিক হিন্দুধর্ম—প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের উপাদানেই গঠিত, বেদান্তের প্রভাব ও প্রাধান্য এখানে প্রবল। তবে যে বস্তু একবার লুপ্ত হয়, তা আর পূর্ব জীবনীশক্তি নিয়ে ফিরে আসে না। কাজেই হিন্দুধর্ম্মের পুরাতন উৎসবানুষ্ঠানাদি আর জীবন্ত হয়ে ফিরে এল না। আপনারা শুনলে বিস্মিত হবেন যে, প্রাচীন প্রথানুসারে—যে-হিন্দু গোমাংস ভক্ষণ করে না, সে খাঁটি হিন্দুই নয়। কোন কোন উৎসবে তাকে গোবধ করতেই হত, গোমাংস ভক্ষণ করতেই হত। আর আজ সেই প্রথা একেবারে বীভৎস বলে গণ্য হয়ে থাকে। অন্য সব বিষয়ে সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে মত-পার্থক্য থাকলেও এ-বিষয়ে আজ সবাই একমতাবলম্বী। কেই আর এখন গোমাংস ভক্ষণ করে না। প্রাচীন যুগের দেবদেবী, প্রাচীন যুগের পশুবলি সবই লুপ্ত হয়েছে, চিরদিনের মত লুপ্ত হয়েছে। আর বর্তমান ভারতবর্ষ বেদের আধ্যাত্মিক অংশটুকু গ্রহণ করেছে।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই ভারতের প্রথম ধর্মসম্প্রদায়। এই ধর্মসম্প্রদায়ই এ-কথা প্রথমে প্রচার করেছিল যে, বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ধারিত পথই একমাত্র পথ—সেই পথের আশ্রয় ভিন্ন মুক্তির আর কোন পথ নেই—সেই পথই সত্য পথ। কিন্তু হিন্দুরক্ত ধমনীতে প্রবাহিত থাকায় অন্যান্য দেশের গোঁড়া সাম্প্রদায়িকদের মত তত নিষ্ঠুর এরা হতে পারেনি। কাজেই অন্যদেরও মুক্তি হবে, তবে বহু বিলম্বে এবং ধীরে ধীরে সেটি হওয়া সম্ভব—এ-কথাও তারা বলত। হিন্দুরক্তের প্রভাবের ফল ছিল সেটা। খুব বেশী নির্ম্মম হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবু বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে হবে—এই ছিল নির্দেশ।

এদিকে হিন্দুদের মতে অন্য সম্প্রদায়ে যোগদান করা ঠিক নয়। যে যেখানে আছ, সেইখানেই থাক—সেই স্থানটি যেন পরিধি, সেখানে থেকেই কেন্দ্রবিন্দুতে যাত্রা করা যেতে পারে। এইটি ঠিক। হিন্দুধর্ম্মের সুবিধা এই যে, মত বা সূত্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব হিন্দুধর্ম আরোপ করে না, আরোপ করে জীবনের উপর। জগতের সর্বোত্তম দার্শনিক

মতবাদের অনুগামী হয়েও কেউ যদি আচারে-ব্যবহারে মূর্খ হয়—নির্বোধ হয়, তবে তার জ্ঞান ব্যর্থ। আর যদি জীবনে এবং ব্যবহারে কেউ সৎ হয়, তবে তার আশা আছে, তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে বৈদান্তিকগণ সকলের জন্যই অপেক্ষা করতে পারেন। বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়ই হচ্ছে এই যে, এক অদ্বয় বস্তুই নিত্য সত্যরূপে বিরাজিত—তিনিই ব্রহ্ম। স্থান, কাল, কার্যপরম্পরা প্রভৃতি সব কিছুর ঊর্ধ্বে তাঁর স্থান। কোন সংজ্ঞা দ্বারা তাঁকে প্রকাশ করা যায় না। তিনি সৎ, তিনি চিৎ এবং তিনি আনন্দময়—এ-ছাড়া অন্য কোন ভাবে আর তাঁকে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। তিনি একক সত্য। আমি, তুমি—সজীব, নির্জীব—যেখানে যা কিছু আছে, সব কিছুর মধ্যেই তিনি সত্যরূপে অনুস্যূত। সেই পরজ্ঞানের উপর আমাদের সমুদয় জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, সেই পরমানন্দেই আমাদের সকল আনন্দ বিধৃত। মানুষ যখন এ তত্ত্বটি উপলব্ধি করে, তখন সেই পরম সত্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য হয়। সে এবং অদ্বৈত সত্য অভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়।

অতএব সর্ব মলিনতা অপসারিত হলে, সর্ব স্থূলতা দূরীভূত হলে—সৎ ও পবিত্র স্বভাবের মধ্য দিয়ে মানুষ উপলব্ধি করে—যীশুখ্রীষ্ট যেমন বলেছিলেন—'আমি এবং আমার পিতা এক ও অভিন্ন।'

বৈদান্তিকগণ সকলের জন্য ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষা করতে পারেন। যেখানে যে অবস্থাতেই আমরা থাকি না কেন, 'আমি এবং পরমপিতা ঈশ্বর অভিন্ন'—এ উপলব্ধিই শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি। এটিকে উপলব্ধি করতে হয়। যদি মূর্তিপূজা এ উপলব্ধির সহায়ক হয়, তবে মূর্তিপূজাই বিধেয়। যদি কোন মহাপুরুষ এ-বিষয়ে সাহায্য করতে সক্ষম হন, তবে তাঁকেই পূজা কর। যদি মহম্মদকে পূজা করলে কাজ হয়, তবে তাই কর। কিন্তু যা-ই করবে, ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে কর। বেদান্ত-মতে নিষ্ঠাই সিদ্ধির ধ্রুব সহায়ক। কেউ বাদ যাবে না, কেউ প্রত্যাখ্যাত হবে না। তোমার চিত্ত—যেখানে সর্বসত্য নিহিত—ধীরে ধীরে পর্যায়ে পর্যায়ে বিকশিত হবে এবং চরমে এই পরমতত্ত্ব তুমি উপলব্ধি করবে, 'তুমি ও তোমার পরমপিতা এক ও অভিন্ন।'

মুক্তি কি? ব্রাহ্মী স্থিতিই মুক্তি। কিন্তু কোথায় সেই ব্রাহ্মী স্থিতি? সর্বত্র, সর্বস্থানে ও সর্বকালে যে ব্রাহ্মী স্থিতি, তাকেই 'মুক্তি' বলে।

এই যে বর্তমান মুহূর্তটি, বর্তমান ক্ষণটি—মহাকালের বুকে যে-কোন মুহূর্তেরই মত সেটি পরম মূল্যবান এই হচ্ছে প্রাচীন বেদের মহতী বার্তা। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে এই বার্তা পুনর্জীবিত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল সত্য, কিন্তু ভারতের জাতীয় জীবনে সে এক অক্ষয় চিহ্ন রেখে গিয়েছে—দাক্ষিণ্যে ও জীবজন্তুর প্রতি অহিংসায়।আর আজ ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বৈদান্তিক মতবাদ তার বিজয় অভিযান শুরু

৪০. শ্রেয়োলাভের পথ

আজ সন্ধ্যায় বেদের একটি কাহিনী তোমাদিগকে বলিব। বেদ হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ও বিশাল সাহিত্য, ইহার শেষাংশ অর্থাৎ বেদের শ্রেষ্ঠভাগ নামে অভিহিত। ইহাতে নানাবিধ তত্ত্ব ও দর্শন প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহা প্রাচীন সংস্কৃতে রচিত, এবং স্মরণ রাখিবে বহু সহস্র বৎসর পূর্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এক ব্যক্তি একমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার সঙ্কল্প করেন। হিন্দুধর্মে যজ্ঞের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। যজ্ঞ নানাপ্রকার। যজ্ঞে বেদী নির্মিত হয়, যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয় এবং নানাবিধ মন্ত্র উচ্চারিত হয়। যজ্ঞশেষে ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রগণকে দান করা হয়। প্রত্যেক যজ্ঞে বিশেষ বস্তু দান করা হয়। একপ্রকার যজ্ঞ ছিল, যাহাতে অনুষ্ঠাতাকে সর্বস্ব দান করিতে হইত। যে ব্যক্তির কথা আমরা বলিতেছি, তিনি ধনী হইলেও কৃপণ স্বভাব ছিলেন এবং এই অতি কঠিন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া সুনাম অর্জন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। যজ্ঞে সর্বস্ব দান না করিয়া তিনি শুধু অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ ও দুগ্ধ দেওয়া শেষ হইয়াছে এমন সব গাভী দান করিলেন। কিন্তু নচিকেতা নামে তাঁহার গুণী যুবা-পুত্র লক্ষ্য করিল যে, পিতা শুধু জরাজীর্ণ গাভীগুলি দান করিতেছেন এবং ভাবিল ইহা দ্বারা যজ্ঞে কোন সুফল লাভ হইবে না। অতএব সে নিজেকে দান করিয়া ক্ষতিপূরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। পিতার নিকট গিয়া বালক বলিল, পিতা আমাকে তুমি কাহার হাতে অর্পণ করিবে?পিতা কোন উত্তর দিলেন না। বালক দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার একই কথা জিজ্ঞাসা করিল। ইহাতে পিতা বিরক্ত হয়ে বলিলেন, 'তোকে যমের হাতে দিলাম—মৃত্যুর কাছে অর্পণ করিলাম।' বালক সরাসরি যমের বাড়ীতে গেল। যম তখন বাড়ীতে ছিলেন না, অতএব বালক যমের জন্য অপেক্ষা করিল। তিনদিন পর যম বাড়ীতে ফিরিয়া

বালককে দেখিয়া বললেন, 'ব্রাহ্মণ তুমি আমার অতিথি: তুমি আমার বাড়ীতে তিনদিন অনাহারে আছ। নমস্কার, তোমার এই কষ্টের ক্ষতিপূরণস্বরূপ তোমাকে তিনটি বর দিব।'

তারপর বালক প্রথম বর চাইল, 'আমার প্রতি বাবার ক্রোধ যেন শান্ত হয়।' দ্বিতীয় বরে বালক একটি যজ্ঞের বিষয়ে জানিতে চাহিল। তৃতীয় বরে বালক জানিতে চাহিল—'মানুষ মরিলে কোথায় যায়? কেহ কেহ বলে তাহার অস্তিত্ব থাকে না। আবার কেহ কেহ বলে তাহার অস্তিত্ব থাকে। দয়া করিয়া ইহার উত্তর দিন। ইহাই আমার তৃতীয় বর'।তারপর যম উত্তর করিলেন, 'প্রাচীনকালে দেবতারা এই রহস্য উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; এই রহস্য এত সূক্ষ্ম যে ইহা জানা কঠিন। অন্য কোন বর চাও; এই বরটি চাহিও না। শতায়ু জীবন চাও, গোধন অশ্ব ও বৃহৎ রাজ্য চাও। এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিও না। মানুষের যাহা কিছু ভোগ্যবস্তু আছে, সে-সব চাও, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিব, কিন্তু এই রহস্য জানিবার ইচ্ছা করিও না। বালক বলিল, 'না, মহাভাগ, মানুষ বিত্ত দ্বারা সন্তুষ্ট হয় না; আপনার দর্শন পাইয়া বিত্ত চাহিলে আমরা বিত্ত পাইয়া থাকি। আপনার ইচ্ছায় আমরা দীর্ঘজীবীও হইতে পারি। সঙ্গীত ও নৃত্য দ্বারা যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহার প্রকৃতি জানিয়া পৃথিবীর কোন মরণশীল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অজর ও অমর দেবগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া দীর্ঘায়ুলাভে তৃপ্ত হইবে? অতএব পরলোকের এই মহান্ রহস্যটি আমাকে বলুন, আমি অন্য কিছুই চাহি না।' নচিকেতা এই মৃত্যু-রহস্যই জানিতে চাহিতেছে। যম ইহাতে প্রসন্ন হইলেন।

পূর্বের দুই-তিনটি বক্তৃতায় বলিয়াছি যে, এই জ্ঞান মনকে প্রস্তুত করে। অতএব তোমরা দেখিতেছ, প্রথম প্রস্তুতি এই—মানুষ সত্য ছাড়া আর কিছুই চাহিবে না, এবং সত্যের জন্যই সত্য চাহিবে। যম নচিকেতাকে যে-সকল বস্তু দিতে চাহিয়াছিলেন, বালক সে-সবই প্রত্যাখ্যান করিল। শুধু এই জ্ঞানের—এই সত্যের জন্য বালক ধন-সম্পদ দীর্ঘায়ু সব-কিছুই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিল। এইভাবেই সত্যলাভ হয়। যম প্রসন্ন হইলেন। তিনি বলিলেন, 'দুইটি পথ আছে—প্রেয় ও শ্রেয়। এই দুইটি নানাভাবে মানুষকে আবদ্ধ করে। এই দুইটির মধ্যে যিনি শ্রেয়ের (নিবৃত্তির) পথ গ্রহণ করেন, তাঁহার মঙ্গল হয় আর যে প্রেয়ের পথ অবলম্বন করে সে অধোগামী হয়। নচিকেতা, আমি তোমার প্রশংসা করি। তুমি ভোগ্যবস্তু চাও নাই। তোমাকে ভোগের দিকে

নানাভাবে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তুমি সবই প্রত্যখ্যান করিয়াছ—তুমি জানিয়াছ যে, ভোগ অপেক্ষা জ্ঞান বহুল পরিমাণে মহত্তর।

‘তুমি বুঝিতে পারিয়াছ—যে ব্যক্তি অজ্ঞানান্ধকারে আছে এবং ভোগের জীবনযাপন করে সে পশুর সমান। তথাপি অনেকে অবিদ্যায় আচ্ছন্ন থাকিয়াও গর্ববশতঃ নিজেদের ধীর ও পণ্ডিত মনে করে, তাহারা অন্ধ কর্তৃক পরিচালিত অন্ধের ন্যায় কুটিল পথে পুনঃপুনঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। হে নচিকেতা, যাহারা অজ্ঞ শিশুদের মত কয়েক টুকরা মাটির ঢেলায় বিভ্রান্ত হয়, তাহাদের হৃদয়ে এই সত্য কখনও প্রতিভাত হয় না। তাহারা ইহকাল ও পরকাল দুই-ই প্রত্যাখ্যান করে এবং পুনঃপুনঃ আমার শাসনাধীন হয়। এই পরলোক-তত্ত্ব শুনিবার সুযোগ অনেকেরই হয় না; অনেকে শুনিয়াও জানিতে পারে না, কারণ বক্তা ও জ্ঞাতা হইবেন আশ্চর্য পুরুষ আর শিষ্য ও শ্রোতা হইবে কুশল বা নিপুণ। বক্তা বা আচার্য যদি জ্ঞানে সমুন্নত না হন, তাহা হইলে শ্রোতা বা শিষ্যা শতবার শুনিলেও এবং শতবার উপদিষ্ট হইলেও সত্যের আলো তাহার হৃদয়কে কখনও উদ্ভাসিত করে না। নচিকেতা, বৃথা তর্কে তোমার মনকে উদভ্রান্ত করিও না; শুদ্ধচিত্তেই এই সত্য প্রতিভাত হয়। যাঁহাকে অতি কষ্টে অনুভব করিতে পারা যায়, যিনি প্রাকৃত বিষয়বুদ্ধি দ্বারা প্রচ্ছন্ন, যিনি হৃদয়গুহাভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট, সেই পুরাতন আত্মাকে বাহিরের চক্ষু দ্বারা দর্শন করা যায় না। তাঁহাকে অন্তশ্চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া সুখ-দুঃখের অতীত হওয়া যায়। যিনি এই রহস্য অবগত আছেন, তিনি সব বৃথা বাসনা ত্যাগ করেন, এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি লাভ করেন এবং সর্বদা ধন্য হন। নচিকেতা, ইহাই শ্রেয়োলাভের পথ। তিনি গুণাতীত, নিরঞ্জন, কর্তব্যাকর্তব্যের অতীত, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান হইতে ভিন্ন; যিনি ইহা জানেন, তিনিই জ্ঞাতা।

যাঁহাকে সকল বেদ অনুসন্ধান করে, যাঁহাকে দেখিবার জন্য মানুষ সর্বপ্রকার তপস্যা ও কৃচ্ছসাধন করে—আমি তোমাকে তাঁহার নাম বলিব। তিনি ‘ওম্’। এই সনাতন ওম্-ই ব্রহ্ম-তিনি অমৃত; যিনি ইঁহার রহস্য অবগত আছেন তিনি যাহাই চান, তাহাই পান। নচিকেতা, এই আত্মা—যাঁহার সম্বন্ধে তুমি জানিতে চাও, কখনও জন্মানও না, কখনও মরেনও না। দেহনাশে এই অনাদি অনন্ত সনাতন আত্মা নষ্ট হন না। হত্যাকারী যদি মনে করে যে, সে হত্যা করে এবং হতব্যক্তি যদি মনে করে যে, সে হত হইয়াছে, তবে তাহারা উভয়েই অজ্ঞ, কারণ আত্মা হত্যা করিতেও পারেন না, হতও হন না। অণু অপেক্ষাও অণীয়ান, মহৎ অপেক্ষাও মহীয়ান সর্বেশ্বর আত্মা সকলের হৃদয়-গুহায়

বাস করেন। নিষ্পাপ ব্যক্তি আত্মার কৃপায় তাঁহাকে সর্বমহিমময় দর্শন করে। (আমরা দেখিতেছি, পরমেশ্বরের কৃপা তাঁহাকে উপলব্ধি করার অন্যতম কারণ।) আত্মা উপবিষ্ট থাকিয়াও দূরে গমন করেন, শয়ান থাকিয়াও সর্বত্র বিচরণ করেন। পরস্পর-বিরুদ্ধ গুণাবলীর মিলনভূমি ঈশ্বরকে শুদ্ধ ও সূক্ষ্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর কে জানিতে সমর্থ? বিভিন্ন দেহে অশরীরীরূপে বর্তমান এবং অনিত্য বস্তুর মধ্যে নিত্যরূপে বিদ্যমান সেই মহান্ ও সর্বব্যাপী আত্মাকে জানিয়া ধীমান ব্যক্তি শোক করেন না। এই আত্মাকে প্রবচন অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন অথবা মেধা বা বহুশাস্ত্র-শ্রবণের দ্বারাও জানা যায় না। আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন বা অনুগ্রহ করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করেন, তাঁহার নিকটেই আত্মা নিজস্বরূপ প্রকাশ করেন। যে অবিরত দুষ্কৃতিপরায়ণ, যাহার মন শান্ত ও সমাহিত নয়, যে সতত চঞ্চল ও অস্থির, সে হৃদয়-গুহায় প্রবিষ্ট এই আত্মাকে ধারণা ও উপলব্ধি করিতে পারে না। নচিকেতা, এই দেহ রথ, ইন্দ্রিয়বর্গ অশ্ব, মন লাগাম বা প্রগ্রহ, বুদ্ধি সারথি, আত্মা রথের স্বামী। যখন আত্মা বুদ্ধিরূপ সারথি এবং বুদ্ধির সাহায্যে মনরূপ লাগামের সহিত, আবার মনের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়বর্গরূপ অশ্বের সহিত যুক্ত হয়। তখনই জীবাত্মাকে ভোক্তা বলা হয়; সে অনুভব করে, কাজ করে, ক্রিয়াশীল হয়। যাহার মন সংযত নয় এবং যাহার বিবেকবুদ্ধি নাই, তাহার ইন্দ্রিয়গুলি সারথির হস্তে দুষ্ট অশ্বের মত অসংযত। কিন্তু যাঁহার বিবেকবুদ্ধি আছে, যাঁহার মন সংযত, তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলি রথচালকের হস্তে উত্তম অশ্বের মত সর্বদা সংযত। যাঁহার নিত্যানিত্য-বিচারবুদ্ধি আছে, যাঁহার মন সত্য অবধারণ করিতে সতত প্রস্তুত, যিনি শুদ্ধচিত্ত—তিনি সেই সত্যকে গ্রহণ করেন, যাহা লাভ করিয়া পুনর্জন্ম হয় না, নচিকেতা ইহা অতি দুষ্কর, পথ দীর্ঘ, ইহা দুর্লভ।যাঁহাদের সূক্ষ্মানুভূতি লাভ হইয়াছে, তাঁহারাই এই সত্যদর্শন করিতে পারেন, অবধারণ করিতে পারেন। তথাপি ভয় পাইও না। উঠ, জাগ, সক্রিয় হও, উদ্দেশ্যলাভ না করা পর্যন্ত থামিও না, কারণ ঋষিগণ বলেন এই পথ অতি দুর্গম—ক্ষুরের ধারের মত শাণিত ও দুরতিক্রমণীয়। যিনি শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-বিহীন শাশ্বত, অনন্ত, নির্বিকার বুদ্ধির অগম্য, অক্ষয়—তাঁহাকে জানিয়াই আমরা অমৃতত্ব লাভ করি বা মুক্ত হই।'

এ-পর্যন্ত আমরা দেখিলাম, যম আমাদের অভীষ্ট উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম ভাব এই—নিত্যবস্তুকে জানিয়াই আমরা জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ এবং সংসারের বিবিধ বিপর্যয়কে অতিক্রম করিতে পারি। নিত্যবস্তু কি?—বিকারহীন অপরিবর্তনীয় মানবাত্মা, বিশ্বাত্মা। আবার ইহাও বলা হয়, নিত্যবস্তুকে জানা অতি কঠিন। 'জানা'

শব্দের অর্থ শুধু বুদ্ধির স্বীকৃতি নয়, ইহার অর্থ উপলব্ধি। আমরা পুনঃপুনঃ পড়িয়াছি যে, এই আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে। আমরা ইহাকে চক্ষু দ্বারা দেখিতে পারি না, ইহাকে জানিতে হইলে সূক্ষ্মানুভূতির প্রয়োজন। স্থূল অনুভূতি দ্বারা দেওয়াল ও বইগুলির ধারণা হয়, কিন্তু সত্যকে জানিতে হইলে সূক্ষ্মানুভূতি চাই। ইহাই এই জ্ঞানের সমগ্র রহস্য। যম বলেন, মানুষকে শুদ্ধ হইতে হইবে। ইহাই সূক্ষ্মানুভূতি লাভ করিবার উপায়। তারপর যম অন্যান্য উপায়ের কথা বলিতে থাকেন। সেই স্বয়ম্ভূ আত্মা ইন্দ্রিয়াতীত। ইন্দ্রিয়গুলি বহির্মুখ, কিন্তু স্বয়ম্ভূ আত্মা অন্তর্মুখ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া আত্মাকে জানিবার ইচ্ছাই বিশেষ প্রয়োজন। বাহ্য প্রকৃতিতে আমরা এই যে-সকল সুন্দর জিনিষ দেখি, সেগুলি সবই ভাল, কিন্তু ঈশ্বরকে জানিবার পথ ইহা নয়। আবৃতচক্ষু বা অন্তর্মুখ হইবার শিক্ষালাভ করিতে হইবে। বাহ্যবস্তু দেখিবার আগ্রহকে সংযত করিতে হইবে। যখন তুমি কর্মব্যস্ত রাস্তায় কাহারও সঙ্গে হাঁটিতে থাক, তখন চলমান গাড়ীর শব্দের জন্য কথা শুনিতে পাওয়া খুব শক্ত—অত্যধিক গোলমালের দরুন সে তোমার কথা শুনিতে পায় না। মন বহির্মুখ এবং তোমার পার্শ্ববর্তী জনের কথা শুনিতে পাও না। তেমনি এই বাহ্য জগৎ এত অধিক গোলমাল করে যে, ইহাতে মন বহির্মুখ হয়। আত্মাকে কিরূপে দেখিতে পারি? এই বহির্মুখিতাকে নিবৃত্ত করিতে হইবে। ইহাই চক্ষুকে অন্তর্মুখ করা। যখন এরূপ হইবে, তখনই অন্তরাত্মা মহিমা দেখিতে পাইবে।

এই আত্মা কি? আমরা দেখিয়াছি যে, ইহা বুদ্ধিরও অতীত। কঠোপনিষদ্ হইতে আমরা জানি যে, এই আত্মা অনাদি অপরিবর্তনীয় সর্বগ; তুমি আমি এবং আমরা সকলেই সর্বত্র বিদ্যমান। এই সর্বগ আত্মা এক ও অদ্বিতীয়। দুইটি সত্তা সমভাবে সর্বগ হইতে পারে না—ইহা কিরূপে হইতে পারে? দুইটি সত্তা অনন্ত হইতে পারে না, এবং ফলে প্রকৃতপক্ষে একটি মাত্র আত্মাই আছেন, এবং তুমি আমি ও সমগ্র বিশ্ব এক, শুধু বহু বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছি। 'যেমন একই অগ্নি বিশ্বে প্রবেশ করিয়া নানাভাবে প্রকাশ পাইতেছে, তেমনি অদ্বিতীয় সর্বান্তরবর্তী আত্মা প্রতি জীবদেহে প্রতিভাত হইতেছেন।' কিন্তু প্রশ্ন এইঃ যদি এই আত্মা পূর্ণ ও শুদ্ধ, এবং বিশ্বের একমাত্র সত্তা হন, তাহা হইলে অশুদ্ধ শরীরে, পাপীর দেহে, পুণ্যবানের দেহে এবং অন্যত্র প্রবেশ করিলে ইঁহার কি গতি হয়? কিরূপে ইহা পূর্ণ থাকিতে পারেন। একই সূর্য প্রতি চক্ষুতে দৃষ্টির হেতু, তথাপি কাহারও চক্ষুর দোষ সূর্যকে স্পর্শ করে না। কাহারও 'ন্যাবা' হইলে সে সব জিনিষই হরিদ্রাভ দেখে। তাহার দৃষ্টির হেতু সূর্য, কিন্তু তাহার সব জিনিষকে

পীতাভ দেখার রোগ সূর্যকে স্পর্শ করে না। ঠিক তেমনি এই একমেবাদ্বিতীয়ম্ যদিও প্রত্যেকের আত্মা, তথাপি বাহিরের শুচি-অশুচি ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই অনিত্য বিনাশশীল পৃথিবীতে যিনি নিত্য আত্মাকে জানেন, এই জড়জগতে যিনি চৈতন্যস্বরূপকে জানেন, এই বিচিত্র জগতে যিনি অখণ্ড আত্মাকে জানেন এবং নিজের মধ্যে দেখেন, তাঁহারই শাশ্বত সুখ, অন্য কাহারও নহে। সেই পরমাত্মা ব্রহ্মকে সূর্য প্রকাশ করে না, চন্দ্র ও তারকা প্রকাশ করে না, বিদ্যুৎও প্রকাশ করে না, অগ্নি আবার কিরূপে প্রকাশ করিবে? তিনি দীপ্তিমান বলিয়া সবই দীপ্তিমান, তাঁহার জ্যোতিতে এই সবই জ্যোতির্ময়। যখন হৃদয়ের সকল বাসনা দূরীভূত হয়, তখনই মানুষ অমর হয় এবং এই দেহেই ব্রহ্মানন্দ লাভ করে। যখন হৃদয়ের সকল গ্রন্থি ছিন্ন হয়, হৃদয়ের সকল বক্রতা দূরীভূত হয়, সকল সন্দেহের নিরসন হয়, তখনই মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। ইহাই পথ।

এই শাস্ত্র অধ্যয়ন যেন আমাদিগকে রক্ষা করে, আমাদিগকে পালন করে, আমাদিগকে শক্তি ও বীর্য দেয়, আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। শান্তি, শান্তি, শান্তি। ওঁ সহনাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনা-ধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

বেদান্ত দর্শনে তোমরা এই চিন্তাধারা দেখিতে পাইবে। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, পৃথিবীর অন্যান্য গ্রন্থে নিবদ্ধ ভাব অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক্ একটি ভাব বেদান্ত দর্শনে আছে। অন্যান্য গ্রন্থের মত বেদের প্রাচীন অংশে একই প্রকার অনুসন্ধান চলিয়াছিল—সেই অনুসন্ধান ছিল বাহিরে। কতকগুলি প্রাচীন গ্রন্থে প্রশ্ন তোলা হইয়াছিলঃ আদিতে কি ছিল? যখন অস্তি বা নাস্তি কিছুই ছিল না, যখন অন্ধকার অন্ধকারকে আবৃত্ত করিয়াছিল, তখন কে ওই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিল? অতএব অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। দেবদূত, দেবতা এবং আরও অন্যান্য অনেক বিষয়ের কথা বলা হইতে লাগিল, পরে আমরা দেখিতে পাই—এই অনুসন্ধান নৈরাশ্যপূর্ণ বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। সেই সময়ে অনুসন্ধান চলিয়াছিল বাহিরে এবং কোন ফল পাওয়া যায় নাই; কিন্তু আমরা বেদে দেখিতে পাই পরবর্তী কালে এই স্বয়ম্ভূ ঈশ্বরের অনুসন্ধান চলিয়াছিল ভিতরে। বেদের এই একটি মূল ভাব আছে যে, নক্ষত্ররাজিতে নীহারিকায় ছায়াপথে—এই সমগ্র বাহ্য জগতে অনুসন্ধান করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় নাই, জীবন ও মৃত্যুর সমস্যা, কখনও মীমাংসিত হয় নাই। অন্তর্জগতের বিস্ময়কর

কার্যপ্রণালী ও রহস্য বিশ্লেষণ করিতে হইয়াছিল, বিশ্লেষণের ফলে বিশ্বের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইল; নক্ষত্র অথবা সূর্য ইহা করিতে পারিত না। মানুষের শরীর বিশ্লেষণ করা হইয়াছিল—মানুষের শরীরকে নয়, আত্মাকে নিরূপণ করিতে হইয়াছিল। সেই আত্মাতেই অনুসন্ধানের উত্তর পাওয়া গেল। কি উত্তর পাওয়া গেল? উত্তর মিলিল—দেহের পিছনে, এমন কি মনের পিছনে স্বয়ম্ভূ আত্মা আছেন। তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। এই স্বয়ম্ভূ আত্মা সর্বগ, সর্বত্র বিরাজমান, কারণ তিনি অমূর্ত। যাহা নিরবয়ব, নিরাকার দেশ বা কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, তাহা কোন স্থানে অবস্থান করিতে পারে না। ইহা কিরূপে পারে? আত্মা সর্বত্র বিদ্যমান, সর্বগ, আমাদের সকলের মধ্যে সমভাবে অনুস্যূত।

মানুষের আত্মা কি? এক সম্প্রদায় বলিত, ঈশ্বর একজন আছেন; ইহা ছাড়া অসংখ্য জীবাত্মা আছে, যাহারা ঈশ্বর হইতে স্বরূপতঃ চির পৃথক্। ইহা দ্বৈতবাদ। এটা প্রাচীন অপরিণত ভাব। অন্য এক সম্প্রদায় উত্তরে বলিত, জীবাত্মা অনন্ত পরমেশ্বরের অংশ। যেমন এই দেহ স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎ এবং ইহার পশ্চাতে আছে মন বা চিন্তা, এবং ইহারও পশ্চাতে আছেন আত্মা, তেমনি সমগ্র জগৎ একটি শরীর, ইহার পশ্চাতে সর্বজনীন মন, এবং তৎপশ্চাতে বিশ্বজনীন আত্মা। যেমন এই দেহ সর্বজনীন দেহের একটি অংশ, তেমনি এই মন সর্বজনীন মনের একটি অংশ এবং মানুষের আত্মা বিশ্বজনীন আত্মার (পরমাত্মার) অংশ। এই মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলে। এক্ষণে আমরা জানি বিশ্বজনীন আত্মা অনন্ত। অসীম বা অন্তরের অংশ কিভাবে হইতে পারে? ইহাকে কিভাবে ভাঙা যায়, ভাগ করা যায়? ইহা খুবই কবিত্বের কথা হইতে পারে যে, আমি অসীম অনন্ত পরমেশ্বরের একটি স্ফুলিঙ্গ, কিন্তু চিন্তাশীল মনের কাছে ইহা অসম্ভব। অনন্তকে ভাগ করার অর্থ কি? ইহা কি কোন জড়বস্তু, যাহা তুমি খণ্ডিত বা পৃথক্ করিতে পার? অনন্তকে কখনও ভাগ করা যায় না। যদি ইহা সম্ভব হইত, তাহা হইলে ইহা আর অনন্ত থাকিত না। তবে সিদ্ধান্ত কি? সিদ্ধান্ত এইঃ সর্বজনীন আত্মাই তুমি; তুমি সর্বজনীন আত্মার অংশ নও, সমগ্র। তুমিই পরমেশ্বরের সমগ্র। তাহা হইলে এইসকল ভেদ বা বৈষম্য কি? আমরা কোটি কোটি জীবাত্মাকে দেখিতেছি। তাহারা কি? যদিও সূর্য লক্ষ লক্ষ জলবিন্দুতে প্রতিবিম্বিত হয়; প্রতি জলবিন্দুতে সূর্যের সম্পূর্ণ আকৃতি বা ছায়া পড়ে; কিন্তু সেগুলি শুধু ছায়া বা আকৃতি, প্রকৃত সূর্য মাত্র একটি। অতএব আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে আপাত-প্রতীয়মান আত্মা আছেন, তিনি ঈশ্বরের ছায়া বা আকৃতি মাত্র, ইহা ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

পশ্চাতে যিনি প্রকৃতসত্তা আছেন, তিনি সেই এক ঈশ্বর। আমরা সকলেই সেখানে এক। আত্মারূপে বিশ্বে কেবল একজনই আছেন। সেই আত্মা তোমাতে ও আমাতে এবং মাত্র একটি। সেই এক আত্মা ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মারূপে প্রতিবিম্বিত। কিন্তু আমরা ইহা জানি না; আমরা মনে করি, আমরা পরস্পর পৃথক্ এবং ঈশ্বর হইতে ভিন্ন। এবং যতদিন আমরা এরূপ ভাবি, ততদিন জগতে দুঃখ থাকিবে। ইহাই মায়া।

তারপর দুঃখের অন্য মহৎ কারণ—ভয়। কেন একজন আর একজনের অনিষ্ট করে? কারণ তাহার আশঙ্কা—সে যথেষ্ট ভোগ করিতে পারিবে না। একজন আশঙ্কা করে যে, হয়তো তাহার যথেষ্ট অর্থ হইবে না, এবং এই আশঙ্কাবশতই সে অপরের অনিষ্ট করে এবং অর্থ লুণ্ঠন করে। যেখানে কেবল এক সত্তা আছে, সেখানে ভয়ের স্থান কোথায়? যদি আমার মাথায় একটি বজ্রপাত হয়, আমি-ই সেই বজ্র, কারণ আমিই একমাত্র সত্তা। যদি প্লেগের আবির্ভাব হয়, আমিই সেই প্লেগ; যদি একটি ব্যাঘ্র আসে, আমিই সেই ব্যাঘ্র; যদি মৃত্যু আসে, আমিই সেই মৃত্যু। আমি জন্ম ও মৃত্যু দুই-ই। আমরা দেখিতেছি যে, বিশ্বে দুইটি সত্তা আছে—এই ধারণা হইতেই ভয় আসে, ‘পরস্পরকে ভালবাস’—এ-কথা প্রচারিত হইতে আমরা সর্বদা শুনিয়া থাকি। কিন্তু কি জন্য সকলকে ভালবাসিব—তাহার ব্যাখ্যা এখানে। আমি প্রত্যেককে ভালবাসিব কেন? কারণ তাহারা ও আমি এক। আমার ভ্রাতাকে ভালবাসিব কেন? কারণ সে ও আমি এক। এই একত্ব—এই সমগ্র বিশ্বের অখণ্ডত্বই ভালবাসার কারণ। পদতলবিহারী ক্ষুদ্রতম কীট হইতে উচ্চতম জীব পর্যন্ত সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন শরীর আছে, কিন্তু তাহারা সকলেই এক আত্মা। সকল মুখ দিয়াই তুমি খাও; সকল হাত দিয়াই তুমি কাজ কর; সকল চোখ দিয়াই তুমি দেখ। লক্ষ লক্ষ দেহে তুমি স্বাস্থ্যসুখ উপভোগ করিতেছ, লক্ষ লক্ষ শরীরে তুমি ব্যাধি-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ। যখন এই ভাব আসে এবং আমরা ইহা উপলব্ধি করি, দেখি, অনুভব করি, তখনই দুঃখের নিবৃত্তি হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও চলিয়া যাইবে। আমি কিরূপে মরিতে পারি? আমাকে ছাড়া কিছুই নাই। ভয় চলিয়া যায়, এবং কেবল তখনই পূর্ণ সুখ ও পূর্ণ প্রেম আসে। সেই অবিনাশী সর্বজনীন সহানুভূতি, সর্বজনীন প্রেম, সর্বজনীন সুখ মানুষকে সর্ববস্তুর উপরে তুলিয়া ধরে। ইহার কোন প্রতিক্রিয়া নাই, কোন দুঃখ ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু জগতের এই সামান্য পান-ভোজন সর্বদাই একটি প্রতিক্রিয়া আনয়ন করে। ইহার সমগ্র হেতু এই দ্বৈতবাদ—বিশ্ব হইতে ভগবান্ হইতে আমি পৃথক্, এই ভাব। কিন্তু যে-মুহূর্তে

আমরা উপলব্ধি করিয়াছি যে, 'আমিই তিনি, আমি বিশ্বের আত্মা, আমি চিরসুখী, চিরমুক্ত', তখনই আসিবে প্রকৃত প্রেম, চলিয়া যাইবে সব ভয় এবং অবসান হইবে সকল দুঃখের।

৪১. মুক্তির পথ

[১৯০০ খ্রীঃ ১২ মার্চ সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের ওকল্যাণ্ডে প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ।]

'ওকল্যাণ্ড এনকোয়ারার' (Oakland, Enquirer) পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ বক্তৃতার বিবরণ প্রকাশিত হয়। হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের মতে 'মুক্তির পথ কি?'—এ বিষয়ে বক্তৃতা শুনিবার জন্য গত সন্ধ্যায় ফার্ষ্ট ইউনিটেরিয়ান চার্চ-এর ওয়েণ্ড্‌টে হল-এ (Wendte Hall) বিপুল শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল। স্বামী যে তিনটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়াছিলেন, এটিই সেগুলির শেষ বক্তৃতা। তিনি অংশতঃ বলেনঃ

কেহ বলে—ঈশ্বর স্বর্গে আছেন। আর একজন বলে—ঈশ্বর প্রকৃতিতে এবং সর্বত্রই বিদ্যমান। কিন্তু মহৎ বিপর্যয় উপস্থিত হইলে আমরা দেখিতে পাই, উদ্দেশ্য একই। আমরা সকলেই বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করি, কিন্তু পরিণাম ভিন্ন হয়।

প্রত্যেকটি মহান্ ধর্মের দুইটি মহৎ নীতিবাক্য—ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ। আমরা সকলেই সত্য চাই, এবং জানি যে, আমরা চাই বা না চাই সত্য আসিবেই। কিছু পরিমাণে আমরা সকলেই সেই সত্যের (শ্রেয়ের) জন্য চেষ্টা করিতেছি। সত্যলাভের প্রতিবন্ধক কি? আমরা নিজেরাই। আপনাদের পূর্বপুরুষগণ এই প্রতিবন্ধককে 'শয়তান' বলিতেন; কিন্তু ইহা আমাদের নিজেদের মিথ্যা 'অহং'। আমরা দাসত্বের মধ্যে বাস করি, এবং দাসত্ব না থাকিলে আমরা মরিয়া যাইতাম। আমরা সেই লোকটির মত, যে নব্বই বৎসর ঘোর অন্ধকারে থাকার পর প্রকৃতির সূর্যালোকে আনীত হইলে পূর্বেকার সেই অন্ধকার কক্ষেই ফিরিয়া যাইবার জন্য কাতর প্রার্থনা জানায়। আপনারা এই গতানুগতিক পুরাতন জীবনযাত্রা ছাড়িয়া নূতন অধিকতর উন্মুক্ত স্বাধীনতায় যাইতে চাহিবেন না।

প্রকৃত ঘটনার গভীরে প্রবেশ করাই প্রধান সমস্যা। ব্যাপারগুলি হইতেছে—অমুক জ্যাকের ছোটখাট নিকৃষ্ট বিভ্রান্তিসকল, যে জ্যাক মনে করে, বিভিন্ন ধর্মবিষয়ে সে যতই সামান্য হউক না কেন, তাহার একটি অসীম আত্মা আছেন। ধর্ম-হিসাবে এক দেশের মানুষ বহুপত্নীক; অন্যদেশে একজন নারীর অনেক পতি আছে। সুতরাং কোন কোন লোকের উপাস্য দুই দেবতা, কাহারও উপাস্য এক ঈশ্বর, কেহ কেহ কোন ঈশ্বরেই বিশ্বাস করে না।

কিন্তু কাজ ও ভালবাসার মধ্যে আছে মুক্তি। আপনারা কোন একটি বিষয় সম্যক রূপে শিখিয়াছেন; যথাসময়ে হয়তো সেই বিষয় স্মরণ করিতে পারিতেছেন না, তথাপি জিনিষটি আপনাদের আন্তর চেতনায় ডুবিয়া গিয়াছে এবং আপনাদের অঙ্গীভূত হইয়া আছে। অতএব আপনারা যখন কাজ করেন, সেই কাজ ভালই হউক বা মন্দই হউক, তখন আপনারা নিজেদের ভাবী জীবন ধারা গঠন করেন। যদি আপনারা কর্মের ভাবে ভাবিত হইয়া—কর্মের জন্যই কর্ম হিসাবে—সৎ কর্ম করেন, তবে আপনাদের ভাব অনুযায়ী স্বর্গে গমন করিবেন এবং স্বর্গের স্বপ্ন দেখিবেন।

পৃথিবীর ইতিহাস মহাপুরুষ ও উপদেবতাদের ইতিহাস নয়, উহা সমুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মত, যেগুলি সমুদ্রের স্রোত-তাড়িত বস্তুখণ্ডসমূহ হইতে আপনা-আপনি মহাদেশ- রূপে গড়িয়া উঠে। তাহা হইলে প্রতি গৃহে অনুষ্ঠিত আত্মোৎসর্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যের মধ্যে নিহিত আছে পৃথিবীর ইতিহাস। মানুষ তাহার নিজস্ব বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে ইচ্ছা করে না বলিয়াই ধর্ম গ্রহণ করে।

মানুষ ঈশ্বরকে যেরূপে গভীরভাবে ভালবাসে, সেরূপে ভালবাসার মধ্যেই তাহার মুক্তি নিহিত আছে। আপনার পত্নী বলেন, 'জন, তোমাকে ছাড়া থাকিতে পারি না'। কেহ কেহ অর্থ হারাইলে তাহাদিগকে পাগলা-গারদে পাঠাইতে হয়। আপনারা কি আপনাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে সেরূপ অনুভব করেন? আপনারা যখন অর্থ, বন্ধু, পিতা-মাতা, ভাই-ভগিনী ও ইহজগতের সব কিছু পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন এবং শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন যাহাতে তিনি তাঁহার প্রেমের কিঞ্চিৎ আপনাদিগকে দান করেন, তখনই আপনারা মুক্তিলাভ করিবেন।

৪২. আমি যে আমিই

[১৯০০ খ্রীঃ ২০ মার্চ, সান্ ফ্রান্সিস্কোতে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।]

আজ সন্ধ্যায় বক্তৃতার বিষয় 'মানুষ'—প্রকৃতির সহিত বৈষম্যে মানুষ। দীর্ঘকাল 'প্রকৃতি' শব্দ বাহ্য প্রকৃতিকে বুঝাইবার জন্য প্রায় স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হইত। এই-সব বাহ্য প্রকৃতিকে সুশৃঙ্খলভাবে আচরণ করিতে দেখা যাইত; এবং ইহারা প্রায়ই পুনরাবৃত্ত হইত—পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আবার ঘটিয়াছে, কিছুই শুধু একবার ঘটে নাই। এইভাবে সিদ্ধান্ত করা হইল যে, প্রকৃতি সর্বত্র ও সর্বকালে একরূপ। প্রকৃতির ধারণার সহিত একরূপতা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত; ইহা ছাড়া বাহ্যপ্রকৃতি বুঝিতে পারা যায় না। আমরা যাহাকে 'বিধি' বলি, তাহার ভিত্তি এই একরূপতা।

ক্রমশঃ 'প্রকৃতি' শব্দ ও একরূপতার ধারণা অন্তঃপ্রকৃতি, জীবন ও মনের প্রকৃতি বুঝাইতেও প্রযুক্ত হইতে লাগিল। যাহা কিছু পৃথক্ করা যায়, তাহাই প্রকৃতি। চারাগাছ, প্রাণী ও মানুষের গুণকে প্রকৃতি বলে। মানুষের জীবন নির্দিষ্ট প্রণালীতে আচরিত হয়; তাহার মনও সেইরূপ করে। চিন্তারাজির যখন তখন উৎপত্তি হয় না, উহাদের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের একটু নির্দিষ্ট প্রণালী আছে। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, বাহ্য প্রকৃতিগুলি যেমন প্রণালীবদ্ধ, অন্তঃপ্রকৃতি অর্থাৎ মানুষের জীবন এবং মনও তেমনি বিধিবদ্ধ।

যখন আমরা মানুষের মন ও অস্তিত্ব সম্পর্কে বিধির কথা বিবেচনা করি, তখন ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বাধীন অস্তিত্ব বলিয়া কোন কিছু থাকিতে পারে না। কিভাবে পাশব প্রকৃতি বিধি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা আমরা জানি। মানুষের সম্বন্ধেও এ কথা খাটে; মানব-প্রকৃতিও বিধিবদ্ধ। মানব-মনের বৃত্তিগুলি যে বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাকে কর্মের প্রণালী বলে।

কিছু-না হইতে কিছুর উৎপত্তি কেহ কখনও দেখে নাই; মনে যদি কিছু জাগে, তাহাও কোন কিছু হইতে অবশ্য উদ্ভূত হইয়াছে। আমরা যখন স্বাধীন ইচ্ছার কথা বলি, ইহার অর্থ এই যে, ইচ্ছা কোন কিছু দ্বারা উদ্ভূত হয় নাই। কিন্তু ইহা সত্য হইতে পারে না; ইচ্ছা জাত হইয়াছে; এবং যেহেতু ইহা জাত হইয়াছে, ইহা স্বাধীন হইতে পারে না—

ইহা বিধিবদ্ধ। আমি যে আপনার সঙ্গে কথা বলিতে ইচ্ছুক এবং আপনি আমার কথা শুনিতে আসিয়াছেন, ইহাও একটি বিধি। আমি যাহা কিছু করি বা ভাবি বা অনুভব করি, আমার প্রত্যেক আচরণ বা ব্যবহার, আমার প্রত্যেক গতিবিধি—সবই উৎপন্ন বা জাত হয়, সুতরাং স্বাধীন নয়। আমাদের জীবনও মনের এই নিয়ন্ত্রণকেই কর্মের বিধি বা প্রণালী বলে।

যদি প্রাচীনকালে পাশ্চাত্য সমাজে এরূপ তত্ত্ব প্রবর্তিত হইত, তাহা হইলে তুমুল হইচই পড়িয়া যাইত। পাশ্চাত্যের মানুষ ভাবিতে চায় না যে, তাহার মন বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারতের প্রাচীনতম দর্শন যখন এই বিধি প্রবর্তন করে, তখনই ভারতবাসী উহা গ্রহণ করিয়াছিল। মনের স্বাধীনতা বলিয়া কিছু নাই, ইহা হইতে পারে না। এই শিক্ষা ভারতীয় মনে কোন উত্তেজনা সৃষ্টি করিল না কেন? ভারত ইহা শান্তভাবে গ্রহণ করিল; ইহাই ভারতীয় মনীষা বা চিন্তার বৈশিষ্ট্য; এখানেই ভারতীয় ভাবধারা জগতের অন্যান্য ভাবধারা হইতে পৃথক্।

বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি দুইটি স্বতন্ত্র বস্তু নয়; ইহারা প্রকৃতপক্ষে এক। প্রকৃতি সকল বাহ্য দৃশ্যের সমষ্টি। যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু চলমান, তাহারই অর্থ ‘প্রকৃতি’। বস্তু ও মনের মধ্যে আমরা প্রচণ্ড বৈষম্য করি, আমরা ভাবি মন বস্তু হইতে একেবারে পৃথক্ । প্রকৃতপক্ষে ইহারা একই প্রকৃতি, ইহার এক অর্ধ অপরার্ধের উপর ক্রিয়াশীল। নানাপ্রকার উত্তেজনার আকারে বস্তু মনের উপর চাপ দিতেছে। এই উত্তেজনাগুলি শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। বাহিরের উত্তেজনা ভিতরের উত্তেজনার উদ্দীপক। বাহিরের শক্তিতে সায় দেওয়ার অথবা বাহিরের শক্তি হইতে দূরে থাকার ইচ্ছাকে আমরা চিন্তা বলি, তাহা হইতেই ভিতরের শক্তি হয়।

বস্তু ও মন দুই-ই শক্তি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কিছু নয় এবং যদি তোমরা এ-দুটিকে ভালভাবে বিশ্লেষণ কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, মূলতঃ উহারা এক। বাহিরের শক্তিকে কোন প্রকারে উদ্দীপিত করিতে পারে—ইহাতেই বুঝা যায় যে, কোন স্থানে ইহারা পরস্পর মিলিত হয়—ইহারা অবশ্যই অবিচ্ছিন্ন হইবে, সুতরাং উহারা মূলতঃ একই শক্তি। যখন তোমরা বস্তুগুলির মূলে গিয়া পৌঁছাও, তখন উহারা সরল ও সাধারণ হয়। যেহেতু একই শক্তি এক আকারে বস্তুরূপে এবং অন্য আকারে মনরূপে আবির্ভূত হয়, তখন বস্তু ও মনকে পৃথক্ চিন্তা করিবার কোন কারণ নাই। মন বস্তুতে রূপান্তরিত হয়, বস্তু মনে রূপান্তরিত হয়। চিন্তাশক্তি স্নায়ু ও পেশীশক্তি হয়; পেশী ও

স্নায়ুশক্তি চিন্তাশক্তি হয়। বস্তু অথবা মন যেরূপেই প্রকাশিত হউক না কেন, প্রকৃতি এইসব শক্তি।

সূক্ষ্মতম মন ও স্থূলতম বস্তুর মধ্যে পার্থক্য শুধু পরিমাণের। অতএব সমগ্র বিশ্বকে মন অথবা বস্তু বলা যাইতে পারে, কোন্‌টা—তাহাতে কিছু আসে যায় না। তোমরা মনকে বিশুদ্ধ বস্তু, অথবা শরীরকে, স্থূল বা বাস্তব মন বলিতে পার, কোন্‌টাকে কি নামে ডাক তাহাতে সামান্য পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয়। জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের মধ্যে বিরোধজনিত যে-সকল অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে, সেগুলির কারণ ভুল চিন্তা। প্রকৃতপক্ষে এই দুই-এর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। আমার ও নিম্নতম শূকরশাবকের মধ্যে পার্থক্য শুধু পরিমাণের। শূকরশাবকের মধ্যে শক্তির প্রকাশ কম, আর আমার মধ্যে শক্তির প্রকাশ বেশী। কখনও আমি নিকৃষ্ট, কখনও শূকরশাবক উৎকৃষ্ট।

মন অথবা বস্তু—কোন্‌টি প্রথমে আসে, ইহার আলোচনা করিয়া কোন লাভ নাই। মনই কি প্রথম—যাহা হইতে বস্তু আসিয়াছে? অথবা বস্তুই কি প্রথম—যাহা হইতে মন আসিয়াছে? এ-সকল অর্থহীন প্রশ্ন হইতে দার্শনিক যুক্তির অনেকগুলি উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা অনেকটা 'ডিম আগে না মুরগী আগে?'—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার মত। দুই-ই প্রথম এবং দুই-ই শেষ—মন ও বস্তু, বস্তু ও মন। যদি আমি বলি, বস্তুর অস্তিত্ব প্রথমে এবং বস্তু ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া মন হয়, তাহা হইলে আমি অবশ্যই স্বীকার করিব যে, বস্তুর পূর্বে মনের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই থাকিবে। যদি না থাকিত, বস্তু কোথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে? মনের পূর্বে বস্তুর অস্তিত্ব, বস্তুর পূর্বে মনের অস্তিত্ব আছে। ইহা আগাগোড়া 'মুরগী ও ডিমের' প্রশ্নের মত।

সমগ্র প্রকৃতি নিমিত্তের বিধি দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং দেশ-কালের অন্তর্গত। দেশের বাহিরে আমরা কিছু দেখিতে পারি না, তথাপি আমরা দেশ জানি না। কালের বাহিরে আমরা কিছু অনুভব করিতে পারি না, তথাপি আমরা কাল জানি না। কার্য-কারণের ভাষায় না বলিলে আমরা কিছু বুঝিতে পারি না, তথাপি কার্যকারণ কি তাহা আমরা জানি না। দেশ কাল নিমিত্ত—এই তিনটি প্রত্যেক দৃশ্যবস্তুর মধ্যে অনুস্যূত আছে, কিন্তু উহারা দৃশ্যবস্তু নয়। বুঝিতে পারিবার পূর্বে ইহারা যেন বিভিন্ন আকার বা ছাঁচ, যেগুলিতে ইহাদিগের প্রত্যেকটিকে অবশ্যই ঢালিতে হইবে। দেশ-কাল-নিমিত্তের সমবায়ে বস্তু একটি সত্ত্ব। দেশ-কাল-নিমিত্তের সমবায়ে মন একটি সত্ত্ব।

এই তত্ত্বটি অন্যভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক বস্তুই সত্ত্ব—নাম ও রূপের সমবায়ে। নাম ও রূপ আসে এবং যায়, কিন্তু সত্ত্ব চিরদিন একই থাকে। সত্ত্ব, নাম ও রূপ এই জলপাত্রটিকে গড়ে। ভাঙিয়া গেলে ইহাকে আর 'পাত্র' নামে অভিহিত কর না, অথবা ইহার পাত্র-রূপ দেখ না। ইহার নাম ও রূপ থাকে না, কিন্তু ইহার সত্ত্ব থাকে। নাম ও রূপের দ্বারা বস্তুর যাবতীয় পার্থক্য হয়। এগুলি যথার্থ নয়, কারণ ইহাদের অস্তিত্ব থাকে না। আমরা যাহাকে প্রকৃতি বলি, তাহা অবিনাশী ও বিকারহীন সত্ত্ব নয়। দেশ কাল ও নিমিত্তই প্রকৃতি। নাম ও রূপই প্রকৃতি। প্রকৃতিই মায়া। যে নাম ও রূপে প্রত্যেক বস্তুকে ঢালা হয়, তাহাকে 'মায়া' বলে। মায়া সত্য নয়, মিথ্যা। মায়া সত্য হইলে ইহাকে আমরা বিনাশ অথবা পরিবর্তন করিতে পারিতাম না। সত্ত্ব হইতেছে অজ্ঞাত ও বস্তুজগতের গুণাগুণশূন্য এবং শুধু বুদ্ধি দ্বারা অধিগম্য বিষয়, আর মায়া হইতেছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা প্রপঞ্চ। প্রকৃত 'আমি'কে কিছুই বিনাশ করিতে পারে না। কাঁচা বা পরিদৃশ্যমান 'আমি' সতত পরিবর্তনশীল ও নশ্বর।

আসল কথা এই—পার্থিব বস্তু মাত্রেরই দুইটা দিক্ আছে। একটা দিক্ নিত্য, বিকারহীন ও অবিনাশী; অপর দিক্ অনিত্য, পরিবর্তনশীল ও নশ্বর। মানুষ স্বরূপতঃ সত্ত্ব, আত্মা। এই আত্মা—এই সত্ত্ব বিকারহীন অবিনাশী। কিন্তু ইহা নামরূপান্তক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই নাম ও রূপ বিকারহীন বা অবিনাশী নয়; ইহারা চিরপরিবর্তনশীল ও নশ্বর। তথাপি মানুষ এই পরিবর্তনশীল দেহ ও মনে নির্বোধের মত অমরত্ব খোঁজে—শাশ্বত একটি দেহ পাইতে চায়। আমি সেরূপ অমৃতত্ব চাই না।

প্রকৃতি ও আমার মধ্যে কি সম্বন্ধ? প্রকৃতি নাম ও রূপ অথবা দেশ কাল ও নিমিত্তের প্রতীক; আমি প্রকৃতির অংশ নই, কারণ আমি মুক্ত, অমৃত, অপরিণামী ও অনন্ত। আমার স্বাধীন ইচ্ছা আছে কি নাই—এই প্রশ্ন আসে না। আমি যে-কোন ইচ্ছারই অতীত। যেখানেই ইচ্ছা, উহা কখনও স্বাধীন নয়। ইচ্ছার কোনই স্বাধীনতা নাই। নাম ও রূপ ইচ্ছাকে ধরিয়া দাস করিলেও ইহার স্বাধীনতা বজায় থাকে। সেই সত্ত্ব—আত্মা যেন নিজেকে নামরূপের ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়া তুলেন এবং অচিরে বদ্ধ হন, অথচ পূর্বেই তিনি মুক্ত বা স্বাধীন ছিলেন। তথাপি ইহার মূল স্বভাব থাকিয়াই যায়। এজন্যই শাস্ত্র বলেন, 'আমি মুক্ত; এ-সব বন্ধন সত্ত্বেও আমি মুক্ত'। এবং ইহা কখনই এ-কথা বিস্মৃত হয় না।

কিন্তু যখন আত্মার ইচ্ছা হইয়াছে, ইহা আর প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন বা মুক্ত নয়। প্রকৃতি শিকল ধরিয়া টানে, এবং প্রকৃতি যেমনই নাচাইতে চায়, তেমনই ইহাকে নাচিতে হয়। এভাবে তুমি ও আমি বর্ষ-বর্ষ নাচিয়াছি। আমরা যাহা কিছু দেখি, করি, অনুভব করি ও জানি, আমাদের সকল চিন্তা ও কার্য প্রকৃতির নির্দেশানুযায়ী নৃত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কোন কিছুতেই ইহার কোন স্বাধীনতা ছিল না এবং নাই। নিম্নতম হইতে উচ্চতম সকল চিন্তা ও কার্য প্রণালীবদ্ধ, এবং এগুলির কোনটিই আমাদের প্রকৃতস্বরূপগত নয়।

আমার যথার্থ স্বরূপ সকল বিধির বাহিরে। দাসত্ব ও প্রকৃতির সহিত সমভাবাপন্ন হও, এবং তুমি নিয়মানুগ হইয়া চল, নিয়মের বশবর্তী হইয়াই তুমি সুখী হইবে। কিন্তু যতই তুমি প্রকৃতি ও উহার নির্দেশকে মানিয়া চলিবে, ততই বদ্ধ হইবে। যতই তুমি অজ্ঞতার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া চলিবে, ততই তুমি বিশ্বের সব কিছুর অধীন হইবে। প্রকৃতির সহিত এই সামঞ্জস্য, এই নিয়মানুগামিতাই কি মানুষের যথার্থ স্বরূপ ও নিয়তির সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন? কোন খনিজ পদার্থ কখনও বিধি বা নিয়মের সহিত বিবাদ করিয়াছে? কোন বৃক্ষ অথবা চারাগাছ কখনও কোন নিয়ম লঙঘন করিয়াছে? এই টেবিলটি প্রকৃতি ও নিয়ম মানিয়া চলে; কিন্তু ইহা সর্বদা টেবিলই থাকিয়া যায়, ইহা অপেক্ষা ভাল হয় না। মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করে। সে অনেক ভুল করে, অনেক কষ্ট পায়। কিন্তু পরিণামে সে প্রকৃতিকে জয় করে এবং নিজের মুক্তি উপলব্ধি করে। যখন সে মুক্ত হয়, তখন প্রকৃতি তাহার দাস হয়।

বন্ধন সম্বন্ধে আত্মার সচেতন এবং শক্তিপ্রকাশে সচেষ্ট হওয়াকেই ‘জীবন’ বলে। এই সংগ্রামে সফলতাকেই বলে ক্রমবিকাশ। সর্বপ্রকার দাসত্ব দূর করিয়া পরিণামে জয়লাভ করাকেই ‘মুক্তি’, ‘মোক্ষ’ বা ‘নির্বাণ’ বলে। বিশ্বে সবই মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতেছে। যখন আমি প্রকৃতি, নাম-রূপ ও দেশ-কাল-নিমিত্ত দ্বারা বদ্ধ, তখন আমার যথার্থ স্বরূপ জানি না। কিন্তু এই দাসত্বেও আমার যথার্থ স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় না। আমি বন্ধনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি; বন্ধনগুলি একে একে ভাঙিয়া যায়, এবং আমার স্বাভাবিক মহত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন হই। তারপরই আসে পূর্ণ মুক্তি। আমার স্বরূপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ চৈতন্য লাভ করি—জানি যে, আমি অনন্ত আত্মা, প্রকৃতির প্রভু, কিন্তু প্রকৃতির দাস নই। সকল ভেদ ও সমবায়ের অতীত, দেশ কাল ও নিমিত্তের অতীত ‘আমি সেই আত্মা, আমি সেই ব্রহ্ম।’